নেতাজী সঙ্গ ও প্রসঙ্গ

দ্বিতীয় খণ্ড

নরেন্দ্রনারায়ণ চক্রবর্তী

১৯, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলিকাতা-১২

প্রথম প্রকাশ—২৩ জানুয়ারি, ১৯৬৬ (নেতাজি-জন্মদিবস)

দ্বিতীয় মুদ্রণ—আষাঢ়, ১৩৭৪

প্রকাশক :

ময়ূখ বসু

গ্রন্থপ্রকাশ

১৯, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট

কলিকাতা-১২

মুদ্রাকর :

বিভূতিভূষণ রায়

বিদ্যাসাগর প্রিণ্টিং ওয়ার্কস

১৩৫/এ, মুক্তারামবাবু স্ট্রীট

কলিকাতা-৭

প্রচ্ছদ-শিল্পী :

শচীন বিশ্বাস

ছয় টাকা

খর বায়ু বয় বেগে,
চারিদিক ছায় মেঘে,
ওগো নেয়ে, নাওখানি বাইয়ো।

তুমি কষে ধরো হাল
আমি তুলে বাঁধি পাল
হাঁই মারো, মারো টান হাঁইয়ো।

শৃঙ্খলে বার বার
ঝন্ ঝন্ ঝঙ্কার
নয় এতো তরণীর ক্রন্দন শঙ্কার

বন্ধন দুর্বার
সহ্য না হয় আর,
টলমল করে আজ তাই ও।
হাঁই মারো, মারো টান হাঁইয়ো।

গণি গণি দিন খন
চঞ্চল করি মন
বোলো না, যাই কি নাহি যাইরে।

সংশয় পারাবার
অন্তরে হবে পার,
উদ্‌বেগে তাকায়ো না বাইরে।

যদি মাতে মহাকাল,
উদ্দাম জটাজাল
ঝড়ে হয় লুন্ঠিত, ঢেউ উঠে উত্তাল,

হোয়ো নাকো কুন্ঠিত,
তালে তাল দিয়ো তাল,
জয়-জয় জয়গান গাইয়ো।
হাঁই মারো, মারো টান হাঁইয়ো।

—রবীন্দ্রনাথ

ভূমিকা

পাশ্চাত্যের জনৈক সমালোচক বলেছেন যে, জীবনীর অর্ধেক থাকে যার জীবন নিয়ে লেখা হয়, তার কথা, আর অর্ধেক থাকে লেখকের নিজের কথা। কথাটা মূলত সত্য। সাধারণত, শ্রদ্ধা-প্রেম-অনুরক্তিই হোক, অথবা রাজনৈতিক বা অন্য কোন অভিসন্ধিই হোক, এর যে-কোন-একটার টানে কিছু লিখতে গেলেই লেখকের মানস-ভঙ্গী ও দৃষ্টি-কোণ তাতে ফুটে উঠবেই।

অপক্ষপাত কথাটা খুবই আপেক্ষিক। এবং এর ব্যবহার-স্থানও খুব সঙ্কীর্ণ। পাঠকের মনের সঙ্গে মিশ না খেলেই লেখা হয়ে ওঠে পক্ষপাতদুষ্ট ও একদেশদর্শী।

ব্যক্তির জীবনী, স্মৃতি-চারণ ও সমালোচনার তো কথাই নেই, অমন বস্তু-তান্ত্রিক ইতিহাসও কি এর হাত থেকে নিস্তার পেয়েছে? ট্রট্‌স্‌কি আর স্ট্যালিনের লেখা ইতিহাস কি এক? ভারতীয় ও ইংরেজ ঐতিহাসিকের মত-পার্থক্য কি সামান্য? তাই বা কেন, ডাঃ তারাচাঁদ ও ডাঃ রমেশ মজুমদারের দৃষ্টিভঙ্গীর ভেতরেই-বা সাদৃশ্য কোথায়?

ফরাসী ও ইংরেজ লেখকের নেপোলিয়ন বা জোয়ান অব আর্ক আজও বিসংবাদ মেটাতে পারেনি। ইতিহাসের মার্কসীয় সিদ্ধান্ত ও প্রচলিত ইতিহাসের উপসংহার মুখোমুখি দাঁড়িয়েই থাকল। মিত্রপক্ষ একজোটে হিটলার-জাপানকে হারিয়ে দিল, কিন্তু দুই তরফের ইতিহাস কথা বলল পৃথক সুরে।

আরও একটি কথা জীবনী বাচক লেখা সম্পর্কে স্মরণীয়: আতিশয্য। সমালোচক কড়া অঙ্গুলী তীক্ষ্ণ করে তাকিয়ে আছেন। সাবধানে, সতর্কে এগিয়ে চলতে হবে। বাড়াবাড়ি নয়। উচ্ছ্বাস তো নয়ই। নিরেট বস্তু-তান্ত্রিক ও সম্পর্ক-নিরপেক্ষ হয়ে ও-পথে অনুপ্রবেশ চলবে।

অপক্ষপাতের ন্যায় এই বিপদসঙ্কুল আতিশয্য শব্দটিও কম ভীতিপ্রদ নয়। ব্যবহার-সীমা ওরও নির্ধারণ করতে যাওয়া প্রায় অসাধ্য। প্রাচীন চৈতন্য চরিতামৃত, চৈতন্য ভাগবত না হয় রক্ষা পেল, এ-যুগের অমিয় নিমাই চরিত, রামকৃষ্ণ কথামৃত, পরমপুরুষ প্রভৃতিকে কী বলব?

বস্তুত, অপক্ষপাত ও আতিশয্যবিহীন রচনা আদৌ সম্ভবপর কিনা, সেটা

ভাববার কথা। 'বর্ণ পরিচয়' খুব সম্ভব এর ব্যতিক্রম। সাহিত্য বা যে-কোন লেখার মৌল উপাদান 'বর্ণপরিচয়' হলেও ওখানেই সমাপ্তি ঘোষণা করতে গেলে প্রতিবাদ কেউ কেউ করতে পারেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও সমস্যার সমাধান-যে নির্বিঘ্নে হতে পারে, এও কম আশ্বাসের কথা নয়। তবে ওটাকে একমাত্র উচ্চাঙ্গের আদর্শ বলে ঘোষণা করবার পথে বাধা ও ঝক্কিও অল্প-বিস্তর আছে বৈকি।

আরও একটি সমস্যা আছে: বিষয়বস্তুর সত্যতা ও যথার্থ প্রতিফলন। এই সমস্যাটিও কম যায় না। এবং এরও মীমাংসা সর্বজনগ্রাহ্য হবে বলে বিশ্বাস করা কঠিন।

রামকৃষ্ণ কথামৃত সত্যসত্যই এ-যুগের মহাকাব্য। কৃষ্ণকে নায়ক করে ব্যাস লিখেছিলেন মহাভারত। এ-যুগে শ্রীম আর এক মহাকাব্য রচনা করেছেন রামকৃষ্ণকে নায়ক করে। এই দুই ক্ষেত্রেই প্রশ্নাবলী সবেগে তাড়া করে আসে। আসন্ন যুদ্ধের প্রাক্কালে কৃষ্ণ রণোন্মুখ উভয় সেনাদলের মধ্যে দাঁড়িয়ে যে-প্রকার বিশুদ্ধ সংস্কৃত ভাষায় ও বিবিধ ছন্দে অনর্গল কবিতা আবৃত্তি করেছেন, তার বিস্ময়করতা স্বীকার করলেও বিশ্বাস করবার পক্ষে যথেষ্ট যুক্তিযুক্ত নাও মনে হতে পারে। তেমনি, প্রায়-নিরক্ষর রামকৃষ্ণ ও তৎকালীন বিদগ্ধ সমাজের অন্যতম শ্রীম কি একই ভাষা, ভাব ও প্রকাশের অধিকারী ছিলেন? ঐ অনবদ্য রচনার কত অংশ রামকৃষ্ণের আর কতটা শ্রীম-এর তার বিচার কি এতই সহজ?

সমস্যার এই পরিপ্রেক্ষিতে পাশ্চাত্য সমালোচক যে-কথাটি সহজ ও সুন্দর করে বলেছেন, তার ভেতর একটা স্বাভাবিক সমাধানসূত্র খুঁজে পাওয়া যায়।

সমালোচনার রূপ-প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য অত্যন্ত স্পষ্ট এবং দ্বিধাহীন। তিনি বলেছেন:…"পূজার আবেগ মিশ্রিত ব্যাখ্যাই আমার মতে প্রকৃত সমালোচনা—এই উপায়ে এক হৃদয়ের ভক্তি আর এক হৃদয়ে সঞ্চারিত হয়। আমাদের আজকালকার সমালোচনা বাজারদর যাচাই করা—কারণ সাহিত্য এখন হাটের জিনিস। পাছে ঠকিতে হয় বলিয়া চতুর যাচনদারের আশ্রয় গ্রহণ করিতে সকলে উৎসুখ। এরূপ যাচাই ব্যাপারের উপযোগিতা অবশ্য আছে কিন্তু তবু বলিব যথার্থ সমালোচনা পূজা—সমালোচক পূজারী পুরোহিত—তিনি নিজের অথবা সর্বসাধারণের ভক্তি বিগলিত বিস্ময়কে ব্যক্ত করেন মাত্র।" (প্রাচীন সাহিত্য, পৃঃ ৭-৮)

ঐতিহাসিক বিষয়-বস্তুর দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে রবীন্দ্রনাথ আরও স্পষ্ট এবং প্রত্যক্ষ। ইতিহাস বেদবাক্য নয়, এ-কথা পূর্বাহ্নেই বলে নিয়ে তিনি বলে চলেছেন : "প্রমাণে এবং অনুমানে মিশ্রিত করিয়া একই লোকের এত বিভিন্ন প্রকার মূর্তি গড়িয়া তোলা যায় যে তাহার মধ্যে কোন্‌টা মূলের অনুরূপ তাহা প্রকৃতিভেদে ভিন্ন লোকে ভিন্ন ভাবে বিশ্বাস করেন। ইতিহাসমাত্রই-যে বহুল পরিমাণে লেখকের ও পাঠকের বিশ্বাসের উপর নির্ভর করে তাহাতে সন্দেহ নাই।" (আধুনিক সাহিত্য, পৃঃ ৭৩-৭৫)

চরিত-কথার যথাযথতা-প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের উক্তি সমস্যার নিরসন করে দেয় নিঃশেষে : "...প্রকৃতিভেদে একের কাছে যাহা অতিপ্রাকৃত, অন্যের কাছে তাহাই প্রাকৃত।" (প্রাচীন সাহিত্য, পৃঃ ৬)

এই কথাই আমি বলতে চেয়েছিলাম প্রথম খণ্ডের ভূমিকায়। কিন্তু এমন করে বলবার যোগ্যতা আমার কোথায়? তবু বলেছিলাম : "আমার বিচার ও বিশ্লেষণ সকলের মনঃপূত হবে, এমন দুরাশা করবার মতো মূঢ়তা আমার নেই ; কিন্তু এও একটা দিক, তাতেও আমার সংশয় নেই।"

'নেতাজি সঙ্গ ও প্রসঙ্গে'র সঙ্গ-পর্ব হল। এর পর হবে ;— শুধুই প্রসঙ্গ। সুভাষ-জীবনের ধারাবাহিক বিবরণ বাংলা সাহিত্যে নেই। পূর্ণাঙ্গ না হলেও অন্তত কিছুটা লেখবার চেষ্টা করেছি। সুভাষ-জীবনের সঙ্গে বর্তমান ও আগামী দিনের বাঙালীর কিছুটা পরিচয় হোক ও থাক, আমার চেষ্টার পেছনে এই অভিলাষই প্রধান। এতে পক্ষপাতিত্ব নেই, এ-কথা আমি বলব না। আতিশয্যও হয়তো দেখা দিয়েছে। কিন্তু এ-কথাও অত্যন্ত সত্য বলে আমি জানি যে, যা দেখেছি, যা জেনেছি, তা সম্যক বলতে পারিনি। কেন? কৃষ্ণ-চরিত লিখতে গিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছিলেন যে, তাঁর কাছে কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান কিন্তু সবাই তা মেনে নেবে কেন?

আমার বক্তব্যও তাই। আমি যে দৃষ্টি নিয়ে নেতাজিকে দেখেছি ও চিনেছি, তা সর্বজনগ্রাহ্য নাও তো হতে পারে।

মুখবন্ধে যে-গানটি দেয়া হয়েছে, ওটি 'তাসের দেশে'র প্রথম গান। কবি-যে সুভাষচন্দ্রের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ লক্ষ্য করেই গানটি রচনা করেছিলেন, তার সুস্পষ্ট পরিচয় রয়েছে ছত্রে ছত্রে। প্রতিটি শব্দে। প্রথমেই কবি সুভাষচন্দ্রকে অধিনায়ক বলে স্বীকার করে নিয়ে অগ্রসর হয়েছেন। 'তুমি

কষে ধরো হাল, আমি তুলে বাঁধি পাল' : মূল মাঝি তুমি, আমি তোমার সহকারী। যাত্রার পথে কাল-বৈশাখীর ঝড় উঠবে, উত্তাল ঢেউ আসবে রুখে, টলমল করবে তোমার তরণী ; মাঝি, তুমি সংশয় রেখো না, কুণ্ঠিত হয়ো না—ঐ উন্মাদ তালে তাল মিলিয়ে তোমায় চলতেই হবে তোমার লক্ষ্যের পথে ! নিঃসংশয় মন-প্রাণে শুধু শেষ-বিজয়ের অবিনাশী মন্ত্র ধ্বনিত হোক তোমার কণ্ঠে। চলা তোমার হোক অব্যাহত।

উৎসর্গ পত্রখানাও অভিনব। চিরাচরিত পথ সুভাষচন্দ্রের পথ নয়! গতানুগতিকতা পরিহার করে যে নবতম আদর্শ নেতা জাতির ঘুমন্ত কানে শুনিয়েছিলেন নিজের জীবন-ছন্দে, কবি তাকেই স্মরণ করেছেন আর বরণ করেছেন স্নেহসিক্ত অন্তর দিয়ে। "স্বদেশের চিত্তে **নূতন প্রাণ** সঞ্চার করবার পুণ্যব্রত তুমি গ্রহণ করেছ, সেই কথা স্মরণ করে 'তাসের দেশ' উৎসর্গ করলুম।"

নেতাজি সঙ্গ ও প্রসঙ্গ, ১ম খণ্ড, যে স্নেহ মমতা ও সমাদর লাভ করেছে, আমি নির্দ্বিধায় বলব যে, তা সত্যি বিরল! বসুমতী, যুগান্তর, আনন্দবাজার যে-প্রকার আন্তরিকতার সঙ্গে সমালোচনা বের করেছেন, তার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশের আমার ভাষা নেই। বিশেষ করে বসুমতী ও যুগান্তর। অর্ধ পৃষ্ঠা ব্যাপী একটি স্বতন্ত্র প্রবন্ধে শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় নিজের নামে বইখানির আদ্যন্ত আলোচনা করেছেন সম্পাদকীয় পৃষ্ঠায়। আর যুগান্তর করেছেন সম্পাদকীয় স্তম্ভে। এ ছাড়া যুগবাণী, অমৃত, শনিবারের চিঠি, বসুধারা প্রভৃতি পত্র-পত্রিকাও সমাদর জানিয়েছেন অকৃপণ হয়ে। বস্তুত জীবিতকালে কোনও গ্রন্থকারের ভাগ্যে এই প্রকার সহৃদয় সমাদর লাভ করা সত্যই অভাবনীয়। তবে, এ-বিষয়ে আমার বিন্দুমাত্রও সংশয় নেই যে, এই পরম ভাগ্য সম্ভবপর হয়েছে একমাত্র বিষয়-বস্তুর গুণে, আমার লেখার প্রসাদ-গুণে নয়।

অসংখ্য না হলেও কয়েকশত চিঠি পেয়েছি আমি পাঠকদের কাছ থেকে। যে-ভাষায় ও ভাবে তাঁরা আমাকে অভিনন্দন জানিয়েছেন, তার ভেতর অত্যুক্তি আছে নিশ্চয়ই, কিন্তু আন্তরিকতায় চিঠিগুলি পরিপূর্ণ। দ্বিতীয় খণ্ড তাড়াতাড়ি তাঁরা সবাই পেতে চেয়েছেন। কিন্তু তাঁদের এই আগ্রহ আমি পূরণ করতে পারিনি। ত্রুটি স্বেচ্ছাকৃত নয়। দৈহিক অপারগতা তো ছিলই, আরও ছিল প্রকাশকের অসুবিধা।

জীবনের সায়াহ্ন আজ আর কল্পনা নয়। প্রায় প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছে। শেষ বিদায়ের পূর্বে আমার এই স্বেচ্ছা-দায়িত্ব সাঙ্গ করে যেতে পারলে নিজেকে ধন্য ও কৃতার্থ মনে করব। অলমিতি—

"হরিধাম"
৪৭ নিউ বালিগঞ্জ রোড
কলিকাতা-৩৯

নরেন্দ্রনারায়ণ চক্রবর্তী

দ্বিতীয় সংস্করণের নিবেদন

'নেতাজি সঙ্গ ও প্রসঙ্গ'-এর (দ্বিতীয়খণ্ড) দ্বিতীয় সংস্করণ বের হল। আমার লেখার ত্রুটি-বিচ্যুতি আমার অজানা নয়। তবু সে-সব উপেক্ষা করে প্রসন্ন উদার মনে বাঙালী 'সঙ্গ ও প্রসঙ্গ'কে অন্তরে স্থান দিয়েছে, এর চাইতে বড় পাওয়া আমার পক্ষে আর কিছু নেই।

তৃতীয় ও শেষ খণ্ড কিছুদিন পূর্বে প্রকাশিত হয়েছে। তর্পণ আবাস সাঙ্গ হল। যে মহামানবকে চোখে দেখেছিলাম, কাছেও পেয়েছিলাম, কিন্তু চিনতে পারিনি;—তাঁকেই চিনিয়ে দেবার দায়িত্ব নিয়েছিলাম স্বেচ্ছায়। ধৃষ্টতা আমার ছিল,—কিন্তু এ-দায়িত্বভার অস্বীকার করবার আবার উপায়ও ছিল না। অলমিতি—

নরেন্দ্রনারায়ণ চক্রবর্তী

অমর বাণী

"জগৎ নশ্বর।
সবাই নিঃশেষ হয়ে যাবে একদিন।
কিন্তু নিঃশেষ হবে না আদর্শ।
এই আদর্শের জন্যেই কেউ কেউ জীবন আহুতি দেয়।
দিতে দ্বিধা করে না।
এই আত্মোৎসর্গের ওপর অবিনশ্বর হয়ে টিকে থাকে আদর্শ।
ব্যক্তি-বিশেষ নিজেকে বলি দেয় আদর্শের অম্লান পাদমূলে।
মৃত্যুহীন আদর্শ রূপান্তরিত হয়ে ফুটে ওঠে
অন্য আর-এক জীবনে।
ব্যক্তি হয়ে ওঠে জাতির প্রতিনিধি।
ন্যাস।
ব্যক্তির মহান দুঃখ-বরণ সার্থক হয়ে ওঠে।
হয়ে ওঠে অনবদ্য।
দেহ জন্ম দেয় দেহ।
জীবন-বহ্নি জ্বালিয়ে দেয় নবজীবনের মশাল বর্তিকা।

* * *

"বৃহৎ আদর্শ আশ্রয় করে বাঁচা আর মরা—
জীবনে এর চাইতে বড় পাওয়া আর কী আছে?
জীবন-কোষের সমিধ দিয়ে অনির্বাণ করে
রাখতে হবে প্রাণ-যজ্ঞের হোমাগ্নি।
অসমাপ্ত কর্ম-যোগ পূর্ণতা পাবে
পরবর্তী জীবনে।
মৃত্যুর বিনিময়ে যে-জীবন উঠলো ফুটে,
তার ধ্রুব বাণী,
পাহাড় ডিঙিয়ে উপত্যকার ওপর দিয়ে,
ছড়িয়ে পড়বে তার দেশ-জননীর শ্যামল-বুকে।
আর দিগবিদিকে।

সাগর ডিঙিয়ে সুদূর ভিন দেশের তটভূমি
শুনতে পাবে সেই অমর বাণী।

*　　　*　　　*

"কে বলে, নিজেকে নিঃশেষে বিলিয়ে দিলে সর্বহারা হতে হয় ?
মাটির পৃথিবীর কোলে ঢলে পড়েও তার জীবন কি
ফুটে উঠবে না শতদল পদ্মের মতো ?
যার মর্ম-কোষে ভরা থাকে অমৃতের ঝর্ণা ধারা ?

"এই অবিনশ্বরতাই আত্মার প্রকৃত রূপ।
ব্যক্তির মৃত্যুর বুকে
উঠুক ফুটে জাতির জীবন।
তাই তো এমন করে আজ মৃত্যু
আমার কাম্য আর প্রিয়।
আমার জীবনের বিনিময়ে
আমার স্বদেশ,
আমার ভারতবর্ষ
লাভ করবে অবিনশ্বর জীবন,
পাবে স্বাধীনতা,
পাবে অনন্ত ঐশ্বর্যের উপচার।"

ভারতবর্ষে তোলা নেতাজির সর্বশেষ ছবি

আনন্দবাজার পত্রিকা-গৃহীত, নেতাজি রিসার্চ ব্যুরোর সৌজন্যে মুদ্রিত

নেই। জেলখানায় পা দিতে-না-দিতে এমন কাণ্ড বাধিয়ে বসলেন যে, তার ঠেলায় শৃঙ্খলা বুঝি অটুট আর থাকে না।

পাশে দাঁড়িয়েছিলেন প্রবীণ নেতা হেমচন্দ্র ঘোষ। সারাক্ষণ একটি কথাও বলেননি। জেলার চলে যেতেই হেমবাবুর মুখে হাসি ফুটে উঠল। হাসতে হাসতে বললেন: "এটা কী হলো? প্রথম কিস্তি?"

হো-হো করে হেসে উঠলেন নেতা। সঙ্গে সঙ্গে ছেলের দলও। অট্টহাসির সে এক ঐকতান।

মহলটা রাজবন্দীদের। ইংরেজ পণ করেছে, হিটলারের দাপট থেকে ভারতবর্ষকে রক্ষা করতেই হবে। ভারতরক্ষার এই মহান দায়িত্ব তার। ইংরেজের। এর তাগিদে সবাই স্থান পেয়েছে জেলখানায়।

ওদের আর তর সইল না। নেতাকে সরিয়ে নিল। রাখল ভিন্ন মহলে। নাম ইওরোপিয়ান ওয়ার্ড। এমনিতেই এই মানুষ, সঙ্গে ঐ ছেলের দল। অঘটন যাতে না ঘটে, তা দেখতে হবে বইকি।

বোঝাবুঝি পূর্বাহ্নেই হয়ে গেছে। ইংরেজ আর অপেক্ষা করবে না। করতে পারেও না। একে একে তার সব যেতে বসেছে। ডানকার্কের মার তাকে পাংশু করে ছেড়েছে। ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে শত্রুর বিমান। পথে পথে সাবমেরিন। অজেয় বৃটিশ নৌবহর কুপোকাৎ হতে বসেছে।

অনেক পূর্বেই সুভাষ বোসকে বন্দী করা উচিত ছিল! ইংরেজ তা করেনি। ভুল করেছে ইংরেজ। কংগ্রেস থেকে নির্বাসিত হবার পর ইংরেজ ভেবেছিল, সুভাষ বোসের প্রভাব কমে যাবে। কিন্তু যায়নি। বরং বেড়েছে। স্বয়ং গান্ধী বলেছেন একথা।

ইংরেজের পরাজয়-কামনা এদেশে বেড়ে চলেছে। কথায় কথায় প্রকাশ্যে একথা সবাই বলে ফেলে। লোকের মতিগতির এই

দুঃসংবাদ পুলিস ওদের কানে তুলে দেয়। সুভাষ বোসই এর জন্য সবচাইতে দায়ী, একথাটাও বলতে ভোলে না।

১লা জুলাই। নেতা তাঁর অবর্তমানে সর্দার শার্দুল সিংকে মনোনীতকরলেন ফরোয়ার্ড ব্লকের সভাপতিপদে। নাগপুর সম্মেলনে এই মনোনয়ন-ক্ষমতা তাঁকে দেয়া হয়েছিল।

এর পরই নির্দেশনামা। ডেকে পাঠালেন দুপুরবেলা। গেলাম। ঘরে ঢুকে বসতেই বললেন: "আগামীকাল আমাকে তো ধরবেই, অনেককেই ধরতে পারে। পর পর কে কে সেক্রেটারী হবে তার একটা লিস্ট করে ফেলো।"

২রা জুলাই। বেলা ১১টায় বেড়িয়ে পড়লেন। একটি মাত্র মানুষই পরিস্ফুট হয়ে ধরা দিল দৃষ্টির গোচরে। রবীন্দ্রনাথ। বিদায় নিতে হবে না? নিতে হবে না আশীর্বাদ? এ-যাত্রা কোথায় গিয়ে সমাপ্তির রেখা টানবে, তার তো নিশ্চয়তা নেই। টানবে কি না, তাই-বা কে জানে।

সেদিনকার গোপন সাক্ষাৎকারে কী কথা হয়েছিল, জানাবার উপায় নেই। কিন্তু বেরিয়ে এসেছিলেন অগাধ তৃপ্তি নিয়ে। গাড়িতে বসেই বলে উঠলেন: "কী ভালোই লাগছে আমার।" মুখের দিকে শুধু তাকিয়েই ছিলাম। আমাকে নামিয়ে দিয়ে ফিরে গেলেন এলগিন রোডে।

সেদিন জানতাম না, কিন্তু জানলাম পরদিনই। কবিগুরুর আশীর্বচন প্রকাশিত হল সংবাদপত্রে। কবি বিবৃতি দিয়েছেন: "ব্যক্তিগত ভাবে সুভাষকে আমি স্নেহ করি।···তিনি দেশকে অন্তরের সঙ্গে ভালবাসেন এবং দেশ-বিদেশের রাজনীতি চর্চা করেছেন। সেই জন্য তাঁর কাছ থেকে আমি আশা করি এবং দাবী করি তিনিও দেশকে তার বর্তমান দুর্গতির জটিলতা থেকে উদ্ধার করবেন, তার সাংঘাতিক অনৈক্য-গহ্বরের উপরের সেতু বন্ধন করবেন, তাঁর প্রতি দেশের সকল শ্রেণীর লোকের বিশ্বাসকে উদ্বুদ্ধ করবেন, তাঁর

দেশ-সেবা সার্থক হবে। চারিদিকের দলীয় আঘাতে তাঁর মনকে উদ্‌ভ্রান্ত না করে, তাঁর প্রতি আমার এই সস্নেহ শুভ কামনা।"

ব্যারিস্টার বি. সি. চ্যাটার্জি অপেক্ষা করছিলেন নেতার বসবার ঘরে। আগে থেকেই ব্যবস্থা ছিল। উভয়ের কথা চলতে লাগল। বেলা তখন দুটো পনের।

জানব্রিন এসে দাঁড়াল সিঁড়ির মাথায়। জে. ভি. জানব্রিন। কলকাতা পুলিসের ডেপুটি কমিশনার। ডানদিকে নেতার বসবার ঘর বাঁ-দিকে সাক্ষাৎপ্রার্থীদের। জানব্রিনের সঙ্গে ছিল দুজন দেশীয় পুলিস কর্মচারী। জানব্রিন দেখা করতে চায়। তাকে বলা হয়, নেতার ঘরে লোক আছে। তিনি ব্যস্ত আছেন। অপেক্ষা করতে হবে।

দুটো ত্রিশে ডাক পড়ল। জানব্রিন সামনে ধরল পরোয়ানা। ভারত-রক্ষা বিধির ১২৯ ধারার পরোয়ানা। অতিরিক্ত সর্ত জুড়ে দেয়া হয়েছে। থাকতে হবে আপাতত প্রেসিডেনসী জেলে। পরের ব্যবস্থা যথা সময়ে জানানো হবে। তিনদিনের মধ্যে কারও সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ নামঞ্জুর।

জানব্রিনকে অপেক্ষা করতে বলে নেতা ভেতরে চলে গেলেন। মা-জননী দাঁড়িয়েছিলেন শোবার ঘরের দোর-পথে। নির্বাক পুতুল। শত প্রশ্ন ঠিকরে পড়ে চোখের কোণ বেয়ে। উদ্যত অশ্রুর উদ্বেল স্রোত সবলে রোধ করে প্রণত পুত্রের মাথায় হাত রাখলেন জননী। কথা ফুরিয়ে গেল।

মিনিট পনের পর নেতা এসে দাঁড়ালেন জানব্রিনের সামনে। জানব্রিন বসে ছিল, উঠে দাঁড়াল। বলল ঃ "ঠিক ক'টায় আপনাকে আমি বন্দী করেছি মিঃ বোস? দুটো পনের, না দুটো কুড়ি? প্রেসের লোক আমাকে ছিঁড়ে খাচ্ছে।"

নেতা হাসলেন। হাসতে হাসতেই বললেন ঃ "পাঁচ মিনিট

আগে বা পরে ও-কাজটা হয়ে থাকলে অবস্থাটার কিছুমাত্র ব্যতিক্রম ঘটবে না।"

গাড়ি বেরিয়ে গেল।

"হলোওয়েল মনুমেণ্ট সংক্রান্ত মুখ্যমন্ত্রীর বিবৃতি আমি পড়েছি। বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভাপতির পত্র তাঁকে দেয়া হয় গত ১৮ই জুন। বিষয়টি বিবেচনা করবার জন্য গভর্ণমেণ্ট পর্যাপ্ত সময় পেয়েছিলেন। কিন্তু এ-বিষয়ে আজ পর্যন্ত কিছু করবার প্রয়োজনীয়তা গভর্ণমেণ্ট উপলব্ধি করেননি। মাসের শেষের দিকে মুখ্যমন্ত্রী একটা স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছবেন বলে পূর্বে এক বিবৃতি দিয়েছিলেন; কিন্তু সেই স্থির সিদ্ধান্তের কোন হদিস বা তার আভাস আজও জানা গেল না। গভর্ণমেণ্টের সময় কাটাবার অভিসন্ধি আমাদের অজানা নয়। রাজবন্দীদের মুক্তি সম্পর্কে তাঁদের নীতি ও রীতির তিক্ত অভিজ্ঞতা আমাদের আছে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে মুখ্যমন্ত্রীর বিবৃতি অত্যন্ত নৈরাশ্যজনক বলেই আমরা মনে করি। এবং আমার পূর্ব-ঘোষিত ৩রা জুলাই এর কর্মসূচীও অপরিবর্তিত থাকবে, এ কথাটাও আমি জানিয়ে দিতে চাই।' জনসাধারণের দাবী মেনে নেবার সদিচ্ছা যদি সত্যিই গভর্ণমেণ্টের থাকে, আগামী ২৪ ঘণ্টার মধ্যে সে-কথা তাঁরা দেশবাসীকে অতি সহজেই জানিয়ে দিতে পারবেন।"

সুভাষচন্দ্রকে বন্দী করবার পরদিন, ৩রা জুলাই-এর প্রভাতী সংবাদপত্রে নেতার বিবৃতি প্রকাশিত হয়। সরকার সহসা নেতাকে বন্দী করেছিলেন, এর পেছনে কোন পূর্ব-সিদ্ধান্ত ছিল না, ছিল না কোন ব্যাপক পরিকল্পনা,—কথাটা মেনে নেওয়া একটু কষ্টকর বইকি।

(১) হলোওয়েল মনুমেণ্ট উৎখাত করতে সত্যাগ্রহ শুরু হবে ৩রা জুলাই ১৯৪০, এবং নেতা স্বয়ং প্রথম বাহিনী পরিচালিত করবেন বলে ঘোষণা করা হয়েছিল। তাঁর বিবৃতি প্রথম খণ্ডে দ্রষ্টব্য।

বন্দী করবার সিদ্ধান্ত পূর্বেই গ্রহণ করে কপটতা ছলনার আশ্রয় নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মাসের শেষে তাঁদের সিদ্ধান্ত জানাবার আশ্বাস দিয়েছিলেন। আশ্বাস দিয়েছিলেন জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করতে, আন্দোলন বানচাল করতে এবং একথা ভেবে যে, সুভাষচন্দ্রের অবর্তমানে সত্যাগ্রহের হুমকি অকৃতকার্য হবেই। কিন্তু নেতার বিবৃতি সরকারী ধোঁকার জাল নিমেষে টুকরো টুকরো করে বের করে দিল ইংরেজের তাঁবেদার এই ভণ্ড সরকারের স্বরূপ।

যথা সময়ে পূর্ব-ঘোষণানুযায়ী সভা বসল অ্যালবার্ট হলে। সভায় দেখা গেল অনেককেই। শুধু দেখা গেল না তাঁকে। শিবহীন যজ্ঞ সমাপন করে গৃহে ফিরে এলাম। পরবর্তীকালে এই সভার বক্তৃতাই আমাকে বন্দী করবার প্রধান হাতিয়ার হয়েছিল ওদের।

এই দিনই, ৩রা জুলাই, বসল ওয়ার্কিং কমিটির জরুরী সভা দিল্লীতে। আগেই মহাত্মাজি বড়লাটের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন! সবাই উদগ্রীব হয়ে অপেক্ষা করছিল। গান্ধী ফিরেও এসেছিলেন হতাশ হয়েই। অনেক মাথা খাটিয়ে ওয়ার্কিং কমিটি যে গুরু-গম্ভীর প্রস্তাব গ্রহণ করল, জাতির দীর্ঘ তপস্যার মূলে শুধু তা কুঠারাঘাতই করেনি, পরন্তু গান্ধীজির মৌল সিদ্ধান্ত ভূমিসাৎ করে ইংরেজের দিকে সংগ্রামী ভারতবর্ষের সহযোগিতার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত পরিস্ফুট করে তুলল। "ইংরেজকে দিতে হবে পূর্ণ স্বাধীনতার আশ্বাস। আর সেই সদিচ্ছার প্রমাণ স্বরূপ অনতিবিলম্বে এমন একটি অস্থায়ী জাতীয় সরকার গঠন করতে হবে, যার প্রতি পরিপূর্ণ আস্থা থাকবে নির্বাচিত কেন্দ্রীয় অ্যাসেমব্লীর সদস্যদের। একমাত্র জাতীয় সরকারই স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে ইংরেজকে বর্তমান যুদ্ধে সাহায্য করতে সমর্থ হবে।"

ওয়ার্কিং কমিটি এই পরম প্রতিশ্রুতি দিতেও সেদিন কুণ্ঠিত হল না যে, কমিটির এই আবেদন মঞ্জুর হলে "কংগ্রেস তার সমগ্র শক্তি নিয়োগ করবে কার্যকরীভাবে ভারত-রক্ষার কাজে।"

সেদিন কংগ্রেস সভাপতি মৌলানা আবুল কালাম আজাদ ও পণ্ডিত জহরলাল নেহরুর নেতৃত্বে ভারতীয় কংগ্রেসের গোটা কাঠামো এক অশোভন, অযৌক্তিক ও অনাবশ্যক তৎপরতার সঙ্গে কংগ্রেসের বহুপূর্ব ঘোষিত নীতিই শুধু অমান্য করেনি, সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজদের সহস্র কপট আচরণ বিস্মৃত হয়ে জাতিকে এক পঙ্কিল ও অনিশ্চিত দৌর্বল্যের অন্ধ পথে পরিচালিত করতে সহসা রুখে উঠলেন কেন, হয়তো এ-প্রশ্ন কারও মনে জেগেও থাকবে, কিন্তু সামান্য দুই-একজন ছাড়া প্রকাশ্যে এ-প্রস্তাবের বিরুদ্ধাচরণ করবার স্পর্ধা কারও হয়নি বা মনোবৃত্তিও দেখা দেয়নি।

জহরলালের সেই চিরাচরিত থিয়োরীর খেল এ-ক্ষেত্রেও সোচ্চার হয়ে উঠল। ইংরেজ ডেমোক্র্যাসির বাহন আর হিটলার ফ্যাসিস্ট। জগৎ বর্বর ফ্যাসিজিমের হিংস্র কবলে যদি নিজেকে নিঃশেষে সমর্পণ করেই ফেলে, জহরলাল,—তথা বিশ্বের উদারনৈতিক মানুষগুলি বাঁচাবে কেমন করে? থাকবেই-বা কোথায়?

তাছাড়া গান্ধীবাদ : অহিংসা আর খদ্দর দিয়ে যদিও-বা ইংরেজ-বিতাড়ন সম্ভবপর হয়ই, হিটলারও কি ওতে ভয় পাবে? জহরলাল তথা সেদিনের কংগ্রেস ইংরেজকে ভারতরক্ষার যে-নির্বিশেষ ও 'কার্যকরী' ব্যবস্থার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তার পেছনে আর যাই থাক অহিংসার কোন বিন্দুপরিমাণ সম্পর্কও ছিল না। কংগ্রেসের সক্রিয় ব্যবস্থায় যে-কর্মপন্থা নির্ধারণ করতে হবে, গান্ধীবাদ অথবা অহিংসানীতি তাতে করে কি অক্ষতই থাকবে?

"না।"

সর্বপ্রথম প্রতিবাদের এক প্রবল ধিক্কার বেরিয়ে এল সীমান্তগান্ধী আব্দুল গফ্ফার খাঁয়ের কণ্ঠ হতে। তিনি ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য পদে ইস্তফা দিয়ে এক বিবৃতি দিলেন : "ওয়ার্কিং কমিটির সদ্য গৃহীত প্রস্তাব এই কথাই প্রমাণ করেছে যে, কমিটি একমাত্র ভারত-সরকারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম কালেই অহিংসানীতি-ব্যবহার সীমাবদ্ধ

রাখতে চায়। আমি এতকাল যে-অহিংসায় বিশ্বাস স্থাপন করে এসেছি, তার পরিধি আরও ব্যাপক ও বিস্তৃত।”

গান্ধী স্বয়ং গেলেন আরও এক ধাপ এগিয়ে। তিনি স্পষ্ট করেই বললেন: “আমার ও সর্দারের মধ্যে মত-পার্থক্য আজ প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছে। তাই বলে একথা আমি বলবো না যে, আমাদের হৃদয়ও পৃথক হয়ে গেছে। রাজাজি যে কর্মপন্থা নিজে কর্তব্য হিসাবে দৃঢ়তার সঙ্গে অঙ্গীকার করে নিলেন, তার সঙ্গে বিরোধ করাও কি সঙ্গত হবে?”

কিন্তু গান্ধী এই বলেই ক্ষান্ত রইলেন না। আরও স্পষ্ট ও তীক্ষ্ণ হয়ে বলে ফেললেন: “বক্ষ্যমান প্রস্তাব দ্বারা কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি এই কথাই বলতে চেয়েছে যে, দেশের আভ্যন্তরীণ গোলযোগের সময় অহিংসার ফলপ্রদ-প্রয়োগ সম্ভবপর হলেও বহিরাগত শত্রুর আক্রমণ প্রতিহত করবার ক্ষমতা অহিংসার নেই। অহিংসার প্রতি এই বিশ্বাসহীনতায় আমি ব্যথিত।”

সেদিনের গান্ধী চোখের সম্মুখে তাঁর দীর্ঘদিনের মতবাদের অস্তিমদশা দেখে হয়তো বিস্মিত হয়েছিলেন, তাঁর পক্ষে বেদনা-কাতর হওয়াও হয়তো হয়েছিল একান্তই স্বাভাবিক, কিন্তু তাঁর চিহ্নিত ভক্ত, ধারক ও বাহক শিষ্যদের এই অচিন্ত্য ডিগবাজী তাঁর চোখের সম্মুখে এক বিচিত্র এবং নবতম মানসভঙ্গীর রুদ্ধদুয়ার খুলেও দিয়েছিল! তাই তিনি নির্দ্বিধায় বলেও ফেললেন: “জনসাধারণ নয়, সর্দারের ন্যায় লোকেরাই অহিংসার পথ পরিত্যাগ করেছে।”

সেদিন প্রকাশ্য সভা, মিছিল বা ধর্মঘটের পথে বাধা ছিল প্রচুর। তা সত্ত্বেও প্রতিবাদ বড় কম হল না। বহুস্থানে সীমাবদ্ধ সভা হল। সভা হল নানা বার-লাইব্রেরীতে। অধিকাংশ মিউসিপ্যালিটি ও কর্পোরেশনে প্রতিবাদ প্রস্তাব গৃহীত হল। কলকাতা কর্পোরেশনের

সভায় মেয়র সিদ্দিকী উত্তেজিত কণ্ঠে বললেন : "শ্রীযুক্ত বসুর ন্যায় সর্বজনমান্য নেতার এই অহৈতুক গ্রেপ্তারে আমাদের মনে অস্বস্তিকর ধাক্কা দিয়েছে।" (unpleasant shack)

বম্বে কর্পোরেশন সভার অধিবেশন স্থগিত থাকল। বিলেতে হাউস অফ কমন্সে প্রশ্নোত্তরে এল. এস. অ্যামেরী বললেন যে, হলোওয়েল মনুমেণ্ট উৎখাত করবার অয়োজন করায় মিঃ বোসকে বন্দী করা লয়েছে।

১৫ই জুলাই বঙ্গীয় অ্যাসেমব্লীতে মুলতুবি প্রস্তাবের প্রত্যুত্তরে মুখ্যমন্ত্রী ফজলুল হক বললেন : "আমরা সবাই সুভাষচন্দ্রকে ভালবাসি, শ্রদ্ধা করি, এবং তাঁর প্রতি অনুরক্তও। এদেশের রাজনীতি ক্ষেত্রে তিনিই সর্বাপেক্ষা প্রিয় ব্যক্তি।" (is the most lovable personality)

কিন্তু নীরব রইল ভারতবর্ষের অদ্বিতীয়, আদি ও অকৃত্রিম রাষ্ট্রীয় সংস্থা—কংগ্রেস। ২রা জুলাই সুভাষচন্দ্রকে ইংরেজ বন্দী করে। ৩রা জুলাই বসে ওয়ার্কিং কমিটির সভা দিল্লীতে। কমিটি সবলে কণ্ঠরুদ্ধ করে এক চরম ঔদাসীন্যে ইংরেজের হিংস্র ঔদ্ধত্য শুধু উপভোগই করেনি, পরন্তু ইংরেজকে প্রশ্রয়ও দিয়েছে।

কংগ্রেস বাইরে অনাসক্ত ও নির্বিকার ভাব দেখালেও অন্তরে কি সেদিন কারও, কোনও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরই মৃদুতম দোলাও লাগেনি ? দীর্ঘদিনের সঙ্গী, দু'বারের নির্বাচিত সভাপতি, আর কিছু না হোক, 'দেশের শত্রু নয়' সুভাষ বোসের জন্য সত্যই কি সেদিন মহাত্মা গান্ধী বা জহরলাল একটি সহানুভূতি বা প্রতিবাদের বাণীও অন্তরে অনুভব করেননি ?

না করবার উপায় নেই, করেছিলেন।

ওয়ার্কিং কমিটির কর্ম সমাধা করে মহাত্মা গান্ধী ফিরে আসছিলেন ওয়ার্ধা। নাগপুর স্টেশনে গান্ধীর কামরায় সহসা উঠে আসে একটি যুবক। আর কোনও কথা না বলে তীরের ফলার

মতোই মাত্র একটি প্রশ্ন মহাত্মা গান্ধীর মুখের ওপর ছুড়ে মারে এই যুবক : "ওয়ার্কিং কমিটির সভায় সুভাষচন্দ্রের গ্রেপ্তার সম্পর্কে একটি কথাও বলা হলো না কেন ? কেন কমিটির দৃষ্টি এমন করে পাশ কাটিয়ে গেলো ?"

বিমূঢ় গান্ধী সেদিন এবং সেইক্ষণে কোন উত্তরই দেননি। দিতে পারেননি। ১৪ই জুলাইয়ের হরিজন পত্রিকায় দীর্ঘ এক প্রবন্ধে গান্ধী এ-প্রশ্নের জবাব দিতে চেষ্টা করেছেন। গান্ধী লিখছেন : "আমার মুখ দিয়ে কথা ফুটলো না। কোন উত্তর তাই দিলামও না। আমি এ-বিষয়ে নিঃসন্দেহ যে, সেদিনের ঐ প্রশ্ন ঐ একটিমাত্র যুবকের প্রশ্ন নয়, দেশের লক্ষ লক্ষ মানুষের মনেও এ প্রশ্ন দোলা দিয়েছে।" (I have no doubt that hundreds of thousands must have asked themselves the question the youngman put at Nagpur.)

এর পর গান্ধী লিখে চলেছেন : সুভাষবাবু ভারতীয় কংগ্রেসের একজন ভূতপূর্ব রাষ্ট্রপতি। দু'বার ক্রমান্বয়ে ঐ পদে অভিষিক্ত হয়েছেন। মহান ত্যাগের শিখায় তাঁর জীবন প্রোজ্জ্বল। নেতা হয়েই তিনি জন্মগ্রহণ করেছেন।" (He is leader born)

এ সবই সত্য। গান্ধী জানেন এসব কথা। কিন্তু গুণী ব্যক্তির কি দুনিয়ায় অভাব আছে ? বিশ্ব-সংসারে গুণ ও গুণীর সম্বর্ধনা করা আর তার সম্পর্কে ওয়ার্কিং কমিটিতে প্রস্তাব গ্রহণ করা কি একই কথা ? না। এক নয়।

"Subhas Babu did not defy the law with the permissian of the Congress. He has frankly and courageously defied even the working committee."

যথেষ্ট। ওয়ার্কিং কমিটির বিনা অনুমতিক্রমে আইন ভঙ্গ করতে চেয়ে সুভাষচন্দ্র যে মহাপাতকের বোঝা নিজের স্কন্ধে তুলে নিলেন, তার দায়িত্ব শুধু তাঁর একার। এইসব তুচ্ছ ও ক্ষুদ্র ব্যক্তিগত ঘটনায়

ওয়ার্কিং কমিটির ন্যায় বৃহৎ প্রতিষ্ঠান মাথা ঘামাতে চায় না। হয়তো সঙ্গতও নয়। অনেক বড় আর গম্ভীর চিন্তা কমিটির মাথার ভেতর কিলবিল করছে অহরহ। খুঁড়ে খাচ্ছে। ইচ্ছা থাকলেও, ছাই, সময়ই যে নেই। তাছাড়া ভদ্রলোক ওয়ার্কিং কমিটিকে নিজেই পূর্বে অবজ্ঞা দেখিয়েছেন। কথাটা কমিটির পক্ষে ভোলা সহজ তো নয়ই, সঙ্গতও কি ?

সত্য কথা। এবং সাফ কথাও।

সুভাষচন্দ্র যে আইন অমান্য করবার অবকাশই পাননি,—অমান্য করবার পূর্বেই তাঁকে ভারতরক্ষা বিধি অনুযায়ী বন্দী করা হয়েছে, হয়তো গান্ধী একথা জানতেন না। কিম্বা জানলেও, প্রকৃত আইন অমান্য এবং অমান্যের সঙ্কল্পের মধ্যে আইনগত পার্থক্য থাকলেও সত্যাগ্রহের মানদণ্ডে যে ওতুটো একই, গান্ধীর অভিমত সম্ভবত এই। গান্ধী সত্যাগ্রহী।

কিন্তু সর্দার বল্লভভাই আর রাজাজি ? পণ্ডিত জহরলাল সম্পর্কে গান্ধীর মতামত আর অজানা নয়। প্ল্যানিং কমিটি গঠন করে সুভাষচন্দ্র গান্ধীর বিরাগভাজন হয়েছিলেন। ওয়ার্কিং কমিটির একটি অবাঞ্ছিত ও অযৌক্তিক প্রস্তাবের প্রতিবাদ করে সুভাষচন্দ্র কংগ্রেস থেকে নির্বাসিত হন,—তবুও এ-কথা তো পরম সত্য যে, তিনি গান্ধীর মৌল নীতির কোনদিন বিরুদ্ধাচরণও করেননি কিম্বা অমর্যাদাও দেননি।

গান্ধীর প্রধান বৈশিষ্ট্য, রাজনীতি ক্ষেত্রে অহিংসার মাধ্যমে সত্যাগ্রহের প্রবর্তন। সেই মূলনীতি, গান্ধীর আজীবনের সাধনা, মুহূর্তে ধূলিসাৎ করেও সর্দার তাঁর প্রিয়ই থাকলেন, রাজাজির সংশ্রব ত্যাগ করবার কথা তাঁর কল্পনার বাইরে। মোদ্দা কথা দলীয় চক্র ও তার প্রভাব সেদিন গান্ধীর মতো ব্যক্তিও অতিক্রম করতে পারেননি, এই কথাটিই ইতিহাসের বুকে অক্ষয় হয়ে থাকল।

গান্ধীর দীর্ঘ প্রবন্ধ যুক্তিহীন, একথা না বলেও স্বীকার করতেই

হবে যে, ওটা আগাগোড়া কষ্টকল্পিত। ওয়ার্কিং কমিটির অননুমোদিত এবং নীতিবিরুদ্ধ কোন কাজেরই কোন আলোচনা বা কোন বিষয় সম্পর্কে কোনদিনই কি কোনও প্রস্তাব গৃহীত হয়নি? ভগৎ সিং কি ওয়ার্কিং কমিটির অনুমতি নিয়ে কেন্দ্রীয় অ্যাসেমব্লী হলে বোমা ছুড়েছিলেন? উধম সিং কি মাইকেল ও ডায়ারকে হত্যা করেছিলেন ওয়ার্কিং কমিটির অনুমতি নিয়ে? আরউইনের গাড়ি ডিনামাইটে উড়িয়ে দেবার চেষ্টাও কি ওয়ার্কিং কমিটির অনুমতিক্রমেই হয়েছিল? এসব ক্ষেত্রে ওয়ার্কিং কমিটি প্রস্তাব গ্রহণ করেছিল কেমন করে?

আরও আছে। প্রতি বছর দেশের গণ্যমান্য মৃত ব্যক্তিদের জন্য শোক প্রকাশ করবার রেওয়াজ ওয়ার্কিং কমিটি তথা কংগ্রেসের চিরাচরিত প্রথা। যারা মরে তারা কি ওয়ার্কিং কমিটির অনুমতি নিয়েই মরে আসছে?

জানি এর সমুচিত উত্তর দেয়া সেদিনের গান্ধীর পক্ষে ছিল সাধ্যাতীত। তবুও বলব, এই মহান ব্যক্তি দলের বাইরে এসে যে রূপ ও রুচির পরিচয় দিতেন, তা শুধু অনন্যই নয়,—গান্ধী স্বাতন্ত্র্যে তা সমুজ্জ্বলও।

প্রবন্ধের শেষের দিকে গান্ধী তাঁর অননুকরণীয় ভাবে ও ভাষায় লিখলেন: "এসব সত্ত্বেও যদি তাঁর (সুভাষের) প্রচেষ্টা জয়যুক্ত হয়ে ওঠে, যদি ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভ করে, তাঁর বিদ্রোহ সার্থক একথা আমি বলবই। এবং সেদিন কংগ্রেস তাঁর বিদ্রোহের শুধু বিরূপতা না করেই ক্ষান্ত থাকবে না,—তাঁকে মুক্তিদাতা বলে স্বাগতও জানাবে।"

সত্যাগ্রহী গান্ধীর এই সত্যদর্শন ও ঘোষণাকে অস্বীকার করবে?

ইংরেজ অনেক সহ্য করেছে, আর নয়। নেতাকে বন্দী করবার সঙ্গে সঙ্গে তার দৃষ্টি ছড়িয়ে পড়ল দেশের সর্বত্র। সুভাষচন্দ্রের অনুগামীদের কাউকে আর বাইরে রাখবে না। ধরে পুরে দেবে পাষাণকারার অন্তরালে। অনেক আগে থেকেই ইংরেজ জাল ফেলে

চলেছে। বিভিন্ন প্রদেশে আর বাংলায় শত শত কর্মীকে সে বিনা বিচারে আটক করেছে। এইবার শেষ টান। কেউ যেন বাদ না পড়ে।

সত্যাগ্রহ শুরু হল ৩রা জুলাই, অপরাহ্নে। চারজন স্বেচ্ছাসেবক বন্দী হল। আর বন্দী হলেন হেমন্তকুমার বসু ও কৃষ্ণকুমার চাটুজ্যে।

বৃদ্ধ রাজেন দেব বন্দী হলেন ৫ই জুলাই।

এর পরই আমার পালা। ৬ই জুলাই, বেলা তিনটে তখন। স্পেশাল ব্রাঞ্চের ইন্‌স্পেক্টার মহাসৌজন্য সহকারে একেবারে গাড়ি নিয়ে হাজির হলেন আমার কুটীরে। পরম বিনয়ে বিগলিত হয়ে অনুগমনের আবেদন জানালেন। স্থান হল প্রেসিডেন্সী জেলে।

৯ই জুলাই বন্দী হলেন কালী বাগচী।

সত্যাগ্রহ অব্যাহত। বন্দীর সংখ্যা দাঁড়াল ৪৬।

হাওড়ার হরেন ঘোষ বন্দী হলেন ১১ই জুলাই।

১২ই জুলাই অমর বসু, বিশ্বনাথ মুখুজ্যে, অশ্বিনী গাঙ্গুলী, ফণী মজুমদার, রামকমল দাশ আর শ্রীপ্রসাদ উপাধ্যায়। ১৬ই অনিল রায়, আর ১৭ই নিয়ে এল ওরা অধ্যাপক জ্যোতিষ ঘোষ, লীলা রায় আর রবি সেনকে।

বন্দীর বন্দনায় কারাগার মুখর হয়ে উঠল। সত্যাগ্রহীর সংখ্যা দিনকার দিন চলল বেড়েই। এগিয়ে এল শত শত বাঙালী, বিহারী, শিখ। বাংলার হিন্দু-মুসলমান একযোগে কারাবরণ করল। সংখ্যা তিন শো পেরিয়ে গেল।

অধিকাংশ সত্যাগ্রহীও স্থান পেল প্রেসিডেন্সী জেলে, তবে ভিন্ন মহলে। আমাদের অর্থাৎ ভারতরক্ষার মহান কর্তব্যের খাতিরে যাদের বন্দী করা হয়েছিল, তাদের রাখা হল অন্য আর এক মহলে। দূরে। ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে।

বাঙালী মুসলমান চঞ্চল হয়ে উঠল। পূর্বে টাউন হলে এক জনাকীর্ণ সভায় মুসলমান ছাত্রেরা হলোওয়েল মনুমেণ্ট উৎখাত-

আন্দোলন সার্থক করবার সঙ্কল্প গ্রহণ করে। এর পরই এগিয়ে এল মুসলিম সমাজের গণ্যমান্যেরা। এমন কি হক মন্ত্রিমণ্ডলীর গোঁড়া সমর্থকেরাও। ৭ই জুলাই সর্বপ্রথম বাঙালী মুসলমান স্বেচ্ছাসেবক কারাবরণ করে। এরপর প্রতিদিন।

১১ই জুলাই ঢাকার মুখ্যমন্ত্রী ফজলুল হককে ছেঁকে ধরেছিল অনেকে। নিজের সাফাই নানাভাবে গেয়ে মুখ্যমন্ত্রী বিবৃতি দিলেন যে, সুভাষচন্দ্রকে বন্দী করবার সময় তিনি ছিলেন দিল্লীতে। কলকাতায় ফিরেই তিনি মিঃ বোসের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন বলে স্থিরও করেছিলেন কিন্তু কাজের চাপে হয়ে ওঠেনি। তবে সত্যাগ্রহ সম্পর্কে দিল্লীতে তিনি যা বলেছিলেন, সে-কথায় বর্তমানেও তিনি অটলই থাকবেন। সত্যাগ্রহ প্রত্যাহৃত না হলে মনুমেণ্ট অপসারণের কোন প্রশ্নই তিনি কানে তুলবেন না।

মুখে সেদিন ফজলুল হক অনবনয়নের খুব উঁচু অভিনয় করেও অন্তরে স্থিরই জেনেছিলেন যে, সম্মিলিত বাঙালীর এই গণ-অভ্যুত্থানের বিরোধিতা করে মন্ত্রীর সিংহাসনে টিকে থাকা তাঁর সাধ্যাতীত। শুধু হিন্দু নয়, শুধু মুসলমানও নয়, সমগ্র বাঙালী জাতির এই প্রবল দাবী উপেক্ষা করবার স্পর্ধা তাঁর ছিল না।

১৩ই জুলাই অ্যালবার্ট হলে শুধু জনসাধারণই সমবেত হল না, এল তারাও, যারা অনেকদিন হিন্দুর সঙ্গে কথা বলা ভুলে গিয়েছিল। সভাপতি হলেন আব্দুল করিম, এম. এল. এ. আর সভায় অংশ গ্রহণ করলেন আব্দুল লতিফ বিশ্বাস, নুরুলহুদা, কাজী জহিরুল হক প্রভৃতি। এঁদের সবাই ছিলেন হক-মন্ত্রিমণ্ডলীর সমর্থক। জাতীয়তাবাদী মুসলমানদের তো কথাই নেই। তাঁরা এলেন দলে দলে।

নেতার স্বপ্ন: বাঙালী,—হিন্দু নয়, মুসলমানও নয়,—সমগ্র জাতি এসে দাঁড়াবে শ্যামা বাংলার মুক্ত প্রাঙ্গনে। হাত ধরাধরি করে। কণ্ঠে উদ্গারিত হবে মুক্তির বজ্র কাঁপানো হুঙ্কার, চোখে

সুদূরের স্বপ্নমাখা প্রেমের কাজল। সমগ্র ভারতবর্ষ এসে দাঁড়াবে বাংলার পাশে। দিন আগত ঐ।

সহসা গভর্ণমেণ্ট দুটি মূঢ় আদেশ জারি করে বসল। প্রথমটিতে হলোওয়েল-মনুমেণ্ট-আন্দোলন সংক্রান্ত কোন দলিল, বিজ্ঞপ্তি, গ্রেপ্তার-সংবাদ কিম্বা সভা বা মিছিলের বিবরণ কোন সংবাদপত্রে বা পুস্তিকায় ছাপানো ভারতরক্ষা বিধানে নিষিদ্ধ হলো। দ্বিতীয়টির প্রয়োগ হলো ছাত্রদের ওপর। সভা, সমিতি, কোন মিছিল বা ধর্মঘটে স্কুল বা কলেজের ছাত্রেরা যোগদান করলে তো বেআইনী কাজ বলে গণ্য করা হবে। এবং শিক্ষায়তন থেকে বহিষ্কার পর্যন্ত শাস্তির সীমাও নির্ধারিত হতে পারবে।

একদিনে আগুন জ্বলে উঠল সারা কলকাতায়। সুভাষচন্দ্রের আবেদনে যা পূর্ণ হতে অন্তত কিছুটা সময় লাগত, গভর্ণমেণ্টের মূঢ় ও রূঢ়নীতি ও অনুষ্ঠান তাকে উদ্দীপ্ত করে তুলতে কালবিলম্ব করল না।

সরকারী খাঁড়ার প্রথম বলি হলো ইসলামিয়া কলেজ। ছেলেরা সমবেত হয়েছিল কলেজ প্রাঙ্গণে। কোন প্রকার উপদ্রব বা অশান্তির চিহ্নও ছিল না সভায়। প্রতিবাদের প্রবলতা ছিল ছেলেদের কণ্ঠে। কিন্তু হাত ছিল নগ্ন। অকস্মাৎ পুলিশ এল গুর্খা আর পেশোয়ারী গুণ্ডা নিয়ে। লাঠি চালাল বেপরোয়া। নির্দয় আঘাতে ছেলের দল লুটিয়ে পড়ল মাটির বুকে। লাল রক্তে ভিজে গেল প্রাঙ্গণের সবুজ ঘাস।

কিন্তু উষ্ণ রক্তের সে-ফিনকি ছিটকে কলকাতার নানা স্থানে লাগতে সময়ও লাগল না। দলে দলে ছেলেরা বেরিয়ে এল স্কুল ছেড়ে, কলেজ ফেলে। ময়দান, মাঠ, পার্ক ভরে গেল। উপচে পড়ল রাজপথে। ২৮শে জুলাই, এক জনসমুদ্র সমবেত হলো ওয়েলিংটন স্কোয়ারে। সেখান থেকে পথে।

বিমূঢ় ফজলুল হক ছুটে এলেন ইসলামিয়া কলেজে। সাফাই

গাইতে গিয়ে স্তব্ধ হয়ে গেলেন। সম্মুখের আহত ছেলেদের দেখে কথা ওঁর ফুরিয়ে গেল। ছুটে গেলেন অ্যাসেমব্লীতে। সারাদিন কাটল সলা আর পরামর্শে। সন্ধ্যার প্রাক্কালে ঘোষণা করলেন অ্যাসেমব্লীতে যে, হলোওয়েল মনুমেণ্ট অপসারিত করবার ব্যবস্থা হয়েছে। কালবিলম্ব না করে ওটাকে অন্য কোথাও সরিয়ে দেওয়া হবে।

সঙ্গে সঙ্গে বিরোধী দলের নেতা শরৎ বসুও আবেদন জানালেন প্রথমেই দেশবাসীকে উদ্দেশ করে। সত্যাগ্রহ সার্থক হয়েছে। আর নয়। আন্দোলন বন্ধ রাখাই হবে সমীচীন। সরকার পক্ষকে অনুরোধ জানাতে শরৎবাবু ভুললেন না। সত্যাগ্রহীদের এবং এর সঙ্গে ভারতরক্ষা আইনে আটকানো বন্দীদের মুক্ত করা সরকারের তরফ থেকে হবে শোভন ও সঙ্গত।

রুদ্ধ কারার লৌহ-কীলক অগ্রাহ্য করে সংবাদ ছড়িয়ে পড়ল কারাগারের অভ্যন্তরে। আনন্দে চিৎকার করে উঠল বন্দীর দল। সাফল্যের জয়টীকায় ললাট ওদের রক্তিম। কণ্ঠে ওদের জয়ধ্বনি।

২৯শে আগস্ট সবাইকে ওরা ছেড়ে দিল। অশ্রু-ভেজা চোখে আর নিরুদ্ধ কণ্ঠে বন্ধুরা বিদায় নিলেন একে একে। পড়ে থাকলাম আমি একা। তখনও জানতাম না যে, আরও একজন থেকে গেলেন কারাকক্ষে।

জানলাম পরে।

বাইরের আকর্ষণ ডাকে বইকি। ডাকে পুত্র-কন্যা! ডাকে আত্মীয়স্বজন। আমাকেও ডেকেছিল। মিথ্যে বলব না, বুকের ভেতর একটা অব্যক্ত ব্যথাও অনুভব করেছিলাম। সেই শূন্য ঘরের প্রশস্ত রিক্ততা আমাকে কম দোলা দেয়নি। তবুও আজ বলব, অনাগত, অসম্ভাব্য ও অজানা ভবিষ্যতের যে বিপুল বিচিত্র ও বিশেষ সৌভাগ্য আমার জন্য অপেক্ষা করছিল, তাও সেদিন আমার অজ্ঞাতই ছিল।

জানলাম পাঁচদিন পর।

২

দোরটা খোলাই ছিল। শিক বসানো গরাদ। হুড়কোয় আটকানো। একখানা সুজনি দিয়ে পর্দা করা হয়েছে। আগে আগে হেঁটে ঘরে গিয়ে ঢুকলেন। পাশে আমি। বললেন: "ঘণ্টা দুই আগে বলে গেল যে, তুমি এখানে আজই আসছো। এর বেশি আর কিছু করতে পারলাম না।"

মহলের নামটা বেশ জমকালো। ইওরোপিয়ান ওয়ার্ড। অর্থাৎ পাতলুন-কোট-পরা লোকদের থাকবার মহল ক্বচিৎ কালেভদ্রে দু-একজন ইওরোপিয়ান আসে। হয় স্মাগলার, আর না হয়তো গাঁটকাটা।

দোতলা বাড়ি। ওপরে পাঁচখানা, আর নিচে পাঁচখানা করে ঘর। ওরা বলে সেল। সামনে গরাদ বসানো দরজা, পেছনে শিক বসানো ফোকর। তাও ওপরের দিকে। নাগালের বাইরে। ঘরগুলো এক সারিতে। সামনে চওড়া দালান। প্রান্তঘেঁষা রেলিং।

অপরাহ্ণ যাব যাব। সন্ধ্যার ঘোর নেবে আসছে আকাশ থেকে। সামনের বড় বড় অশথ গাছের নিবিড় ছায়া আরও কালো করে ফেলেছে ঘরের ভেতরটা। একাই ছিলাম একদিন। পরে এল কয়েকজন।

চা শেষ করে টেবিলেই আমরা বসে ছিলাম। সামনে এসে দাঁড়াল সার্জেন্ট। আমাকে এখুনি অন্যত্র যেতে হবে। গন্তব্যস্থল জানতে চেয়েছিলাম। ও ভাঙল না। মুখ টিপে হাসতে লাগল।

মোটঘাট ফালতুর মাথায় চাপিয়ে মহল থেকে বেরিয়ে এলাম। আগে আগে সার্জেন্ট। আফিসের সামনে এসেও থামল না ও। এগিয়েই চলল। হাসপাতালের পথটা চিনতাম। সেই পথে।

থেমে গেল একটু গিয়েই। ঢুকে পড়ল বাঁয়ের একটা মহলে। ছোট্ট মহল।

বিস্ময়ের আর অন্ত নেই। অজানা কোন এক গোপন কক্ষ আমার থাকবার জন্য ওরা বেছে রেখেছে নিশ্চয়ই। বাঁক ঘুরে ওপর যাবার সিঁড়ির সামনে ও এসে থেমে গেল। ওপরের দিকে তাকিয়ে হাসতে লাগল।

সিঁড়ির মাথায় দাঁড়িয়ে সুভাষ। আমার নেতা।

সামনা-সামনি দুজনে দাঁড়িয়ে ছিলাম। বেশ খানিকক্ষণ। পিঠে হাত রেখে বললেন: 'চলো, আগে তোমার ঘর দেখিয়ে আনি।'

অত্যন্ত চেনা সেই ছোট্ট লোহার খাটিয়াই, কিন্তু ধবধব করছে তার ওপর বিছানা। বালিশ দুটোর ওপর বিছিয়ে দেয়া হয়েছে একখানা টার্কিশ তোয়ালে। অন্য পাশে টেবল, সামনে একখানা চেয়ার। তার পাশে জলের কুঁজো। টেবলের ওপর কাঁচের গেলাসে একগোছা রক্তকরবী।

বিস্ময়ে বোবা হয়ে গেছি। এরপরও কথা?

বেরিয়ে এলাম। দালানে টেবল পাতাই ছিল। দুপাশের দুখানা চেয়ারে দুজন বসে পড়লাম। আলো তখন জ্বলে উঠেছে।

ওপরের প্রথম ঘরখানা নেতার শোবার ঘর। দ্বিতীয়খানা ওঁর স্নানের, তৃতীয় খাবার, চতুর্থ আমার শোবার আর পঞ্চমখানা আমার স্নানের।

রাত আটটায় আমরা খাবার ঘরে ঢুকলাম। ডানপাশে একখানা টেবলের ওপর নানা ধরনের কৌটো সাজানো। কাঁটা চামচ ছুরি আরও টুকিটাকি জিনিস। বাঁদিকের টেবলে ডিস, গেলাস, ও রাতের খাবার ঢাকা দেয়া। ফালতুরা চলে গেছে যার যার মহলে। নিচে একজন সেপাই। ওপরে আমরা দুজন।

ঘরে ঢুকেই আমার দিকে চেয়ে বললেন: 'চুপ করে চেয়ারে বসে থাকো। আজ সব আমি করবো।'

বলেই টেবলের তলা থেকে একটা ঝুড়ি টেনে বের করলেন। নানা রকমের ফল। আপেল, কমলালেবু, কলা। ঘরের মাঝখানে এক বালতি গরম জল ফালতু রেখে গিয়েছিল। সব ফলগুলো একটা একটা করে ধুয়ে প্লেটের ওপর রাখলেন। বালতির পাশেই ছিল একটা ফ্লাস্ক। সেটা খুলে ওর জল দিয়ে আবার ফলগুলো ধুতে ধুতে নিজেই বললেন: "আমি একটু ফ্যাস্টিভিয়াস হয়ে পড়েছি না?"

নির্বাক আমি। শুধু দেখে চলেছি। ছুরি দিয়ে ফল কাটছেন আর বলছেন: "ফালতুগুলো বড্ড নোংরা। সাবধান থাকাই ভালো। কী বলো?"

আমার বলবার অবকাশ কোথায়? নিজেই বলছেন: "আজ আর অন্য কিছু নয়। আজ ফলাহার। ইলা এসেছিলা। ফল আর সন্দেশ দিয়ে গেছে।"

খেতে খেতে বলছেন: "সবাইকে ছেড়ে দিলো। দিলো না তোমাকে আর আমাকে। ওদের মতলবটা কী?"

"মতলব, আপাতত আটকে রাখা।"

"তা তো নিশ্চয়ই। কিন্তু ব্যবস্থাটা পৃথক হলো কেন?"

উত্তর দিতে যাচ্ছিলাম যে, আজ পৃথক কিন্তু আগামী কালই এ পার্থক্য ওরা ঘুচিয়ে দেবে। কাউকেই বাইরে থাকতে দেবে না। কিন্তু বলা হলো না। নিজেই বলে উঠলেন: "কিন্তু জানো, আমার ইনটুইশ্যন বলছে, আমি তোমাদের আগে বাইরে যাবো।"

"ভাবা আর ভেবে আনন্দ পাওয়া মন্দ নয়। কিন্তু সে-গুড়ে বালি। সুভাষ বোসকে যুদ্ধ শেষ হবার আগে ওরা আর বাইরে যেতে দিচ্ছে না।"

"কিন্তু আমার ইনটুইশ্যন? দেখো, আমি যাবোই।"

এ তো ঠাট্টা নয়। চোখের দিকে চেয়ে দেখি গভীর প্রত্যয় ফুটে বেরুচ্ছে।

বারান্দায় গিয়ে বসলাম। কথা হলো গভীর রাত পর্যন্ত। ওপরের

ঘরগুলো ওরা বন্ধ করে না। সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্ট হুকুম দিয়েছেন। মেজর পাটনি সুপার। সেই পুরনো পাটনি।

বাইরে নিঝুম স্তব্ধতা। ক্বচিৎ সেপাইদের কণ্ঠ কানে আসে। দূরে দু-একটা নিশাচর পাখি ডাকে। রাস্তায় সেপাই টহল দেয়। জুতোর শব্দ হয় খট্ খট্ খট্ খট্…

এগারোটার ঘণ্টা পড়ে। চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে নেতা বলে ওঠেন: "এইবার শুয়ে পড়ো।"

শুলাম। কিন্তু ঘুম এল না। এই পরামাশ্চর্য কয়েকটি ঘণ্টা আমাকে জাগিয়ে রাখল অনেকক্ষণ। নিজেকে খুঁটে খুঁটে বুঝতে চাইলাম। তন্ন তন্ন করে নিজেকে দেখতে চাইলাম।

মনে হলো একটি কথা: এই ব্যক্তিটির চারপাশে আমরা যারা সেদিন জুটেছিলাম, আর আদায় করে নিয়েছিলাম নিখাদ স্নেহ আর মমতা, তা তো কোনক্রমেই সম্ভবপর হয়নি আমাদের বিশেষ কোন গুণের ফলে; এটা ঘটল শুধু অদৃষ্টক্রমেই।

আজ ভাবি, শুধু অ-দৃষ্টক্রমেই নয়,—পরম ভাগ্যক্রমে।

ঘুম থেকে খুব সকালে কোনদিনই আমি উঠি না। তবু খুব বেশি দেরিও আমার হয় না। উঠেই দেখি সবে সূর্য উঠেছে। আকাশের মেঘ ওপরে উঠেছে। কদাচিৎ লঘু মেঘের পাতলা পর্দা নীল আকাশের ওপর দিয়ে ভেসে যায়। শরৎ আসছে।

ফালতু এসে সেলাম করে দাঁড়াল। বলল: "বড় সাহেবের উঠতে দেরি হবে। আপনাকে চা দেবো?"

"না। একসঙ্গে দিয়ো।"

ফালতু ঘর ঝাঁট দেয়। বিছানা পরিষ্কার করে। মুখ ধোবার ও স্নানের জল দেয়। খাবার জল রাখে কুঁজো ভরে।

বারান্দায় বসেই থাকি। কাগজ এসে গেছে। পড়তে থাকি। পড়তে পড়তে মনে হলো, প্রধান প্রধান ঘটনাগুলো দাগ দিয়ে রাখলে

ভালো হয়। নেতা যাতে চোখ বুলিয়েই পড়ে নিতে পারেন। তাছাড়া ওঁর মুখ ধোবার ফাঁকে, চাই কি, আমি মুখে মুখে কতকগুলো বলেও যেতে পারি।

তাই করলাম। লাল পেন্সিল দিয়ে দাগ কেটে চললাম। মোটামুটি বড় বড় ঘটনাগুলো মনের ভেতর ঠেসেও নিলাম।

ছোট একখানা টুলে বসে মুখ ধুতে শুরু করতেই আমি খবর বলতে লাগলাম। মনোযোগ দিয়ে নেতা শুনছেন।

এরই ফাঁকে চা এসে গেল। একটা ডিসে কয়েকখানা সেঁকা রুটি, মাখন, ডিম সেদ্ধ, দুধ, চিনি, আর গরম জলের কেতলি। বসেই একখানা টোস্ট হাতে তুলে নিলেন নেতা। টোস্টে মাখন মাখছেন। পটে চা ভিজিয়ে দিয়েছেন আগেই।

আমিই-বা ছাড়ি কেন? একখানা টোস্ট তুলে নিলাম। বলে উঠলেন: "তা কেন? তুমি যা করছিলে, তাই করো। খবর বলো।"

বলে চললাম। আর ভেবেও নিলাম যে, এ দিনটাও যাক। কাল থেকে এসবের একটাও আর করতে হচ্ছে না। সবই করব আমি,—একা।

দুখানা টোস্ট এগিয়ে দিয়ে বললেন: "ইংলণ্ডের ওপর হিটলারের বোমা পড়ছে না,—বোমা বৃষ্টি হচ্ছে। চমৎকার ওরা নামটা দিয়েছে: মলোটভ কক্‌টেল। কক্‌টেলই বটে।"

ইংলণ্ডের আলো নিভে যেতে আর দেরি নেই। রাত্রিবেলা জনশূন্য লোকালয় আর রাজপথ প্রেতপুরী বলে ভুল হয়। সমস্ত বড় বড় শহর, বিশেষ করে লণ্ডন, মাটির তলায় বাসা বেঁধেছে! টানেলে। বোমা পড়ছে সত্যিই বৃষ্টির ধারার মত। ঝাঁকে ঝাঁকে বোমারু উড়ে যায় লণ্ডনের ওপর। ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে বোমা ফেলে। ধ্বংসের এক বিরাট ভয়াল রূপ। সেদিন সাত ঘণ্টা বোমা পড়েছিল ক্রমাগত।

আমেরিকাও চঞ্চল হয়ে উঠেছে। গত যুদ্ধের কথা আমেরিকা

ভোলেনি। সমরোত্তর পৃথিবীতে নতুন করে যাদের কায়েমি স্বার্থ দানা বেঁধে উঠল, তাদের মধ্যে আমেরিকার স্থান বিশেষ তো ছিলই না, বেশিও ছিল না। উইলসনের গালভরা উদার বাণী বেমালুম হজম করে সেদিন এক আনকোরা নতুন বেশে আবার সাম্রাজ্যবাদ শেকড় দাবিয়ে দিল। বোকার মতো আমেরিকা গত্যন্তর না দেখে লিগ. অব্ নেশনের বাইরে এসে দাঁড়িয়ে থাকল।

কিন্তু এবার? পুবদিকের অবস্থাটা একটু ঘোরালো ঠেকছে না? জাপান মরিয়া হয়ে চীন এর ওপর হামলা চালিয়েছে। এসিয়ার প্রভুত্ব তার চাই-ই। অনেকদিন ধরে নিজেকে এরই জন্য সে তৈরী করেছে। আর দুটি চক্ষু বিস্ফারিত করে দেখেছে যে, তারই দৃষ্টির সম্মুখে দূরের ঐ আমেরিকা, ইংলণ্ড, জার্মেনী, এমন কি ক্ষুদ্র পর্টুগালও একটার পর একটা করে এসিয়ার ভূখণ্ড গ্রাস করে চলেছে।

কিন্তু অতি দীর্ঘকাল ফোঁপর-দালালি করে ইংরেজ এসিয়ায় প্রভুত্বের যে আকাশচুম্বী সৌধ গড়ে তুলেছে, তার হংকং, টিয়েণ্টসিং, বোর্নিও, বার্মা, মালয়, সিঙ্গাপুর সর্বোপরি তার স্বর্ণখনি ভারতবর্ষ,—হিটলারের বেধড়ক মার তাকে যে দুঃসহ অবস্থায় টেনে নামিয়েছে, এসব কি চিরদিনই তার তাঁবেই থাকবে? যদি না থাকে, জাপান এসে এদের ওপর প্রভুত্ব চালাবে অবাধে, আর দূরে দাঁড়িয়ে থেকে সে,—আমেরিকা,—নির্বিকার সাংখ্যের পুরুষের ন্যায় সেই অসহ দৃশ্য শুধু শুধু দেখেই যাবে? তাছাড়া তার ফিলিপাইন, গুয়াম, ওয়েকদ্বীপ, মিডওয়ে,—হাওয়াই,—এরাও কি তখন অক্ষতই থাকবে? রুজভেল্টের সমর সচিব স্টীমসন্ সিনেটের সভায় প্রকাশ্যে বলেছেন যে, আমেরিকার এই নিষ্ক্রিয় ও মৌন ঔদাস্য তাকে রেহাই দেবে না।

কিন্তু হিটলার? ফ্রান্স কুক্ষিগত করে হিটলার চুপ করে গেলেন কেন? কেন তিনি তাঁর সমস্ত শক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লেন না

ইংলণ্ডএর ওপর? দুনিয়ার সবাই তো এই আশঙ্কাই করেছিল সেদিন।

না, হিটলার তা পারেন না। রাশিয়ার সঙ্গে হিটলার চুক্তি করেছেন সন্দেহ নেই। স্ট্যালিনকে তিনি খানিকটা বোকাও বানিয়েছেন আপাতত; কিন্তু একটি কথা তিনি কিছুতেই ভুলে যেতে পারেন না যে, শেষ সংগ্রাম তাঁকে করতে হবে সোভিয়েট রাশিয়ার বিরুদ্ধে,—ইংলণ্ড বা আমেরিকার বিরুদ্ধে নয়। তাঁর ন্যাশনাল সোশ্যালিজম্ যত এবং যেভাবে সাম্রাজ্যবাদের পাশাপাশি বা একই সঙ্গে চলতে পারবে,—কম্যুনিজ ম্‌এর সঙ্গে তা যে পারে না, পারবে না, একথা তাঁর কাছে একান্তই স্বচ্ছ এবং বিশদ।

তাছাড়া, সাম্প্রতিক রাশিয়ার আচরণও তাঁকে কম সজাগ করে-নি। এস্তোনিয়া, লিথুনিয়া আর ল্যাটভিয়া কি বিনা কারণেই এবং নিজেদের শুধু কৃতার্থ করতেই নিজে থেকে রাশিয়ার সঙ্গে মিশে গেল? পোল্যাণ্ড-এর শেষ পর্যায় তিনি ভুলে যেতেই চেয়েছিলেন। কথা নেই, বার্তা নেই, পোল্যাণ্ডএর বেশ মোটা খানিকটা অংশ রাশিয়া হজম করে ফেলল। গাছে ওঠবার চাড় নেই, বড় কাঁদিটা আমার;—যুদ্ধ করলেন তিনি, কালী ও কর্দমে নিজেকে ডুবিয়ে দিয়ে জয় করলেন পোল্যাণ্ড কিন্তু ভাগের বেলা রাশিয়া।

রাশিয়া সম্পর্কে নিশ্চিন্ত না হয়ে, তাই তিনি ইংলণ্ড আক্রমণ করতে পারেন না। ফ্রান্স-এর পতনের পরই তিনি ইংলণ্ড-এর কাছে শান্তির প্রস্তাব পাঠিয়েছিলেন। ইংলণ্ড তা প্রত্যাখ্যান করেছে। শান্তির প্রস্তাব বলেই হিটলার পরিচয় দিয়েছিলেন কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে তা ছিল ইংলণ্ড-এর প্রতি আত্মহত্যার ইঙ্গিত। ইংলণ্ড মরতে চায় না।

যুদ্ধের পূর্বে চীনকে ইংরেজ ও আমেরিকা কিছু-কিঞ্চিৎ সাহায্য করেছে। তখনও ইংরেজের হংকং বিপন্মুক্ত ছিল, ছিল টিয়েন্টসিং অক্ষত, ছিল তার সাংহাই-এর সৈন্য-ঘাঁটি। কিন্তু ক্রমবর্ধমান জাপানী

গুঁতো সাংহাই থেকে সৈন্য সরিয়ে আনতে তাকে বাধ্য করেছে। হংকং-এর পথও আর যথেষ্ট নিরাপদ নয়। বাধ্য হয়ে ইংরেজ বার্মার ভেতর দিয়ে পথ তৈরী করেছিল। মুখে সেদিন ইংরেজ ডেমোক্রাসির সহায়ক বলে নিজেকে জাহির করলেও মনে-প্রাণে সে জানত যে, হংকং তাকে বাঁচিয়ে রাখতে হবেই। বিরাট চীনের খোলা বাজার তা নইলে তাকে হারাতে হবে।

কিন্তু হিটলার তার মুখোশ ছিঁড়ে দিয়েছিলেন। ১৭ই জুলাই (১৯৪০) ইংরেজ বার্মার পথ রুদ্ধ করে দিল। কিন্তু জাপানকে খুশি করা গেল না। ইণ্ডো-চায়নার ভেতর দিয়ে জাপান চীনের দক্ষিণ অংশ আক্রমণ করতে চায়।

আলোচনা শেষ করবার মুখে নেতা বললেনঃ "ডেমোক্রাসি, সাম্যবাদ, এ সবই উচ্চাঙ্গের কথা সন্দেহ নেই, কিন্তু নিজের নিজের স্বার্থ বাঁচিয়ে ঐসব তত্ত্বকথা বলাই স্বধর্ম। তুনিয়ার সবাই তাই করে। আর আমরা? শঙ্করার মায়ের কথা ভাবতে ভাবতেই আমরা গেলাম।"

রাজবন্দীদের রান্না হত আলাদা। সেখান থেকেই আমাদের খাবার আসত। শুধু বাড়িতে খানিকটা রান্না হত আমাদের মহলে। খেতে বসে নেতা বললেনঃ "মাছের বদলে আমি ডিম নিয়েছি। তুমিও তাই বলে দিয়ো।"

আমার কিন্তু মাছের দিকে একটু পক্ষপাত ছিল। বললামঃ "তুটোই থাক। যেদিন ইচ্ছে হবে, মাছটাও চোখে দেখা যাবে।"

একটু হাসলেন। বললেনঃ "তা বেশ। আমার চাইতেও তুমি প্র্যাকটিক্যাল।"

হাসপাতাল থেকে নেতার জন্য একটা করে মুরগির বাচ্চা আসত। কিছু ফল আর খানিকটা তুধও। তুধটা দিয়ে দই করা হত। মুরগিটা দিয়ে হত পিশ্‌প্যাশ্‌।

সামান্যই খেতেন। আমাদের অভুক্ত খাবারগুলো সবই পেত ফালতুরা।

খাওয়া শেষ করে নিজের ঘরে গেছি। গিয়েই দেখি, আমার সোপকেসে আনকোরা একখানা মার্গো সাবান। সাবান আমার ফুরিয়ে গিয়েছিল। টেবলে পড়েছিল খালি কেসটা। কোন্ ফাঁকে ঘরে ঢুকে সাবান রেখে গেছেন।

অনেকক্ষণ সাবান থেকে চোখ ফেরাতে পারিনি।

নেপোলিয়ন সম্বন্ধে বলতে গিয়ে গ্যয়েটে বলেছিলেন: "দেব-মানব জোহানের প্রত্যাদেশের মতোই নেপোলিয়নের কথা আমার মনে এক বিস্ময়কর দাগ এঁকে দেয়। আমরা সবাই মনে করি, হয়তো আরও কিছু জানবার বাকি থেকে গেল। কিন্তু সেটা যে কী, তা অজ্ঞাতই থেকে যায়।"

আমি গ্যয়েটে নই, নেতাও নেপোলিয়ন নন। তবু মনে জাগে একই প্রশ্ন। এই মানুষটিকে একান্ত করে এমন নিভৃতে, এমন এক রহস্যময় পরিবেশে পেয়ে, মন আমার কানায় কানায় ভরে উঠেছিল নিশ্চয়ই, (গর্বও কি কম হয়েছিল!) তবু সর্বদাই মনে হয়, মানুষটির সব কথা বুঝি জানা হল না। কর্মী সুভাষ, নেতা সুভাষ, রাষ্ট্রপতি সুভাষ, সর্বোপরি মানুষ সুভাষ,—এর কোনটাই তো একদিনে কিছু সম্ভবপর হয়নি। কিন্তু হল কেমন করে? কবে থেকে জীবনে এঁর প্রশ্ন দেখা দিল, সমস্যা এসে দাঁড়াল, সঙ্কল্প জেগে উঠল মনের নিভৃত কন্দরে, জাগল তৃষ্ণা, জাগল অপ্রবোধ্য চাঞ্চল্য,—যার ফলে সমস্ত গতানুগতিকতাকে পরিহার করে এই দুস্তর আর কণ্টকাকীর্ণ পথ বেছে নিলেন? নিলেন কেন? নিয়ে পেলেন কী? কোনদিন পাবেন কি কিছু?

যে-ঘরে জন্মেছিলেন,—এ জীবন তো পাবার কথা ছিল না। না। তবু পেলেন। কেমন করে পেলেন?

চমৎকার সকালটা। সারা রাত বৃষ্টি গেছে। বৃষ্টি-স্নাত ঊষার সারা অঙ্গে সোনার আলো। মুখ টিপে হাসছে।

সকাল সকাল উঠেছি। বাইরের দিকে তাকিয়ে দালানে বসে ছিলাম। ওপারে বড় বড় গাছ। অশথ, দেবদারু, কৃষ্ণচূড়া। মাথায় পরিয়ে দিয়েছে সোনার তাজ। দৃষ্টি আর ফেরে না।

জানি, বেলা করে উঠবেন। প্রথম রাতে ঘুম হয় না। উঠতেও তাই দেরি হয়। কাগজ পড়া শেষ করে আনমনে বাইরের দিকে তাকিয়ে ভাবছিলাম এঁর গত জীবনের কথা।

উঠলেন। সংবাদ শুনলেন। চাও শেষ হল। হঠাৎ জিজ্ঞেস করে বসলাম: "আচ্ছা, ছোট বেলাকার সঙ্গীদের একজনও কি আপনার পথে এলো না?"

"না। কেউ আসেনি। ত্থ-একজন যারা এসেছিলো, তারাও হোঁচট খেলো।"

"ছোট বেলার কথা আমার জানতে ইচ্ছে করে।"

একটু হাসলেন। তারপর বললেন: "অর্থাৎ ছোট বেলাতেই সুভাষ বোসের বৈশিষ্ট্য ধরা পড়েছিল কিনা, এই তো?"

একটু ছেদ। তারপর: "দেখ, শুধু সুভাষ বোস নয়, এ-পথে যারা এসেছে, আর জীবনের ধর্ম বলে এ-পথকে বরণ করেও নিয়েছে, তাদের সবাই এরই ছোটবেলা প্রায় এক।"

উনবিংশ শতাব্দীর পরিণাম। সেদিন বাংলার বুকে এক নব সৃষ্টির দোলা লেগেছিল। ধর্মে, কর্মে, সাহিত্যে, গানে, প্রাণে। দীর্ঘ দিনের ঘুমন্ত হাজা মজা নদীর বুকে সহসা দেখা দিল এক প্রবল বন্যা। বন্যা সরে যাবার পর থিতিয়ে-যাওয়া চড়ার বুকে যে-পলিমাটি জমল, যে-বীজ তাতে পড়ল, সবই যেন উথলে উঠল।

যে যেমন ভাবল, এক-একজনকে জীবনে বেছে নিল। কেউ রামমোহন, কেউ রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ, আর কেউ বা বঙ্কিমকে। কিন্তু কেউই ধরতে পারেনি যে, ওঁরা ছিলেন সেই নবযুগের অবিচ্ছেদ্য এক-একটা দিকপাল। এঁদের সবাইকে নিয়েই সেই যুগটা ফুটে উঠেছিল। কাউকে ছাড়িয়ে নয়, পরিহার করে নয়, খর্ব করেও নয়!

আর তাই পরে যারা এল, এঁদের সকলেরই ছাপ থেকে গেল তাদের জীবনে আর কাজে। এই সঙ্গে আর যেটা এসেছিল, সেটাও ছিল সে যুগের অপরিহার্য পরিণামই। এল ইংরেজ। সঙ্গে করে নিয়ে এল তার প্রচণ্ড প্রভাব।

বললেন আরও স্পষ্ট করে: "দেহ-চর্চা থেকে শুরু করে, লোকসেবা, ব্রহ্মচর্য, দল-বাঁধা কীর্তন-করা, আর সর্বোপরি দেশের কথা ভাবা। মিলিয়ে দেখো, তোমার নিজের জীবনেও কি এসব ঘটেনি?"

কথাটা এ-ভাবে ভাবিনি। ধাক্কা খেয়ে চমক ভেঙে গেল। স্পষ্ট হয়ে উঠল নিজের ফেলে-আসা দিনগুলি।

আবারও বলছেন: "শুধু আমাদের দেশেই নয়, সম্ভবত সব দেশেরই এটা একটা রেওয়াজ, কেউ যদি হঠাৎ সাধারণের মাথা ছাড়িয়ে একটু ওঠেই, অমনি বলা শুরু হলো, বীজের মধ্যেই মহীরুহ লুকিয়ে থাকে, মর্নিং শোজ দি ডে, ইত্যাদি।"

অর্থাৎ বাল্যের সেই স্বল্প পরিসর অস্ফুট জীবনেই ভবিষ্যতের সকল সম্ভাবনা আর উত্তর-কালের সকল সার্থকতা ধরা দিয়েছিল।

কিন্তু একেবারেই কি দেয় না? সত্যিই কি সুভাষ বোস আর আমার মধ্যে কোন তারতম্য, এতটুকু পার্থক্যও নেই-ই? আছে।

আরও অনেকের মতোই কটকের 'জান্‌কী সাহেবের' বাড়িতেও সেদিন নিশ্চয়ই শঙ্খ বেজেছিল, পুরঙ্গনাদের মধুর অধর ছড়িয়ে দিয়েছিল দিগ্বিদিকে উলুধ্বনি। আর সেই মিষ্টি-মধুর কোলাহল ছাপিয়ে বেজেও উঠেছিল নবাগত একজনের অনিন্দ্যসুন্দর কাকলি। হোক-না নবম, তবু তো নবতম। দিনটা ছিল ২৩শে জানুয়ারী। ১৮৯৭।

'জান্‌কী সাহেব'; রায়বাহাদুর জানকীনাথ বসু। একেবারে খাঁটি সাহেব। চলনে, বলনে, পোষাকে-পরিচ্ছদে। নিজে সাহেব হয়েও পরিতৃপ্ত হননি, ছেলেদের পুরোপুরি সাহেব তৈরী করতে

উঠে পড়ে লেগেছিলেন। 'দেশী' স্কুলে ছেলেদের পড়ানো পর্যন্ত পছন্দ করতেন না। পড়াতেন সাহেবদের স্কুলে।

ইংরেজ-পদানত উনবিংশ শতাব্দীর এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত জানকীনাথ। ইংরেজের প্রভাব, পাশ্চাত্যের প্রখর দ্যুতি অস্বীকার করতে পারেননি। জীবনের প্রথম থেকে উদ্যমে নিষ্ঠায় সংগ্রাম করে এগিয়ে গেছেন। পেয়েছেন সাফল্যের জয়মালা। পাশ্চাত্যের উদারনৈতিক মনোভঙ্গী, ছক-বাঁধা দেশপ্রীতি, শিক্ষা-দীক্ষায় পরিচ্ছন্ন শৃঙ্খলা, কর্তব্যের সুচারু সামঞ্জস্য তো ছিলই, তার সঙ্গে আরও ছিল প্রাচ্যের মমতা, স্নেহ ও প্রীতির বন্ধন। সবই চোখ ঝলসানো।

আর আর পুত্রদের মতোই সেদিন রায়বাহাদুরের 'সুবি' ও গেল প্রটেস্টাণ্ট ইংলিশ স্কুলে। সাহেব তৈরী হতে।

ক্ষণেকের তরেও 'জান্‌কী সাহেব' সেদিন কি অজনা ভবিতব্যের কোন ইঙ্গিতই চোখে দেখতে পাননি? আপাদমস্তক ইংরেজ সাজিয়ে অনতিক্রান্ত পঞ্চ বৎসরের এক শিশুকে বিজাতীয় কৃষ্টির হাতে সঁপে দেবার পর দীর্ঘ আট বৎসর এক পরম নির্ভরতা ও ভবিষ্যতের নিশ্চিত সাফল্য তাঁকে লুব্ধ ও মুগ্ধ করেছে বার বার, কিন্তু ওরই ফাঁকে কেমন করে আর কখন-যে সেই শিশু পরানুকরণ আর পরনির্ভরতার কঠিন বন্ধন ছিন্ন করে একদিন নিজেকে প্রতিষ্ঠা দিয়েছিল, সেই পাঁপড়ি ঢাকা অস্ফুট জীবন-কোরকের গোপন বারতা কি সেদিন জানকীনাথ সত্যই অনুধাবন করতে পারেননি?

না, পারেননি। দীর্ঘ আট বৎসর এই বিজাতীয় ভাবধারায় কাটিয়ে সুবি যেদিন র‍্যাভেনশ্ কলেজিয়েট স্কুলের দ্বারপথে একটি অনাড়ম্বর, শুচি-শুভ্র হৃদয়ের সান্নিধ্য লাভ করল, নিমেষে আলোর স্পর্শে দীর্ঘ দিনের আঁধার গেল পালিয়ে। 'জান্‌কী সাহেবের' পুত্র হয়ে উঠলেন সুভাষচন্দ্র, স্থান পেলেন আচার্য বেণীমাধব দাশের মন দেউল। আর সেই মুহূর্তে অ-দৃষ্ট ভাগ্যবিধাতা এই বালতাপসের শুভ্র ললাটের মধ্যভাগে এক বিচিত্র তিলক পরিয়েও

দিয়েছিল, যা জানকীনাথ দেখতে পাননি, হয়তো আর কেউই না, শুধু একজন ছাড়া। সেই একজন ছিলেন আচার্য বেণীমাধব।

একদিনে অঙ্গ থেকে খসে পড়ল বিজাতীয় অঙ্গভূষণ। কণ্ঠে জাগল দেশের ভাষা,—বাংলা আর সংস্কৃত। অক্ষরজ্ঞান যে ভাষার ছিল না, তু'বৎসর পর সেই সংস্কৃতের বাৎসরিক পরীক্ষায় সুভাষ প্রথম হলেন। পেলেন একশোর মধ্যে একশো। প্রধানশিক্ষক বেণীমাধব, পণ্ডিত শিবনাথ কাব্যতীর্থকে জিজ্ঞেস করেছিলেন: "একশোর মধ্যে সুভাষকে একশোই দিলেন?" হেসে কাব্যতীর্থ মশাই বলেছিলেন: "দিলাম। বেশি আর দিতে পারলাম না যে।"

অনেকটা বেলা হয়ে গেছে। এগারটার কাছাকছি। ফালতু যতীন নেতার গা টিপে দিচ্ছিল। যতীন নামটা আমাদের দেয়া। ওর আসল নামটা ছিল বিদঘুটে। যতীন উড়িয়া।

নেতা বলেই চলেছেন: "শনি আর রোববারটা ছিল আমার মস্ত বড় আকর্ষণের দিন। শনিবার সকাল সকাল বাড়ি ফিরতাম আর রোববার তো ছুটিই। সবাইএর খাওয়া হলে খেতো রঘু—বাড়ির পুরাতন ভৃত্য। ওর কাছ থেকে একটুখানি। পান্তাভাত খাবার আমার কী যে লোভই ছিলো।"

অবাক হয়ে শুনছিলাম। পান্তাভাত! আশ্চর্য নয়?

বললাম: "ও-বাড়িতেও পান্তাভাত থাকতো?"

"তা বুঝি জানো না? বাইরেটা ছিলো সবটাই বাবার। আর ভেতরটা পুরোপুরি মায়ের। মায়ের রাজ্যে ছিলো পূজো, ব্রত, মানত, সে অনেক কিছু।"

সুভাষেরই প্রতিচ্ছবি। বাইরের সুভাষ বিদ্রোহী সুভাষ। দেশভক্ত সুভাষ। দেশনেতা সুভাষ। ভেতরের সুভাষ, দরদী, মরমী, সন্ন্যাসী সুভাষ। বৈরাগী সুভাষ।

এই মায়ের কাছেই সুভাষের হাতেখড়ি হয়েছিল ধর্মের। মা হাতে তুলে দিয়েছিলেন 'রামকৃষ্ণ কথামৃত'। তারপর অনেক।

চোদ্দটি সন্তানের জননী। তবু সহস্র কাজের ফাঁকে শিশুকাল থেকেই এই পুত্রটিকে জননী একটু বিশেষ করে দেখতেন।

তিমির রাত্রি অবসান করে সুভাষ ঘরে ঢুকতেন মড়া পুড়িয়ে, অতন্দ্র জননী খাবার আগলে বসে থাকতেন। গভীর রাতে ঘনান্ধকারে চুপি চুপি মাকে ডাকতেন দোর খুলে দিতে, চোখে থাকত তখনও ভাবের ঢল, মুখে মাদকতা, সর্বাঙ্গে কীর্তনের আবেশ। চরণদাস বাবাজির মঠে কীর্তন শেষ করে সুভাষ ফিরছেন। অঞ্চলে জননী তাঁর এই অদ্ভুত আর অবুঝ পুত্রটিকে আবৃত করে কাছে টেনে নিতেন। সঙ্গে থাকত আর একটি সজাগ সঙ্গী। ঝি। সুভাষের ধাই মা। সারদা।

হাতে এসে পড়ে অকস্মাৎ বিবেকানন্দের বই। রাজযোগ, জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ আর বর্তমান ভারত। সমস্ত দেহ-মন রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে। তন্ময় সুভাষ। যোগী সুভাষ। আহারে বিহারে কথায়-বার্তায় সুভাষ যোগী।

যোগ আর সাধনার রন্ধ্রপথে বিবেকানন্দের এক অশরীরী বাণী সুভাষের অন্তরে কোন্-এক দুর্জ্ঞেয় অজ্ঞাত ইঙ্গিত বহন করে আনে। বুঝতে না-পারা সেই মর্মবাণী হাতছানি দেয়। ডাকে।

ডাকে ভারতবর্ষ—ডাকে তাঁর দেশ।

মাতৃমন্ত্র শুনিয়ে যায় বন্ধু হেমন্ত।

নবতম আকর্ষণে সুভাষ ডুবে যান। দৃষ্টির সীমিত সঙ্কীর্ণতা অতিক্রম করে প্রসারতি হয়ে ফুটে ওঠে পরাধীন, হৃতসর্বস্ব দেশের দীন হীন রূপ। চারিদিকের দৈন্যদশায় অন্তর কেঁদে ওঠে। প্রতিকার কামনা জাগে অন্তর ছাপিয়ে। সুভাষ স্কুলের পড়া শেষ হবার আগেই ঢুকে পড়েন সন্ত্রাশবাদী দলে।

১৯১১ সালের ১১ই আগস্ট। ক্ষুদিরামের আত্মবলিদানের দ্বিতীয় বাৎসরিক। অভুক্ত সুভাষ ছেলেদের কাছে হাত জোড় করে দাঁড়ান। যান ঘরে ঘরে। সমগ্র সত্তা দিয়ে এই দিনটিকে গ্রহণ

করতে হবে আপন মনের নিভৃত মণিকোঠায়। সংযম আর উপোসের মাধ্যমে ধরা দেবে দেশজননী রূপে। ব্রত হয়ে উঠবে সার্থক।

উপোস করেন সুভাষ। উপোস করে ছেলের দল। উপোস করেন মা-জননী।

উপবাসী সংযত সুভাষ গভীর রজনীর শান্ত নির্জনতায় গভীর ধ্যানে ডুবে যান। চিত্তমুকুরে ভেসে ওঠে জ্যোতির্ময়ী মাতৃরূপ। সুভাষ দেশমাতার মুক্তিমন্ত্রে দীক্ষা নেন।

কটকের পড়া শেষ করে সুভাষ চলে আসেন কলকাতা। প্রবেশিকা পরীক্ষায় সুভাষ উত্তীর্ণ হন। অধিকার করেন দ্বিতীয় স্থান।

৩

পণ্ডিত জহরলাল নেহরুর গান্ধীকে বাদ দিয়ে অথবা গান্ধীকে অতিক্রম করে দেশের নেতা হবার সাধ ছিল কিন্তু সাধ্য ছিল না। বস্তুত প্রথম মহাযুদ্ধের সময়ে সুরেন্দ্রনাথের যে-মতিভ্রম হয়েছিল, ইংরেজের ধাপ্পাবাজির সম্মুখে দাঁড়িয়ে জহরলালও ঠিক সেই একই ভুল করে বসলেন। সেদিন ইংরেজের ভবিষ্যৎ-প্রতিশ্রুতি বিশ্বাস করে ও মেনে নিয়ে সুরেন্দ্রনাথ সে-যুদ্ধে জাতিকে ইংরেজের পক্ষে দাঁড়াবার সাদর নিমন্ত্রণ জানিয়েছেন। এবারও জহরলাল সেই ফাঁদে স্বেচ্ছায় পা বাড়িয়ে দিলেন।

ওয়ার্কিং কমিটির সিদ্ধান্ত বিবেচিত হল পুণার এ. আই. সি.সি-র সভায়। ২৭শে জুলাই, ১৯৪০। রামগড় কংগ্রেসের পর ভারত-রাষ্ট্রীয় কমিটির এই প্রথম বৈঠক। আজাদ, জহরলাল, রাজা-গোপাল, প্যাটেল একযোগে ওয়ার্কিং কমিটির প্রস্তাব সমর্থন করলেন। করলেন না শুধু চারজন। আব্দুল গফ্ফার খাঁ পূর্বেই

পদত্যাগ করেছিলেন। প্রস্তাব বিরোধী চার জনের অন্যতম ছিলেন রাজেন্দ্রপ্রসাদ।

অতি দীর্ঘ দিন গান্ধীর পক্ষপুটের আড়ালে সন্তর্পণে নিজেদের ব্যক্তি-সত্তার বিনিময়ে সেদিনকার ওয়ার্কিং কমিটির সবাই নেতৃত্ব লাভ করেছিলেন। কিন্তু সে-নেতৃত্ব একান্তই ছিল গান্ধী মুখাপেক্ষী।

যুদ্ধ ঘোষিত হবার পর, ওয়ার্ধা-প্রস্তাবই কংগ্রেসের অনিশ্চিত, দোদুল্যমান ও সংশয়ী মনোবৃত্তির নিখুঁত পরিচয় প্রকাশ করে দিয়েছিল। সেদিন কংগ্রেস পরিচ্ছন্ন ও সুস্পষ্ট কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারেনি। নানা অবান্তর টালবাহানায় কাল কাটিয়েছে। জাতির পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয় আদর্শ ও কর্মপন্থা ঘোষণা না করে জাতিকে বিভ্রান্ত করেছে। এই দোদুল্যমান অবস্থায় কংগ্রেসের কেটে গেল দীর্ঘ একটি বৎসর। একটি বৎসর অলস ঔদাসীন্যে কাটিয়ে, গভীর ও গম্ভীর গবেষণার পর আজাদ ও নেহরুর নেতৃত্বে এবং কৌশলী রাজাগোপালের পরামর্শে কংগ্রেস যে-শোচনীয় ও অসার প্রস্তাব পাশ করিয়ে নিল, তাতে সমগ্র দেশ তথা জাতির সার্বিক স্বার্থের মূলে কুঠারাঘাত তো করলই পরন্তু গান্ধী-পরিবারেও অশান্তি ও মনান্তরের আগুন ছড়িয়ে দিল।

গান্ধী-পরিবারের এক রাজাগোপালই আত্মীয়তা ও আনুগত্য অক্ষুণ্ণ রেখেও নিজের স্বকীয়তায় বিশ্বাসী ছিলেন। নিজের ক্ষুরধার বুদ্ধির ওপর ছিল তাঁর নিঃসংশয় প্রত্যয়। আর সম্ভবত গান্ধীর দুর্বলতা ও সীমাবদ্ধ আদর্শের ভবিষ্যৎ-সম্বন্ধেও ছিলেন খানিকটা সজাগ। গান্ধী ও গান্ধীগোষ্ঠীর বার বার বিরোধিতা করে তিনি এঁদের বিরাগভাজন হয়েছেন, মাঝে মাঝে দল ছেড়ে চলেও এসেছেন কিন্তু বার বারই তাঁকে অপরিহার্য মনে করে গোষ্ঠী ও গান্ধী আবার কাছে টেনেও এনেছেন।

কিন্তু এবার? কর্মধারার ছোটখাট যোগ-বিয়োগ নয়, গান্ধী-দর্শনের মূল ধরে টান দিতে গিয়ে আজাদ ও নেহরু যে অবিমৃষ্যকারিতার

পরিচয় দিয়ে বসলেন, তার ফলে,—বেশিদিন নয়, এক মাসের মধ্যেই আজাদ ও নেহরু বুঝে নিলেন যে, ঐ কৃশতনু নেংটি-পরা লোকটির রাজনীতির মারপ্যাঁচ হয়তো ততটা জানা নাও থাকতে পারে, কিন্তু লোকচরিত্র বোঝবার ক্ষমতা এঁদের চাইতে আছে অনেক বেশি।

একের পিঠের শূন্য শক্তি বাড়ায়, কিন্তু এক বিহীন শূন্য শুধুই শূন্য, একেবারেই ফাঁকা। হলোও তাই। প্যাটেল ফিরে এলেন। সঙ্গে সঙ্গে দেখা দিল বিরাট ফাটল। বাজাজ আর ভুলাভাই, আসফ আলী আর সৈয়দ মামুদ খোঁড়াতে লাগলেন। (আজাদ সাহেব লিখছেন : Within a month of the Poona meeting Sarder Patel changed hie views and accepted Gandhijee's positon. The other members also started to waver.— India wins Freedom. P. 35)

রাজেন্দ্র প্রসাদ ও আরও কয়েকজন গেলেন আরও এক ধাপ এগিয়ে। মনের ও কর্মপন্থার মিল যখন ধসেই গেছে, কী হবে থেকে আর এক সঙ্গে। সভাপতিকে সাহায্য করবার জন্যই সভাপতি ওয়ার্কিং কমিটির সভ্যদের মনোনীত করে থাকেন। সভাপতির সঙ্গেই যখন মতের অমিল দেখা দিল, কমিটিতে থাকবার আরও কি সার্থকতা থাকবেই ? তবে—

এই তবেই সেদিন গান্ধী-গোষ্ঠীকে ছত্রভঙ্গ হবার সম্ভাবনা থেকে বাঁচিয়ে দিয়েছিল। আর দিয়েছিল ইংরেজ।

পদত্যাগের হুমকির সঙ্গে ওঁরা জুড়ে দিয়েছিলেন ছোট একটু আশ্বাসও। ইংরেজ কংগ্রেস-প্রস্তাব গ্রহণ না করলে নিশ্চয়ই সহযোগিতার প্রশ্ন আসছে না। ওঁরা অপেক্ষা করতে রাজী থাকবেন ততদিন।

মূঢ় ইংরেজ একটি সুবর্ণ সুযোগ হারিয়ে বসল। গান্ধী-গোষ্ঠী ভাঙ্গতে ভাঙ্গতেও টিকে গেল।

দল টিকে গেল। কিন্তু দেশ ?

১৯৩৩ থেকে ১৯৪০। কংগ্রেস কোন প্রকার সংগ্রামী কর্মপন্থার ধার-কাছ দিয়ে এই দীর্ঘ সাত বৎসর পা মাড়ায়নি। সন্তর্পণে ও-পথ পরিহার করে গেছে। গেছে নানা অজুহাতে। গেছে গঠনমূলক কাজের অছিলায়, গেছে মন্ত্রিত্ব বাঁচিয়ে রাখতে, গেছে গণ-সংযোগের দোহাই দিয়ে। পরাধীন দেশের রাজনৈতিক কোন প্রতিষ্ঠানের পক্ষে শান্তি ও নিষ্ক্রিয় জীবন মারাত্মক।

তাছাড়া, যেদিন সংগ্রামী পথ পরিহার করে কংগ্রেস নিয়মতান্ত্রিক পথে পা বাড়াল, মন্ত্রিত্বের মোহ আর পদমর্যাদার মাদকতা শুধু নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদেরই সেদিন আদর্শভ্রষ্ট করেনি,—সাধারণ কর্মীদের পর্যন্ত সংক্রামিত করেছিল। একটু আয়াস, একটু স্বাচ্ছন্দ্য একটু সচ্ছলতা কার-না পেতে সাধ যায়। গিয়েও ছিল। গোটা কংগ্রেস সংস্থার ভেতর সেদিন ইলেকশ্যন আর তারই একান্ত আনুষঙ্গিক ভ্রষ্টতা মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছিল।

গান্ধী এ-সবই জানেন। বারবার এ-নিয়ে আলোচনাও করেছেন। সাবধান করেছেন অনুবর্তীদের। কিন্তু কৃতকর্মের অনিবার্য প্রতিক্রিয়া তিনি রোধ করবেন কেমন করে ? সেদিনের সেই দুর্বল মুহূর্তের অপসিদ্ধান্ত সুদে-আসলে এইদিন শতগুণ হয়ে দেখা দিল।

প্যাটেল, আজাদ, নেহরু, রাজাজি ;—গান্ধী চেয়ে দেখেন এঁদের প্রত্যেককে দেখেন কংগ্রেসের বর্তমান আর ভবিষ্যৎ। প্যাটেল ফিরে এসেছেন। আজাদ-নেহরু-রাজাজির মতলবও হাসিল হয়নি ; কিন্তু হয়নি দৈবক্রমে। ইংরেজের বোকামিতে। প্রতিশ্রুতি দিয়ে তা ভাঙা বা ভুলে যাওয়া ইংরেজ-চরিত্রের সনাতন বৈশিষ্ট্য। এবার সে তার বৈশিষ্ট্য ভুলে গেল কেন ?

ইংরেজ যদি ভুল না করত, কংগ্রেস ইংরেজের ধাপ্পার টোপ গিলতে দ্বিধা করত না। এই যুদ্ধে ইংরেজের পাশে গিয়ে দাঁড়াত। শেষ পর্যন্ত মিত্রপক্ষের অংশীদার হয়ে গৌরব ও সান্ত্বনাও পেত।

১৯৩৩ থেকে একটিমাত্র সবল ও সোচ্চার কণ্ঠ তাঁকে এই কথাই বলে আসছে। সংগ্রাম ত্যাগ করবার পরিণাম চোখে আঙুল দিয়ে বোঝাতে চেয়েছে। কিন্তু তাঁকে তাঁর দল ও তিনি, গান্ধী কোন ক্রমেই সহ্য করতে পারলেন না। ঠেলে কংগ্রেসের বাইরে নির্বাসন দিলেন।

গান্ধী ভোলেননি ত্রিপুরীর কথা। ভোলেননি রামগড়ের কথা। এই দুদিন আগে আকুল আবেদনে ঐ মানুষটি তাঁকে ডেকে বলেছেন: "প্রতিটি দিন যায়, আর বসে বসে নিজের আঙুল কামড়ানো ছাড়া আর কোন গত্যন্তরই চোখে পড়ে না। যথেষ্ট দেরি হয়ে গেছে; আজও কি ভারতবর্ষকে উদ্ধার করবার কোন পথই আমরা বেছে নেব না? অলস মন্থর অবসাদ কাটিয়ে ভারতবর্ষের শত-কোটি দাস একবারের জন্যেও কি উঠে দাঁড়াবে না? ভুলে যাবে না নিজেদের তুচ্ছ মতভেদ? একজোটে একাত্ম হয়ে তাদের মহান ও সনাতন মাতৃভূমির মুক্তিকল্পে রুখে উঠবে না?" (ফরোয়ার্ড ব্লক, ১১ই মে, ১৯৪০)

উঠত। কিন্তু উঠতে দেননি গান্ধী। তাঁর অলৌকিক আত্মিক শক্তি আর অহিংসার তুলাদণ্ড উঠতে দেয়নি। তাছাড়া, ভয়ও কি কম ছিল? গণ-আন্দোলনের স্বরূপ গান্ধীর অজানা নয়। তিনি ভোলেননি ১৯২১-এর কথা। ভোলেননি ৩০-এর সাক্ষ্য। যদি একবার এই নৈরাশ্য আর নিষ্ক্রিয়তা কাটিয়ে সমগ্র দেশ মুক্তিপণ করে রুখে দাঁড়ায়: "ওঁরা ভয় পান। একবার যদি সমগ্র দেশ অভিযানের সঙ্কল্প নিয়ে জেগেই ওঠে, এই জাতীয় অভ্যুত্থান কি চিরদিনই তাঁদের খেয়াল আর মর্জি মেনেই চলতে চাইবে? যদি নেতৃত্ব হাতছাড়া হয়ে যায়! যদি সেই অভ্যুত্থান অকালে থামিয়ে দেবার কলকাঠি ওরা দূরে ছুড়ে ফেলে দেয়!" (দিল্লীর নিখিল ভারতীয় ছাত্র সম্মেলনের অভিভাষণ, জানুয়ারী, ১৯৪০)

তাছাড়া, ইংরেজের এই দুঃসহ বিপর্যয়ের মুখে সত্যিই যদি কোন অভিযান গড়ে তোলা যায়,—গান্ধী জানেন,—ইংরেজ হয়তো তার

বর্বর পশুশক্তি নিয়ে এবার আর ঝাঁপিয়ে পড়তে পারবে না। ইংরেজের পরাজয় অসম্ভব নাও হতে পারে। তখন? স্বাধীন ভারতবর্ষ কি তাঁর মন্ত্র তখনও মনেই রাখবে? ভুলে যাবে না অহিংসার কথা? (Gandhiji was at first opposed to any movement as it could be only on the issue of Indian freedom and carry the implication that once freedom was gained, India would participate in the war. আজাদ, ইণ্ডিয়া উইনস্ ফ্রীডম, ৩৭ পৃ.)

কিন্তু তাঁর এই অচল নিষ্ক্রিয়তাই কি তাঁর দলকে আর তাঁকে রক্ষা করতে পারবে? কোনদিন কি পেরেছে? (The question arose as to what congress should do in the present context. As a political organisation, it could not just sit idle while tremendous events were happening throughout the world.—আজাদ, ৩৭ পৃ.)

দিল্লী আর পুণার কংগ্রেস-প্রস্তাব ইংরেজকে সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। ইংরেজ কর্ণপাত করেনি। (The British refused the Congress offer of co-operation.—আজাদ, ৩৭ পৃ.) গান্ধী কংগ্রেসের আচরণ সমর্থন করেননি সত্য, কিন্তু সহযোগিতার অঙ্গীকার ছিল বলেই গান্ধী বিরূপ হয়েছিলেন, তাও তো সত্য নয়। তাঁর আদর্শ,—অহিংসা, ঐ অঙ্গীকারের সঙ্গে ওতপ্রোত জড়িত ছিল বলেই-না তিনি বিরূপ হয়েছিলেন।

এক বিপজ্জনক, বাস্তব আর অনিশ্চিত সমস্যা গান্ধীকে ব্যাকুল করে তোলে। কংগ্রেসকে বাঁচাবার কল্পনায় গান্ধী চঞ্চল হয়ে ওঠেন। ডুবে যান তাঁর চিরদিনের রহস্যময় আত্মার রাজ্যে। ধ্যানের আলোর কাছে ইসারা প্রার্থনা করেন। গান্ধী পথ খুঁজে পান।

ভারতরক্ষা আইন অনুযায়ী স্পেশাল ব্রাঞ্চের ইনস্পেক্টর বি. এন.

সেনগুপ্ত নেতার বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেছে। প্রধান প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেট আর. গুপ্তের এবং ম্যাজিস্ট্রেট ওয়ালি-উল ইসলামের কোর্টে বিচার হবে। ১১ই এপ্রিল মহম্মদ আলী পার্কে নেতা হিন্দীতে বক্তৃতা দিয়েছিলেন, সেটা অন্য আর-একটি এবং 'ফরোয়ার্ড ব্লকের' সম্পাদকীয় প্রবন্ধ, "ডে অব রেকনিং" Day of Reckoning) আপত্তিজনক বলে ওরা মনে করে।

'ফরোয়ার্ড ব্লকে'র সম্পাদক ছিলেন নেতা। কিন্তু সম্পাদকীয় প্রবন্ধের সবগুলি তিনি নিজে লিখতেন না। নিজের লেখা প্রবন্ধের তলায় তাঁর সই থাকত। এ-প্রবন্ধে তাঁর সই ছিল না।

ঐ একই দিনে আমার নামেও অভিযোগ উঠল। একই ধারা আর একই কোর্ট। অ্যালবার্ট হল ও শ্রদ্ধানন্দ পার্কের দুটি বক্তৃতার জন্য।

সংবাদটা জানিয়ে দেওয়া হল আমাদের সকালবেলা। ঐ নিয়েই সারা সকালটা কেটে গেল। মধ্যাহ্ন ভোজনের পর আমরা রোজই বসতাম নেতার ঘরে। নেতার একটা টেবল ফ্যান ছিল, আর ছিল একটা রেডিও। ফ্যানের হাওয়ায় বসে দুজনে মশলা খেতাম। ভাজা মশলা। ইলা দিয়ে যেত।

বেশ চন্‌চনে রোদ উঠেছে। বাইরে হাওয়া নেই। গুমোট। ভ্যাপসা গরমে গা ঘেমে ওঠে। প্যাচ প্যাচ করে। খালি গায়ে দুজনে বসলাম। টেবলের ওপর থেকে পাউডারের কৌটো নিয়ে খানিকটা পাউডার ওঁর পিঠে ঢেলে দিলাম। ঘষে ঘষে সারা পিঠটায় মাখিয়েও দিলাম। হাসতে লাগলেন।

শুরু হল কথা।

কটক ছেড়ে কলকতায় পা দিয়েই নেতা মেতে উঠলেন নানা কাজে। ৩ নং মির্জাপুরে তখন মস্ত বড় আড্ডা। সুরেশ ব্যানার্জির সাঙ্গোপাঙ্গরা অনেকে থাকতেন ওখানে। সেখানে নিয়মিত আড্ডা বসত।

ঐখানেই নেতার সঙ্গে বাঘা যতীনের দেখা হয়। যতীন মুখার্জী। যাঁর দুর্জয় আবির্ভাবে বাংলা একদিন ভয়ঙ্কর উল্লাসে মেতে উঠেছিল।

সুরেশবাবুর আদর্শ ছিল আনন্দমঠ। একদল নবীন সন্ন্যাসী গড়ে তুলতে হবে। সর্বত্যাগী। তারা আর্তের সেবা করবে। দেশের নানা দুর্গতির সেবায় বিলিয়ে দেবে নিজেদের জীবন।

পড়াশুনোয় মন আর বসে না। দেশ, ধর্ম আর রাজনীতি ভিড় করে সামনে দাঁড়ায়। সুভাষ মেতে উঠলেন। আজ মুর্শিদাবাদ, কাল পলাশী, পরদিন নবদ্বীপ। পরিক্রমা চলল একের পর আর। বাংলার দুর্গত অতীত ইতিহাসের রক্তাক্ত ছেঁড়া-পাতা চোখের ওপর উড়তে থাকে।

অশান্ত মন ক্রমেই ক্ষেপে ওঠে। ডিবেটিং ক্লাবে বক্তৃতা করে মন আর ভরে না। বন্যা আর দুর্ভিক্ষের চাঁদা তুলে বিক্ষোভ মেটে না। সহপাঠীদের নেতৃত্ব আর তৃপ্তি দিতে চায় না। ক্ষিপ্ত মন ছটফট করে। অজানা অবোঝা কী একটা চাওয়া খুঁড়ে খেতে থাকে সর্বক্ষণ। অবুঝ মন দিনকার দিন আরও বেশি উদ্দাম হয়ে ওঠে। কাউকে না বলে সুভাষ গৃহত্যাগ করেন।

সন্ন্যাসী সুভাষ। পরনে গেরুয়া। ছোট ছোট করে ছাঁটা চুল মাথায়। মুখভরা অনবদ্য পবিত্রতা আর মাধুর্যের ছাপ। খুঁজে বেড়ান পাহাড়-পর্বত, বন আর ঝরনার ধার। গুহায় গুহায় খোঁজেন সাধু। সন্তদের কাছে দীন আর্তের মতো আত্মনিবেদন করেন। পথ দেখাও…উপায় বলে দাও…দেখিয়ে দাও জীবনের আদর্শ…

হাসতে হাসতে বলে ওঠেন: "সেদিন কিন্তু সত্যি সত্যিই মনে হয়েছিলো, সাধুই বুঝি-বা বনে গেলাম।"

উত্তর-ভারত ঘুরে ফিরে এলেন। এলেন সেই পুরনো কলকাতায়।

প্রশ্ন করলাম: "কিছুই পেলেন না?"

"না ঃ পাইনি কিছুই। পেলাম না। ওঁদেরও সেই ক্ষুধা আর তৃষ্ণা। সেই গুহা বা আশ্রম।"

একটু থেমে আবার বললেন ঃ "পেলাম না, কিন্তু দেখলাম। চোখ ভরে দেখলাম। প্রাণ ভরে দেখলাম।"

দেখলেন ভারতবর্ষকে। তাঁর মাকে।

অপরাহ্নের ম্লান বেলা। চা এসে গেছে। বাইরে গিয়ে বসি। তুখানা রুটিতে মাখন মাখিয়ে প্লেটটা ঠেলে দেন আমার দিকে। পুরু করে মাখন মাখানো। আড়-চোখে দেখে নিয়ে আমিও তুলে নি তুখানা রুটি। খুব করে মাখন মাখিয়ে সামনে ধরে দি।

"এ্যাতো মাখন খাওয়া যায় ?"

"এটা ?" আমার একটা তুলে দেখিয়ে দি।

"আমার একটা দায়িত্ব আছে। বৌমা যখন বলবেন, দেহ তোমার রোগা হলো কেন, কী বলবো তাঁকে ?"

"দায়িত্ব আমারও আছে।"

"তোমার আবার দায়িত্ব কিসের ? আর বলবেই বা কাকে ?"

"কেন দেশ ?"

চোখ তুলে চান। সে-দৃষ্টি মিষ্টি মাখানো।

সার্জেন্ট ওপরে আসে। হাতে তার একখানা ছবি। কালীর ছবি। দক্ষিণা কালী। বাঁধানো ছবি। ফ্রেমের গায়ে কাগজে লেখা, 'সুভাষ'।

কে দিল ? দিল কেন ? হদিস নেই।

ছবিখানা হাতে নিয়ে আমি এ-পিঠ ও-পিঠ দেখলাম। বুঝলাম, ওরা ছবি খুলে সব দেখেছে। ভেতরে যদি কোন চিঠি বা অন্য কিছু থাকেই।

ছবিখানা হাতে নিয়ে গম্ভীর হয়ে গেলেন। একদৃষ্টি। তন্ময়। অনেকক্ষণ দেখে নামিয়ে রাখলেন।

দৃষ্টি চলে গেছে বাইরে। দূরে। অনেক দূরে।

কথা ফুটল অনেক পরে। বললেন: "কালী বাঙালীর জাতীয় দেবতা।"

আর্য-প্রভাব বাঙালী অনেকদিনই অস্বীকার করে আসছিল। খানিকটা স্বীকার করল পরে। সম্ভবত বৌদ্ধযুগের পর। কিন্তু আর্য-দেবতারা এখানে খুব বেশি সুবিধে করতে পারেননি কোনদিনই। ব্রহ্মা বিষ্ণু ইন্দ্র বরুণ সূর্য বাঙালীর দেবতা নন। বাঙালীর দেবতা মা কালী। জেলের কালী, মুচীর কালী, বাগ্দী-হাড়ি-ডোমের কালী। বাংলার মণ্ডপে কালী, মন্দিরে কালী, শ্মশানেও কালী। যেখানে বাঙালী, সেখানেই কালী।

কৃষ্ণ-পূজো বাংলায় চালু করতে গিয়ে কৃষ্ণকেও কালী সাজতে হয়েছিল। একটু থেমে আবার বললেন: "বাংলার এযুগেও সবাই কালীকে চেয়েছে। মেনেছেও। রামমোহন, রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ থেকে বঙ্কিম। তারপরের কথাও ভেবে দেখ। অরবিন্দ থেকে বাংলার সব বিপ্লবী কালীর কাছেই দীক্ষা নিয়েছেন।"

মনে পড়ল ভ্যালেণ্টাইন চিরোলের কথাটা। সেই পুরনো কালী এ-যুগে ভারতবর্ষের কাছে নবরূপে দেখা দিয়েছেন। কালীরই অন্য রূপ এদের দেশ, মাতৃভূমি। (The old invocation of Goddess Kali, Bande mataram or hail to the mother, acquired a new significance and came to be used as the political war cry of Indian Nationalism—India old and new. p. 115)

বলতেই উনি বলে উঠলেন: "আমি পড়েছি বইটা। খুব সত্যি কথা। এদেশের কোন শুভ কাজ কালীপূজা ছাড়া হয় না। এমন কি ডাকাতরাও কালীপূজা করে ডাকাতি করতে বেরুতো।"

সন্ধ্যা গাঢ় হয়ে উঠল। স্নানের ঘরে ঢুকলেন নেতা। আমিও। স্নান শেষ করে আমরা বসব ওঁরই ঘরে। খুলে দেয়া হবে রেডিও।

লর্ড হ-হর বক্তৃতা ও টিপ্পনি শুনতেই হবে। শুনতে হবে ইংরেজের কাঁদুনি, আর হিটলারের ধমকানি।

বিলেতের বৈদেশিক বিভাগের আণ্ডার সেক্রেটারী বাটলার বড় ক্ষেদে সেদিন বলে ফেলেছেন: "ইওরোপের শেষ ঘাঁটি আমরা।" অর্থাৎ ইংলণ্ড। মর্মান্তিক কথাটা।

জার্মেনীর বার্তা ইংরেজ আমাদের শুনতে দেবে না। 'জ্যাম' করে দিয়েছে। ঘরঘর একটা আওরাজ তুলে রেডিওর কথাগুলো ডুবিয়ে দেয়। নিপুণ হয়ে নেতা ওরই ফাঁকে বার্তা আহরণ করেন। শুনতে শুনতে হেসে গড়িয়ে পড়েন। আবার পরক্ষণেই উদ্দীপ্ত কণ্ঠে বলে ওঠেন: রাইট (right)···ওয়েল সেড (well said)··· বিলকুল ঠিক···

চার্চিলের বক্তৃতা হয়। চার্চিল বলে চলেছেন: "আমরা জিতবই।" নেতা অমনি জবাব দেন: "মিথ্যে কথা···"

সকালবেলা চা শেষ হবার পরই ঘসঘস করে কী যেন লিখে পাঠিয়ে দিলেন আফিসে। ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই এসে পড়ল অনেকটা ক্যাম্বিস, তার আর কাঁটা। খাবার ঘরের একটা কোণে তৈরী হলো পূজোর ঘর। ছোট জলচৌকির ওপর বসানো হলো মা কালীকে। বিকেলে বাড়ি থেকে এল পেতলের পিলসুজ, প্রদীপ, ধূপদানী, টাট। আয়োজনের কোন আর ত্রুটি থাকল না।

সুভাষচন্দ্রের কালীপূজো শুরু হল।

"আই. এ.র রেজাল্ট আমার একটুও ভালো হয়নি। পড়িইনি তা হবে কোত্থেকে। ঠিক করলাম, বি. এটা ভাল করতে হবে। রোখ চেপে গেলো।"

কিন্তু রোখ চাপলে কী হবে? শনি তখন রন্ধ্রে। ওটেন এসে দাঁড়ালেন একেবারে পাঁচিল হয়ে। বাধা পড়ল।

প্রেসিডেন্সী কলেজের সেই ঘটনা। আমি জিজ্ঞেস করলাম: "সত্যিই কি ওটেনকে আপনি মেরেছিলেন?"

"না। ঘটনাটা ঘটলো এমন আচমকা যে, ঠিক ধরতেই পারলাম না যে, কে ঐ সৎকর্মটি করে ফেললো। মনে হয় অনঙ্গ (দাম) মেরেছিলো। বাঙাল তো।"

উনি মারেননি। কিন্তু অভিযুক্ত হয়ে অস্বীকারও করেননি। হাজার প্রশ্নেও কারও নাম বলেননি। শুধু বলেছিলেন: "বলবো না।"

কলেজের দোর রুদ্ধ হয়ে গেল।

গেলেন ফিরে আবার কটকে। চুটিয়ে মড়া পোড়ালেন। রোগীর সেবা লাগিয়ে দিলেন। কীর্তনে মেতে উঠলেন। এর সঙ্গে ছিল দল বেঁধে প্যারেড আর স্বদেশী গান।

অনেক কাঠ-খড় পুড়িয়ে দু-বছর পর স্থান পাওয়া গেল স্কটিশচার্চ কলেজে। ডাঃ আরকুহার্ট তখন অধ্যক্ষ।

বলছেন: "আরকুহার্ট ছিলেন সত্যিকারের পণ্ডিত আর বিদ্যের জাহাজ। দর্শনে আমি অনার্স নিয়েছিলাম। ওঁর কাছেই পড়তে হতো। উনি আবার ছিলেন প্রাগ্‌মাটিজমের পরমভক্ত। বলতে পারো, ওঁর এ প্রভাব আমাকেও ছাড়েনি।"

উত্তরকালে সুভাষচন্দ্র অনেক ক্ষেত্রে গর্বভরে বলেছেন যে, তিনি একজন প্রাগ্‌মাটিস্ট। শিষ্যর মনে দর্শনের ছক-বাঁধা বুলিগুলিই আরকুহার্ট ঢুকিয়ে দেননি শুধু, দর্শনশাস্ত্রের সাহায্যে জীবন-দর্শনের ক্ষেত্রেও মানুষ সুভাষ এই জ্ঞান তাপসের কাছ থেকে যে প্রেরণা পেয়েছিলেন, তা তিনি আজীবন স্মরণ রেখেছিলেন। কর্মক্ষেত্রে এই প্রভাব তাঁকে শক্তি যুগিয়েছে, নির্ভীক করেছে, স্পষ্ট করে প্রাণের কথা বলতেও দিয়েছে।

পরীক্ষায় সুভাষচন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন।

আচমকা বলে উঠলেনঃ "আরে, একটা কথা বলতেই ভুলে গেছি। আমার সমরশিবিরের কথা। স্কটিশচার্চ থেকেই আমি ইউনিভার্সিটি ট্রেনিং কোরে যোগ দি। মাস চারেক ছিলাম বেলঘোরের ক্যাম্পে। ওখানেই আবার আমার দেখা হয় ওটেনের সঙ্গে।"

ট্রেনিং কোরের নায়ক ছিলেন ক্যাপ্টেন গ্রে। সুভাষচন্দ্রের নিয়মানুবর্তিতা, নিষ্ঠা আর কর্মকুশলতা গ্রেকে আকৃষ্ট করেছিল। শিক্ষার শেষ পর্যায়ে ক্যাম্পে দেখা দিলেন ওটেন সাহেব। ওটেন তখন ছিলেন শিক্ষা-বিভাগের ডাইরেক্টার আর ট্রেনিং কোরেরও।

ওটেন ছেলেদের প্যারেড দেখলেন। দেখে প্রীতও হলেন। আফিসে ডাক পড়ল সুভাষচন্দ্রের। হয়তো গ্রের কাছ থেকে কিছু শুনেও থাকবেন।

নেতা বলছেনঃ "ভাবলাম, এইবার বুঝি ওটেন ঝাল মেটাবেন। গেলাম। কিন্তু বিলক্ষণ দুশ্চিন্তা নিয়েই গেলাম। ওটেন পাশে ডেকে বসালেন। গল্প করলেন। আর ক্যাম্প থেকে যাবার আগে আমাকে একজন নন্ কমিশন্ড্ অফিসারও করে গেলেন।"

নীচ তলা থেকে একটা গাঁক গাঁক শব্দ আসছিল। উৎকীর্ণ হয়ে শুনলাম। রেলিং ঝুঁকে দেখতেও চাইলাম। ততক্ষণে শ্রীমান যতীন (ফালতু) হাঁপাতে হাঁপাতে ওপরে এসে পড়েছে।

নীচ তলায় থাকত জনা চারেক ইওরোপিয়ান। জাতে ওরা গ্রীক। জাহাজের নাবিক। স্মাগলিংএর অভিযোগে ধরা পড়েছে। মাঝে মাঝে দুর্বোধ্য চিৎকার করে উঠত ওরা। প্রথমটায় হকচকিয়ে যেতাম। পরে বুঝেছিলাম, ওটা ওদের সঙ্গীতচর্চা।

এবারকার শব্দে চমকে উঠেছিলাম নিশ্চয়ই। উচ্চাঙ্গের সঙ্গীত বলে কিন্তু মনে হল না। যতীন্দ্রনাথ একান্ত সুবোধ ছেলের মতোই দালানের এক প্রান্তে বসে রইল। নির্বিকার।

একটু পরই উঠোন থেকে এল একটা বিকট চিৎকার। তাকিয়েই

দেখি, একটা ছোকরা-মতো সাহেবের বাচ্চা। খালি গা। পরনে আণ্ডার অয়ার। সাদা ওর পেটটা রক্তাক্ত। ঝর ঝর করে ঝরে পড়ছে লাল রক্ত।

আমাদের দেখতে পেয়ে পেটটা দেখাচ্ছে, আর কী যেন বলছে।

স্তব্ধ হয়ে গেলাম। এক্কেবারে চুপ। একটুক্ষণের জন্য। তখুনি নেতা উঠলেন। এগিয়ে গেলেন যতীনের কাছে। বললেন: "কী হয়েছে রে? কিছু লুকোসনি। সব খুলে বল।"

সুভাষচন্দ্রের খাস ফালতু বলে শ্রীমানের হয়তো কিছু-একটু গর্ব ছিল। কিন্তু নিছক গর্বই ঘটনাটা ঘটায়নি। যতীন খাবার জল ভরতে গিয়েছিল নীচের কলে। কুঁজোয় জল ভরছিল। ঠিক সেই সময়েই সাহেব এসে কলতলায় দাঁড়িয়ে মূত্র ত্যাগ করতে থাকে। যতীন অবিশ্যি বলতে চেয়েছিল যে, কুঁজোর ওপরেই ঐ সাধুকর্মটি সাহেব সমাধা করেছে। হয়তো অতদূর গড়ায়নি। তবে ছিটকে দুচার ফোঁটা কি আর কুঁজোয় লাগেনি!

ও জন্যেও যতীনের রাগ যে না হয়েছিল তা নয়। হয়েছিল। কিন্তু প্রকৃত ধৈর্য-চ্যুতি ঘটল অন্য কারণে। যতীন যৎসামান্য গর্জন করে উঠেছিল; কিন্তু সামান্য গর্জনের ফলে সাহেবের পো অকস্মাৎ উলঙ্গ হয়ে তার সামনে ধেই ধেই করে নৃত্য শুরু করে দেবে, যতীন এটা কল্পনা করেনি। এর পরের ঘটনা অত্যন্ত প্রাঞ্জল ও সংক্ষিপ্ত। আধখানা ইঁট অত্যন্ত মৃদু ভাবে যতীন ওর পেটের ওপর ফেলে দিয়েছিল।

নেতা বললেন: "তাই বলে তুই ইঁট ছুঁড়ে মারবি? যা এবার ঘানি ঘরে।"

"মারবো না? ও ভেবেছে কী? আমরা কালো বলে মানুষ নই?"

যতীনের আরক্ত চোখের কোণ জলে ভরে উঠেছে।

যতীনের ছুটি হয়ে গেল। কিন্তু কাজ বাড়ল নেতার আর

খানিকটা আমারও। কলম ছুটল। সেপাইএর হাতে কাগজখানা দিয়েই বলে উঠলেন: "কুকটাকে (রান্না করত আর একজন ফালতু) ঠিক করে করে ফেলো। আর সেপাইটার কানেও মন্ত্র দাও।"

অর্থাৎ অ্যালিবি। সাফাই।

একটুক্ষণ বাদেই সার্জেন্ট্ এল। এল জেলারও।

সেপাইকে হাত করে আমি নীচের রান্নাঘরে গিয়েছিলাম কুকটাকে তালিম দিতে। ফিরে এসেই দেখি জেলার বেচারা কাঁচুমাচু মুখে দাঁড়িয়ে আছে ও সামনে দাঁড়িয়ে নেতা অনর্গল বক্তৃতা করছেন।

রাত্রে ওরা ঘুমুতে দেয় না। ষাঁড়ের মতো চেঁচায়। বিদঘুটে আর অশ্লীল ওদের চালচলন। নিতান্ত নিরীহ আর ভালোমানুষ আমাদের ফালতুটাকে অল্পের জন্য ওরা মেরে ফেলেনি, বা ফেলতে পারেনি, সে শুধু আমরা ছিলাম বলে। যে-ভাবে ওকে চেপে ধরেছিল—

আর বেশি বলতে হলো না। জেলার সটান নীচে নেবে গেল। সঙ্গে সঙ্গে সে কী গালাগাল। একজন সার্জেন্ট্ মোতায়েন করা হলো ওদের সায়েস্তা করবার জন্য।

কিন্তু জাজ্বল্যমান পেটের ঐ রক্ত-ঝরা ক্ষতটা?

ওটা হয়তো কিছুই নয়। নেহাতই আক্সিডেন্ট্। ধস্তাধস্তির সময় ছেলেটা হয়তো পড়ে যায় ইঁটের ওপর। তাই একটু লেগেও থাকবে।

দার্শনিক আরকুহার্টের মহিমা খুব ভালো করেই বুঝলাম। প্রাগমাটিস্ট সুভাষচন্দ্রের কাছে ঐ গ্রীক সাহেবের চাইতে তাঁর দেশবাসী যতীনের মূল্য অনেক বেশি। যতীন তাঁর দেশের মানুষ। আপন জন। আপন জনের জন্য যদি একটু মিথ্যাচার হয়েই থাকে, সুভাষ তার জন্য কোনদিন অনুতপ্ত হবেন না।

প্রয়োগবাদের এই প্রয়োগনৈপুণ্য সুভাষচন্দ্রকে বড় করেছে কি

ছোট করেছে, সে বিচার অনাবশ্যক। কিন্তু এরই ভেতর দিয়ে ভালো-মন্দ মেশানো যে সুভাষচন্দ্রকে আমরা পেয়েছিলাম নেতারূপে, তিনি দেবতা বা অতি-মানব ছিলেন না, ছিলেন একান্তই মানুষ।

এই মানুষ-সুভাষচন্দ্রই দেশের শত কোটি মানুষের জন্য কেঁদেছিলেন। তাদের দুঃখ আর দুর্দশার মরুবুকে মুক্তির ভাগীরথীকে আনতে ডিঙিয়ে গিয়েছিলেন পাহাড়-পর্বত-নদ-নদী আর সাগর। সঙ্গীর আশায় বসে থাকেননি। সুযোগের প্রতীক্ষায় কাল কাটাননি।

'সিটি অব ক্যালকাটা' ছাড়ল তক্তাঘাট থেকে। দিনটা ছিল ১৫ই সেপ্টেম্বর। ১৯১৯। সুভাষচন্দ্র চলেছেন আই. সি. এস. হতে।

সকাল বেলা এলেন মেজর পাটনি। সৌজন্য বিনিময় হলো। হলো কুশল প্রশ্ন। কোন অসুবিধে হচ্ছে কিনা পাটনি জিজ্ঞেস করলেন।

রাত্রিবেলা বার তিনেক সেপাই আসত ওপরে, প্রতিবার পাহারা বদলির সময়। নতুন পাহারাওয়ালা এসে তালা ধরে টানবে, শিকের ফাঁক দিয়ে দৃষ্টি তির্যক করে দেখে নেবে কয়েদীকে, তারপর আশ্বস্ত হবে। আমাদের দরজা বন্ধ হত না। তবু যথারীতি ওদের দেখে যাবার বিধি ছিল! গভীর রাত্রে লোহার নাল বসানো ভারি জুতোর আওয়াজ খুব প্রীতিপ্রদ হবার কথা নয়।

নেতা ঘুমুতেন একটু বেশি রাতে। জুতোর শব্দে ঘুম ভেঙে যাবার ফলে মাঝে মাঝে আর ঘুমই হতে চাইত না। আমি পাটনিকে বললাম! পাটনি হাঁ-না কোন কথাই বললেই না। শুধু শুনেই গেলেন। কিন্তু সেদিন থেকেই সেপাইদের রাত্রিবেলা ওপরে আসা বন্ধ হয়ে গেল।

পাটনি চলে যেতেই শুরু হলো আমাদের নিত্যদিনের কথা। নেতা বললেন: "এই সময়টা সত্যি আমি ভয় পেয়েছিলাম। অসোয়াস্তিও

কম ছিলো না। একদিন কয়েকজন বন্ধু মিলে অঙ্গীকার করেছিলাম যে, ইংরেজের গোলামি করবো না। চোখের সামনে দেখলাম, সেই অঙ্গীকার ভুলে যাবার দুঃসময় এগিয়ে আসছে।”

বি. এ. পরীক্ষার সাফল্যে পিতা জানকীনাথ খুব সম্ভব উৎসাহী হয়ে উঠেছিলেন। পিতার পাশে সেদিন ছিলেন মেজদাদা শরৎচন্দ্রও। উঠতি ব্যারিস্টার। স্যর নৃপেন সরকারের শিষ্য ব্যারিস্টার শরৎ বোস।

দুরন্ত এই পুত্রটির জন্য সত্যই জানকীনাথের দুশ্চিন্তার অবধি ছিল না। আর সবাই মানুষ হয়েছে। হচ্ছে। কিন্তু এটি? একবার সন্ন্যাস, আরবার রাশটিকেশ্যন! মুখে কিছু বলেননি সত্য, কিন্তু মন? হাজার বার সেই মনই প্রশ্ন তুলত, চিরদিন কি ও এমনি করেই জীবন কাটাবে?

তাছাড়া ঐ দলবল। ৩ নং মির্জাপুর, কৃষ্ণনগর এবং আর আর স্থানের কিছু কিছু বারতা তাঁর কানেও পোঁছোয় বৈকি। নিতান্ত তাঁর পুত্র বলেই হয়তো কারণ থাকা সত্ত্বেও পুলিস ধরেনি। কিন্তু এর পর?

তাই, এই শেষ চেষ্টার আকাঙ্ক্ষা জানকীনাথের প্রাণে হয়তো প্রেরণা জুগিয়েছিল। সুভাষকে বাঁধতে হবে। লোহার শেকলে নয়,—খাঁচায়। স্টীল ফ্রেমে ইংরেজের ঐ নিরেট স্টীল ফ্রেমের কঠিন ফাঁদে যে একবার পড়ে, তার আর নিস্তার নেই। অজস্র প্রলোভন তার সহস্র উপঢৌকন নিয়ে এগিয়ে আসবে। আসবে মর্যাদা, প্রতিপত্তি, অর্থ। সুভাষ মানুষ হবে।

পিতা হয়েও জানকীনাথ তাঁর এই খাপছাড়া ও গোত্রছাড়া পুত্রটিকে চিনতে বিলম্ব করেছিলেন। সাংসারিক পিতা পুত্রকে সংসারী করতেই চেয়েছিলেন কিন্তু তাঁর এই একরোখা আর পরিণাম-চিন্তাহীন অবুঝ পুত্রটি যেদিন নিজের গোপন মানস-মন্দিরে এক দুর্জয় সংকল্পের শিলাকঠিন বর্মে নিজেকে জড়িয়ে অজানা বিদেশের বুকে

পাড়ি দিল, তার গোপন অভিলাষ সেদিন পিতা হয়েও জানকীনাথের অজ্ঞাতেই থেকে গেল।

শুধু কি পিতা? আবাল্যের বন্ধুরা, যারা সুভাষকে দেখতে চেয়েছিল দেশ-প্রেমিকরূপে, সহসা তাঁর এই রূপান্তরে তাদের মনেও লাগল বিলক্ষণ দোলা। সুভাষচন্দ্রকে তারা দলত্যাগী ভেবেই সেদিন পরিতুষ্ট হয়নি, তারা তাঁকে ভেবেছিল দেশদ্রোহী।

বন্ধু হেমন্তকুমার এক পত্রে লিখেছিলেন: "তুমি ম্যাজিস্ট্রেট হয়ে আসার সঙ্কল্পকে যদি মুহূর্তের জন্য স্থান দিয়ে থাকো, তাহলে চাকরি গ্রহণ করাই ভালো; কোথায় posted হবে জানিয়ো আমি সেখানে অসহযোগ প্রচার করে তোমার হাতে শাস্তি নিয়ে জেলে যাবো।" (সুভাষের সঙ্গে বারো বছর, ৮৩ পৃ.)

কাউকে কিছু বলা হলো না। সময়ও ছিল না। পিতা জানকীনাথ ভাববার জন্য মোট চব্বিশ ঘণ্টা সময় দিয়েছিলেন। আর সাত দিনের মধ্যেই যেতে হলে রওনা হতে হবে, সে কথাটাও জানিয়ে দিয়েছিলেন।

সময় ছিল না হাতে আদৌ। মাত্র ন'টি মাস। এই ন' মাসে আই. সি. এস. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া,—হয়তো কেন,—নিশ্চয়ই সম্ভবপর হবে না, কিন্তু তাঁর আবাল্যের স্বপ্ন, স্বাধীন দেশের বুকে দাঁড়িয়ে প্রাণ ভরে নিঃশ্বাস নেওয়া: সে কী মহত্তম সিদ্ধি যা পেয়ে ওরা থাকল স্বাধীন, আর যার অভাবে এ দেশ হল চিরদিনের পরাধীন?—দেখতে হবে না নিজের চোখে?

গোনা ক'টা দিন কেটে গেল। সুভাষ জাহাজে চড়ে বসলেন।

কিন্তু সত্যিই কি তিনি ইচ্ছে করলে বন্ধুদের কাছে নিজের মনোভাবের সবটা না হোক, কিছুটাও জানাতে পারতেন না? জিজ্ঞেস করেছিলাম। উত্তর দিলেন: "পারতাম। কিন্তু ইচ্ছে করেই সেদিন দিইনি। বন্ধু, সঙ্গী, সহকর্মী, যদি মনের কথাই না জানলো, মুখে বলে আর কতটাই বা বোঝানো যায়।"

সুভাষ-জীবনের এক অনিবার্য প্রাপ্তি। উত্তরকালে যেদিন তিনি

আঁধার-কালো ভবিষ্যৎকে একান্ত করে গ্রহণ করেছিলেন নিজের জীবনে, আর দুর্লঙ্ঘ্য বন্ধুর পথে পাড়ি জমালেন অকুতোভয়ে, সেদিনও এই বন্ধুরাই বলতে চেয়েছে : "সহকর্মীদের অর্থের দাবী না মেটাতে পেরে সুভাষ শেষ পর্যন্ত চোখের জল ফেলে দেশত্যাগ করেছে।" (হেমন্ত সরকার প্রণীত সুভাষের সঙ্গে বারো বছর, ১৫২ পৃ.) আর একজন বলেছেন : "এমন কতকগুলো ঘটনার পাকে সুভাষ জড়িয়ে পড়েছিল, যা তার বেদনা-কাতর অন্তরকে খুঁড়ে খাচ্ছিল। ওর হাত থেকে পরিত্রাণ পেতেই এই দুঃসাহসিকতার পথ তাকে বেছে নিতে হয়েছিল।" (দিলীপকুমার রায় কৃত দি সুভাষ আই নিউ, ১৯০ পৃ.)

এদের কাছে যদি কিছু না বলেই থাকেন, খুবই কি মারাত্মক অন্যায় করেছিলেন ?

সহসা জহরলাল সচেতন হয়ে উঠলেন। তাঁর মনোভিলাষ যে আর গান্ধীর অজানা নেই, এই পরমতত্ত্ব জেনে নিশ্চয়ই তিনি সেদিন খুব বেশি পুলকিত হয়ে উঠতে পারেননি। ১৯৪০-এর জহরলাল একমাত্র ভাবাবেগে চলতে নারাজ। তাঁর সন্ধানী দৃষ্টি চারিপাশের পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করতে চায়।

জহরলাল চাইলেও সেদিনের ভারতবর্ষ ইংরেজকে তাঁর মতো প্রীতির চক্ষে দেখতে চায়নি। ইংরেজের পরাজয়ে দেশের আপামর জনসাধারণ উল্লসিত হয়েছে, ইংরেজের বিপর্যয় উপভোগ করেছে। তাঁর মত আর অভিপ্রায় এর কোনটাই যে সেদিন জনসাধারণ সমর্থন করবে না, এই সিদ্ধান্তে পৌঁছোতে জহরলালের, তাই, বেশি সময় লাগল না। উপরন্তু যখন দেশবাসী জানল যে, মহাত্মাজি ও তাঁর অনুবর্তীদের অধিকাংশ জহরলালের অতি-আধুনিক ইংরেজ-সহযোগিতার ফরমূলা অগ্রাহ্য করেছেন, জনসাধারণের সেই অসমর্থন বিরূপতায় পরিণত হতে কালবিলম্ব করল না।

আগস্ট মাসের শেষে জহরলাল ঘোষণা করলেন যে, পুণা-প্রস্তাব "মৃত এবং পরিত্যক্ত"। (dead and gone. পট্টভির ইতিহাস, ২য় খণ্ড, ২১৩ পৃ.) অনুতপ্ত পথভ্রষ্ট পুত্র-প্রতিম-জহরলাল কবে আবার ক্ষমা-সুন্দর পিতৃতুল্য গান্ধীর পদপ্রান্তে আশ্রয় নেবে? (It only remained for the prodigal son to return to the father—পট্টভি, ২১১ পৃ.)

জহরলাল গান্ধীর পদপ্রান্তে আশ্রয় নিতে কালবিলম্ব করেননি। উভয়েই উভয়কে বিলক্ষণ চিনতেন। এবং এ কথাও অত্যন্ত ভালো করেই জানতেন যে, কেউই কাউকে ছাড়তে পারবেন না। সম্পর্ক ওঁদের অচ্ছেদ্য।

জহরলাল সম্পর্কে গান্ধীর সংশয় এই প্রথম দেখা দেয়নি। দিয়েছিল অনেক আগেই। গান্ধী মুখে বলেছেন। গান্ধী লিখেও জানিয়েছেন। বিবৃতির মাধ্যমে গান্ধী কঠোর ভাষাও ব্যবহার করেছেন। সুদূর ১৯২৮-এ গান্ধী জহরলালকে এক পত্রে লিখেছিলেনঃ "তোমার ও আমার মধ্যেকার পার্থক্য এতই বিস্তৃত, ব্যাপক এবং মৌলিক যে, আমাদের উভয়ের এক সঙ্গে দাঁড়াবার কোন মিলনভূমি আছে বলে আমি ভাবতে পারি নে।" (ডি. জি. টেণ্ডুলকার লিখিত মহাত্মাজির জীবনী, ৮ম খণ্ড, ৩৫১ পৃ.)

এর চাইতেও কঠোর ভাষা গান্ধী প্রয়োগ করেছেন ১৯৩৯-এ। সেদিনগান্ধী জহরলালের যে-চরিত্র তাঁর বিবৃতিরমাধ্যমে এঁকেছিলেন ও প্রচার করেছিলেন, তার ভেতর গান্ধী-স্বকীয়তা ছাড়াও যথেষ্ট উত্তাপ ছিল এবং রূঢ়তাও কম প্রকাশ পায়নি। (The author of the statement is an artist. Though he cannot be surpassed in his implacable opposition to Imperialism in any shape or form, he is a friend of the English people. Indeed he is more English than Indian in his thoughts and make-up. He is often more at home

with English men than with his countrymen.—ডাঃ পট্টভির ইতিহাস, ২য় খণ্ড, ১৩২ পৃ.)

এসব সত্ত্বেও জহরলাল ছিলেন গান্ধীর কাছে অপরিহার্য। অতি-আধুনিক রাজনীতির সঙ্গে গান্ধীর বিশেষ কোন পরিচয় ছিল না। ১৯৩৩-৩৪এর পরবর্তীকালে দেশে যে নবতম রাজনৈতিক চেতনা ধীরে অথচ সুনিশ্চিত ভাবে প্রকাশ পেতে শুরু করে, তার সঙ্গে না গান্ধীর, না তাঁর দলের আর কারও, নিবিড় তো দূরের কথা সাক্ষাৎ পরিচয়ও ছিল না। কিন্তু জহরলালের ছিল। এবং এরই পটভূমিকায় জহরলাল তরুণ মনের ওপর বিলক্ষণ প্রভাবও বিস্তার করতে সমর্থ হয়েছিলেন। এই প্রভাবের সুযোগ ও সুবিধা গ্রহণ করা গান্ধীর পক্ষে অত্যাবশ্যকীয় হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

কিন্তু লোকপ্রিয়তা, চমকপ্রদ ব্যক্তিত্ব আর অতি আধুনিক রাজনৈতিক প্রজ্ঞানের প্রাখর্য সত্ত্বেও জহরলাল ছিলেন নিতান্তই একজন ব্যক্তি। সাংগঠনিক ক্ষমতার অভাব ছিল তাঁর চরিত্রে। উত্তেজনা ও আকর্ষণ সৃষ্টি করবার ক্ষমতা তাঁর ছিল অসাধারণ কিন্তু গঠনমূলক স্থায়ী প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলবার তাঁর না ছিল চারিত্রিক দৃঢ়তা, না ছিল ধৈর্য। এবং এরই পরিপ্রেক্ষিতে তাঁকে অন্যের সাহায্য ও সহযোগিতার মুখাপেক্ষী হয়ে নিজেকে চালাতে হয়েছে বহুদিন। গান্ধীর অসাধারণ সাংগঠনিক শক্তির কাছে বার বারই তাঁকে এই কারণে ধরা দিতেও হয়েছে।

এবারেও সেই অপরিহার্য পরিণতিই তাঁকে আর একবার গান্ধীর ছত্রছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করতে বাধ্য করাল। উপায়ান্তর নেই জেনে গান্ধীও প্রসন্ন হতে বাধ্য হলেন।

গান্ধী প্রথমটায় প্রায়োপবেশন করতে চেয়েছিলেন কিন্তু ওয়ার্ধার সম্মিলিত ভক্তদের অনুরোধে তিনি সে সঙ্কল্প ত্যাগ করেছেন। নতুন ভাবে সমস্ত পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে তিনি ব্যক্তিগত আইন-অমান্যের প্রবন্ধ রচনা করলেন।

যে আইন-অমান্য গান্ধী অনুমোদন করলেন, তা সামগ্রিক নয়। সামগ্রিক আইন অমান্য এই সময়ে, ইংরেজের এই বিপর্যয়ের মুখে, প্রবর্তন দূরের কথা, চিন্তা করাও গান্ধী-নীতি বিরোধী। তাই ব্যক্তি-সত্যাগ্রহ। জাতি বা দেশ নয়। ব্যক্তি। তুমি বা আমি। আমরা নয়।

এই প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে ডাঃ পট্টভি তাঁর কংগ্রেসের ইতিহাসে যা বলেছেন, তা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। সত্যাগ্রহ ঘোষণা করবার সঙ্গে সঙ্গে গান্ধীর মনে একথা জেগেছিল যে, এ সত্যাগ্রহ কোনক্রমেই যেন সাফল্য না পায়। আর তাই, তিনি সামগ্রিক সত্যাগ্রহের পরিবর্তে এই অভিনব রূপক (symbolical) সত্যাগ্রহের পরিকল্পনা করেছিলেন। এবং প্রকৃত সত্যাগ্রহের পরিবর্তে এই রূপক অথবা প্রতীক এবং প্রায়-অকেজো সত্যাগ্রহ দ্বারা তিনি আর একবার যে ইংরেজের হৃদয় জয় করবার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠেছিলেন, পট্টভি এ কথাটা বলতেও ভোলেননি। (Even at the risk of making its Satyagraha ineffective it deliberately gave it a symbolic character, in the hope that this policy of non-embarrassment would be duly appreciated. History of Congress, vol. II p. 338)

বস্তুত গান্ধীর রাজনৈতিক জীবনের খুবই একটা সঙ্কট মুহূর্ত দেখা দিয়েছিল। একদিকে কংগ্রেসের অস্তিত্বের প্রশ্ন, অন্যদিকে ইংরেজের মনোরঞ্জনের সমস্যা। এই উভয় সঙ্কটে পড়ে গান্ধী অনন্যোপায় হয়েই অনেকখানি দ্বিধা ও সংশয় নিয়ে এই নিরীহ সত্যাগ্রহ চালু করতে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। জহরলালের প্রকাশ্য ইংরেজ-তোষণের মনোবৃত্তি সমর্থন করলে কংগ্রেসের অস্তিত্ব লোপ পাবে। তাছাড়া দেশব্যাপী তাঁর নিজের মাহাত্ম্যও কি অক্ষুণ্ণই থাকবে? সর্বোপরি ইংরেজ: ব্যক্তি-সত্যাগ্রহ খুবই নিস্তেজ আন্দোলন সন্দেহ নেই কিন্তু ইংরেজ কি তাঁর—গান্ধীর,—সঙ্কটের কথা একটুও বুঝবে না? ইংরেজ কি

বুঝবে না যে, কংগ্রেস যতদিন তাঁকে অনুসরণ করবে, ইংরেজের অস্তিত্বের পক্ষে বিপজ্জনক পরিস্থিতি যথাসাধ্য তিনি পরিহার তো করবেনই, প্রতিরোধ করতেও পশ্চাদ্‌পদ হবেন না? ইংরেজের আসন্ন কালরাত্রির সুযোগ তিনি নেবেন না নিশ্চয়ই, কিন্তু কংগ্রেস টিকে না থাকলে তিনি কার মাধ্যমে এই বিপদভঞ্জক দেশ-হিতৈষণার পরিচয় দেবেন?

অনন্যোপায় গান্ধীর পক্ষে এর বেশি কিছু করা সম্ভবপরও নয়। হয়তো ইংরেজ ক্ষুণ্ণ হবে,—যৎসামান্য অস্বস্তি ঘটাও খুবই স্বাভাবিক, কিন্তু কংগ্রেসকে ধ্বংস তথা আত্মহত্যা করাই বা তাঁর পক্ষে সম্ভবপর হবে কী করে?

ব্যক্তি-সত্যাগ্রহ প্রবর্তন করা ছাড়া গান্ধীর গত্যন্তর নেই। (Non-embarrassment should not go to the point of self extinction. পট্টভি, ২য় খণ্ড, ৩৩৮ পৃ.)

এর মধ্যে স্বাধীনতার প্রশ্ন নেই। নেই ভারত ছাড়ার সমস্যা। নিছক ব্যক্তিক ইচ্ছা বা অনিচ্ছা এবং ব্যক্তির নিরীহ প্রতিবাদ জানাতে গান্ধী এই সত্যাগ্রহ অনুমোদন করেছিলেন। একদিকে প্রতিক্রিয়াশীল আজাদ-জহর-রাজাজির দুষ্ট মতলব বানচাল করে দেয়া, অন্যদিকে নিষ্ক্রিয় কংগ্রেসকে খানিকটা কর্মব্যস্ত করে রাখা,—এই দুই অভীপ্সা গান্ধীকে সেদিন এই পথ বেছে নিতে বাধ্য করেছিল। (He did not visualise any civil disobedience on the basis of demanding independence. পট্টভি, ২য় খণ্ড, ২১৩ পৃ.)

অন্য অন্য বারের মতো এবার গান্ধী নিজে যেচে কারাবরণ করবেন না। ও তামাশা যথেষ্ট হয়ে গেছে। আর নয়। (He did not wish to go through that joke. পট্টভি, ২য় খণ্ড ২১৪ পৃ.) কিন্তু এই জনাকয়েক মার্কামারা লোকের কারাবরণে যে দেশের বুকে আর ইংরেজের মনে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করবে না, এ-সংশয়ও

গান্ধীর মনে জেগেছিল। তাই তিনি সাময়িকভাবে প্রায়োপবেশনের প্রশ্ন স্থগিত রাখলেও মন থেকে তা নির্বাসিতও করলেন না। (His feeling was that if he thought he could not do anything effective towards C. D., he could not resist a fast. পট্টভি, ২য় খণ্ড, ২১৪ পৃ.)

১৫ই সেপ্টেম্বর বোম্বাইতে এ. আই. সি. সি.র বৈঠক বসল। আর এই বৈঠকেই গান্ধী তাঁর হারানো নেতৃত্ব আবার ফিরে পেলেন। সত্যাগ্রহের প্রস্তাব গৃহীত হলো।

১৭ই অক্টোবর ১৯৪০। প্রথম সত্যাগ্রহী নির্বাচিত হলেন বিনোভা ভাবে। কংগ্রেস সভাপতি নয়, ওয়ার্কিং কমিটির কোন সদস্য নয়, অজ্ঞাত, নাম না-জানা এই বিনোভা ভাবেকে গান্ধী সেদিন কেন প্রথম সত্যাগ্রহীর অপ্রতিদ্বন্দ্বী সম্মান প্রদান করেছিলেন, এ নিয়েও প্রশ্ন উঠেছিল। কিন্তু গান্ধী সে প্রশ্নের প্রত্যক্ষ কোন উত্তর না দিয়ে শুধু এই কথাই বলেছিলেন যে, তাঁর কাছে বিনোভা একজন যথার্থ সত্যাগ্রহী।

গান্ধী কথা বলেন কম কিন্তু তার ভেতর থেকে উঁকি দেয় বহু না-বলা কথার মর্মবাণী। রাজনীতি ক্ষেত্রে দলের প্রয়োজনীয়তা আছে। দল রাখতে গেলে অনেক সময় গোঁজামিল অপরিহার্যও হয়ে পড়ে এবং এই অপরিহার্যতার পরিণাম সর্বথা যে প্রীতিপদ ও মনোমত হয় না এ কথাও গান্ধীর অত্যন্ত জানা। পুণায় আজাদ, নেহরু, রাজাজি, প্যাটেল কি একান্তই আকস্মিকভাবে গান্ধী-বিরোধী হয়ে পড়েছিলেন? গান্ধী বিশ্বাস করেন না। আবার সময় আর সুযোগ উপস্থিত হলেই যে এঁরা তাঁর আদর্শ ও মত উপেক্ষা করে নিজেদের সঙ্কল্প ও মতলব হাঁসিল করতে উঠে পড়ে লাগবেন, এ আশঙ্কা কি গান্ধীর মনে একেবারেই জাগেনি? জেগেছিল। জেগেছিল বলেই বিনোভার নির্বাচনদ্বারা পরোক্ষে আজাদ-নেহরুদের অন্তত আদর্শ সত্যাগ্রহী বলতে গান্ধী অস্বীকার করেছেন। অন্যদিকে

জাতির সম্মুখে বিনোভার মতো গান্ধী-অনুবর্তীরা, যাঁরা রাজনীতির পুরোভাগে আসবার যে-কোন কারণেই হোক সুযোগ পাননি, তাঁদের এই মর্যাদা দিয়ে স্বপ্রতিষ্ঠ করাও হয়তো তাঁর ইচ্ছা ছিল।

গান্ধীর আশঙ্কা যে অমূলক নয়, তার প্রমাণ তিনি জীবিতকালেই প্রত্যক্ষ করেছিলেন। করেছিলেন ১৯৪৭-এ। কিন্তু এসব পরের কথা।

এ প্রসঙ্গ ওঠবার পূর্বেই বিলেতের কথা শোনা আমার শেষ হয়ে গেছে।

গজেন্দ্র গমনে চলছে 'সিটি অব ক্যালকাটা'। ঘাটে ঘাটে ভিড়ছে, থামছে, আবার চলছে। থামল এডেনে, থামল সুয়েজে, থামল পোর্টসৈয়দ আর জিব্রালটারে। এক মাসের জায়গায় আরও সাতদিন কাটিয়ে জাহাজ ভিড়ল টিলমারী।

এমনিতেই দেরি হয়ে গেছে। তারপর জাহাজের এই গতি। কলেজে স্থান পাওয়া যাবেই না, এইটেই ধরে নিয়েছিলেন সুভাষ। কিন্তু পেয়ে গেলেন। কটকের এক বন্ধু অনেক কাঠ-খড় পুড়িয়ে স্থান করে দিলেন।

দিলেন তো, কিন্তু চলে-যাওয়া দিনগুলি তিনি ফিরিয়ে আনবেন কেমন করে? দু সপ্তাহ আগে পড়া শুরু হয়ে গেছে।

লণ্ডনে সুভাষচন্দ্র পৌঁছেছিলেন ২৫শে অক্টোবর। সবকিছু গুছিয়ে ঠিকমত পড়ুয়া হয়ে কেম্ব্রিজে জুতজাত হয়ে বসতেই নভেম্বর কেটে গেল। পরীক্ষা জুন মাসে। হাতে গোনা আটটি মাস। শুধু সিভিল সার্ভিস হলেও-বা কথা ছিল, সঙ্গে নিলেন মেণ্টাল ও মরাল সায়েন্সের ট্রাইপস।

"সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় পাশ তো দূরের কথা, ওটা আদৌ দেয়া হবে কিনা সেইটাই ছিলো আমার তখনকার মনোভাব। তাই সঙ্গে নিয়েছিলুম ট্রাইপসটা। একটা কিছু হয়ে তো ফিরতে হবে।"

বলেই একটু থামলেন নেতা। পরক্ষণেই বলে উঠলেন: "মনে মনে কিন্তু ফেল করবার কামনাই বড় হয়ে উঠেছিলো।"

একদিকে সমগ্র পরিবারের একটা বৃহৎ চাওয়া, অন্যদিকে নিজের অন্তরের তীব্র আকুতি। পরিবারভুক্ত, পরনির্ভরশীল এবং উচ্চাকাঙ্ক্ষী একটি তরুণের পক্ষে সেই তীব্র মানসিক দ্বন্দ্বের প্রচণ্ডতা উপেক্ষা করে কোন নিশ্চিত সিদ্ধান্তে পৌঁছনো যে কতখানি কঠিন, বিঘ্ন-সঙ্কুল ও প্রায়-অসম্ভাব্য, সে কথা অনেকদিন কেটে যাবার পর হয়তো সম্যক অনুধাবন করা খুব সহজ নয়।

কিন্তু বিধাতাপুরুষ সহজ ও সুন্দর করে কয়েকটি কথা এঁকে দিয়েছিলেন সেই প্রথম দিনই এই ব্যক্তিটির ললাট-পত্রিকায়। নানা সভা আর সমিতির দোরে দোরে ঘুরে আর ওদের দেশের নানা অজানা কথা জানবার চেষ্টায় অনেক সময় দিয়েও সুভাষ শুধু পাশই করলেন না, ইংরেজের দেশে তাদেরই ভাষায় হলেন প্রথম।

সঙ্গে সঙ্গে নেতা বললেন: "পড়া, পরীক্ষা আর পাশ করবার ডামাডোলে এই একটি কথাই শুধু আমাকে তৃপ্তি দিয়েছিলো। তোদের শিল, তোদের নোড়া, তোদেরই ভাঙি দাঁতের গোড়া। ইংরেজ হয়েও ইংরেজীতে ওরা আমার কাছে হেরে গেলো।"

সুভাষচন্দ্র গোটা পরীক্ষায় হয়েছিলেন চতুর্থ।

পরবর্তীকালে তাঁর অন্তরঙ্গ কতিপয় বন্ধু অনেক মাথা ঘামিয়ে বলতে চেয়েছেন যে, সুভাষচন্দ্র আদৌ ইংরেজ বিদ্বেষী ছিলেন না। তাঁরা সুভাষচন্দ্রকে ভালোবাসেন, স্নেহও নিশ্চয়ই যথেষ্ট করেন, তাই সুভাষচন্দ্রকে বড়-কিছু বানিয়ে আত্মতৃপ্তি লাভ করতে চেষ্টা করেছেন। তাঁর শত্রুরা আর বিরোধীরা তাঁর চরিত্রের অলীক অপকর্ষ ও অপদার্থতা প্রমাণ করতে মিথ্যার আশ্রয় নিয়েছে নির্দ্বিধায়, এই বন্ধুরাও তিনি যা নন বা ছিলেন না, তাঁর সম্বন্ধে তাই বলতে গিয়ে তাঁর ওপর অবিচারই করেছেন। সুভাষচন্দ্র দেবতা ছিলেন না, অতিমানবও ছিলেন না,—একান্তই ছিলেন এই নোংরা মাটির

পৃথিবীর খুব চেনা আর পরিচিত মানুষ। অমানুষ হবার তাঁর উপায় ছিল না।

তাঁর হিংসা ছিল, ঘৃণা ছিল, মানবিক প্রতিশোধ-কামনা ছিল, ছিল প্রতিহিংসার উদ্দীপনা।

সুভাষচন্দ্র ইংরেজকে ঘৃণা করতেন।

দেড়শো বছরের ইংরেজ-কৃতঘ্নতা তিনি ভুলতে পারেননি।

এবং এর প্রতিশোধ-কামনা তাঁর জীবনকে অতিষ্ঠ করে তুলেছিল।

কিন্তু এ-সত্ত্বেও মিসেস ধরমবীরকে তিনি ভালোও বেসেছিলেন।

মিসেস ছিলেন ইংরেজ দুহিতা।

ইংরেজকে ভুলে, ইংলণ্ডকে ভুলে ধরমবীর-পত্নী যেদিন অনন্যা হয়ে নিজের জীবনে স্বীকার করে নিলেন ভারতবর্ষকে, ভারতীয়কে,—তিনি আর ইংরেজ থাকলেন না। যেমন ছিলেন না নিবেদিতা। আর তাই, তাঁর নাম গেল পালটে, রূপ ফুটে উঠল নতুন করে, সম্পর্ক গড়ে উঠতে আটকাল না কোথাও। এর ফলে 'জেন' হলেন জানকী, আর জানকী হলেন সুভাষের দিদি। এই দিদির কাছেই সুভাষ গিয়েছিলেন ১৯৩৭এ। ডালহৌসীতে। হৃত স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার করতে।

"পাশ করবার পর কিন্তু খুব বেশি দ্বিধা বা সংশয় আমাকে পীড়া দেয়নি। মনের সঙ্গে বোঝাবুঝি অনেক আগেই হয়ে গিয়েছিলো। অনেকটা নিশ্চিন্ত হয়েই ট্রাইপসটার ফল ভালো করতে উঠে-পড়ে লাগলাম।"

পিতা, মাতা, ভাই, বন্ধু, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান ভুলেই একদিন এই ব্যক্তিটি সন্ন্যাস নিতে ব্যগ্র হয়ে উঠেছিলেন। সংসার ত্যাগ করেছিলেন এক বস্ত্রে। পরামর্শ করে নয়, অন্যের প্রভাবে নয়। স্বেচ্ছায়। এই মুহূর্তে সেই ব্যক্তিটি জীবনের একটি বিশেষ ও দুর্নিবার আকর্ষণের সম্মুখে দাঁড়িয়ে একান্ত নিস্পৃহতা আর সঙ্কল্পের নিঃসংশয় আহ্বানকে শুধু সমাদরে বরণ করেই নিলেন না, পরন্তু

অজানা ভবিষ্যতের আরও কঠোর, আরও কৃচ্ছ্র, আরও দুর্গম পথের পথিক হবার সিদ্ধান্তও অবলীলায় অঙ্গীকার করে নিলেন।

সুভাষ-জীবনের এই চরম আকস্মিকতা এক পরম বিস্ময়।

এই আকস্মিকতা জীবনে তাঁর এসেছে বারবার। নানা ভাবে। নানা রূপে। মানুষ দেখেছে, ভেবেছে, বিশেষ সিদ্ধান্তে পৌঁছোতেও চেয়েছে, কিন্তু পরক্ষণেই নবতম আকস্মিকতায় সে বিহ্বলও হয়েছে বার বারই।

১৯২১ এর ২২শে এপ্রিল সুভাষচন্দ্র পদত্যাগ পত্র পাঠিয়ে দিলেন ইণ্ডিয়া অফিসে।

কিন্তু ডোরা ? ডোরথী ?

ফুলের মত সুন্দর ছিল এই ডোরা। আর অনাঘ্রাতও।

কেম্‌ব্রীজে দেখা। সেইখানেই গড়ে ওঠে অন্তরঙ্গতা।

ডোরা সুন্দরী। ডোরা তন্বী। ডোরা বুদ্ধি আর বিদ্যের প্রখরতায় উজ্জ্বলা।

গল্পে-শোনা ভারতবর্ষের সুভাষকে দেখে ডোরা। দেখে অনেক দিন থেকে। অনেকক্ষণ ধরে।

পরীক্ষার পর সুভাষ চলে যান এসেক্‌স্ লী-অন-সীতে।

পরিশ্রান্ত মনে জাগে মেদুর স্বপ্ন।

দেহ বিশ্রাম চায়। মনও।

সুভাষ বসে থাকেন একা। অসংখ্য যাত্রীর মাঝখানে সঙ্গীহীন সুভাষ। একা।

সহসা সম্মুখে এসে দাঁড়ায় ডোরা।

অস্ফুট মেঘে-ঢাকা চাঁদের আলোয় সুভাষ দেখেন ডোরাকে।

ডোরা পাশে এসে বসে।

মুখে কারও কথা নেই। নির্বাক সান্নিধ্যে বসে থাকেন দুজন।

ডোরা ঘন হয়। পাশে সরে আসে। হাত রাখে সুভাষের গায়ে।

নিস্তরঙ্গ সুভাষ।

"একটি চুমো শুধু। আর কিছু চাই নে। দেবে না?"

চমকে ওঠেন সুভাষ। ক্ষণেকের তরে। নিজেকে সামলে নেন।

পরক্ষণেই সস্নেহে ডোরার মাথায় হাত রেখে বলে ওঠেনঃ "নিশ্চয়ই দেবো। তুমি যে আমার ছোট বোন।"

কাঠ হয়ে যায় ডোরা। ছুটে পালায় জনারণ্যে।

ডোরা হারিয়ে গেল।

আচম্বিতে আমার বুক থেকে একটা দীর্ঘ আর উষ্ণ নিঃশ্বাস বের হয়ে এসেছিল। উনি লক্ষ্য করেছেন। সপ্রশ্ন দৃষ্টি তুলে তাকাতেই আমার মুখ থেকে বেরিয়ে গেলঃ "ডোরাকে আর খোঁজেননি?"

"না।"

... ...

সুভাষ বিলেত ছেড়ে ভারতের বুকে ফিরে এলেন জুলাই মাসে। ১৯২১।

দুখানি ব্যগ্র-ব্যাকুল বাহু উন্মুখ হয়ে অপেক্ষা করছিল সুভাষের জন্য। সুভাষ ধরা দিলেন!

সে দুখানি বাহু ছিল দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের।

ডানকার্কে ইংরেজ জিতেছে কি হেরেছে, এটা একটা সত্যি বড় প্রশ্ন। প্রায় তিন লক্ষ পঞ্চাশ হাজার ইংরেজ ও ফরাসী সৈন্য ইংলণ্ডে পৌঁছে গেছে। এর মধ্যে মাত্র পঞ্চাশ হাজার বাইরের, বাকি সব ইংরেজ। এরা ছিল ইংরেজের সেরা সৈন্য।

ডানকার্ক থেকে এই বিপুল সৈন্য সরিয়ে আনতে ইংরেজ তার জাতীয় চরিত্রের শুধু বৈশিষ্ট্যই দেখায়নি,—পরন্তু একটা জাতি নিশ্চিত পরাজয় ও আসন্ন মৃত্যুর মুখে দাঁড়িয়ে কেমন করে বাঁচবার চেষ্টায় মরিয়া হয়ে সর্বস্ব পণ করতে পারে, তারও জাজ্বল্যমান স্বাক্ষর ইতিহাসের পাতায় রেখে গেল। সেদিন কোন জলযান, এমন কি

একখানা জেলেডিঙিও ইংলণ্ডের উপকূলে বসে ছিল না। সব এসে দাঁড়িয়েছিল ইংলিশ চ্যানেলের বুকে।

কিন্তু হিটলার এই বিপুল শত্রু-সৈন্য ইংলণ্ডে ফিরে যেতে দিলেন কেন, এ-প্রশ্নের মীমাংসা আজও হয়নি। কোনদিন হয়তো হবেও না। শত্রুপক্ষের সব চাইতে দক্ষ আর দুর্ধর্ষ বিপুল বাহিনী হিটলার হাতের মুঠোয় পেয়েছিলেন। যে রণকৌশল দেখিয়ে ও নবতম ভয়াবহতা সৃষ্টি করে হিটলার পোল্যাণ্ড, নরওয়ে, ডেনমার্ক, চেকোশ্লোভাকিয়া হল্যাণ্ড এবং বেলজিয়াম পায়ে দলে এগিয়ে এসেছিলেন, তার সম্মুখে প্রায়-অপ্রস্তুত এবং পর্যুদস্ত এই বাহিনী হয়তো নিমেষে উবে যেত। কিন্তু তা হল না। কেন হল না? হিটলার কি চালে ভুল করলেন?

বস্তুত সেদিন বোঝা না গেলেও আজ মনে হয় ডানকার্কে হিটলারের এই অপারগতাই বিশ্বযুদ্ধের মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছিল। ইংরেজের এই তিন লক্ষ সেরা সৈন্য হিটলার সেদিন ধ্বংস করতে পারলে কী হত হয়তো বলা কঠিন, কিন্তু ইংরেজের যে নাভিশ্বাস উঠতই, তাতে সন্দেহ নেই।

কেউ কেউ বলতে চায় যে, প্রথম থেকেই হিটলারের ইংরেজের প্রতি একটু সদয় নজর ছিল। ('মেইন ক্যাম্প' পড়বার ফলে হয়তো।) ডানকার্কের রণক্ষেত্রে হিটলার সেই সদিচ্ছার প্রমাণ দিয়ে ইংরেজের হৃদয় জয় করতে চেয়েছিলেন।

কিন্তু সবাই এ-কথা মানে না। অনেকে বলে যে, পোল্যাণ্ড থেকে ডানকার্ক পর্যন্ত জার্মেনীর স্থলসৈন্য কৃতিত্ব দেখিয়েছে সব চাইতে বেশি, আকস্মিক আক্রমণের তীব্রতায় গতিবেগে এবং বিজয়ের আচমকা সাফল্যে হৃৎকম্প জাগিয়ে দিয়েছে বিশ্বের বুকে। বিমানবহর যথেষ্ট সাহায্য করেছে নিশ্চয়ই, কিন্তু প্রাধান্য পায়নি। হিটলারের প্রিয় এবং বিশ্বস্ত সহকর্মী গোয়েরিং তাঁর বিরাট বিমান-বহর নিয়ে এইবার ঝাঁপিয়ে পড়তে চেয়েছিলেন ইংলিশ চ্যানেলের বুকে। এবং ইংরেজের সলিল সমাধি এই স্থানেই রচনা করে তিনি

ইতিহাসে অক্ষয় কৃতিত্ব রেখে যাবেন, এ-কল্পনাও নাকি তাঁর ছিল। তাঁর মনোবাসনা পূর্ণ করতেই নাকি হিটলারের আদেশে স্থলসৈন্য থমকে দাঁড়িয়েছিল।

কিন্তু ইংরেজ রণবিদ্‌রা এ-ব্যাখ্যা স্বীকার করে না ; না প্রথমটা, না পরেরটা। তারা বলে যে, জয়ের নেশায় মাতাল হিটলার তাঁর রণনিপুণ সেনাপতিদের কথা অগ্রাহ্য করে প্রাধান্য দিতে শুরু করেছিলেন নিজের মত এবং নিজস্ব পার্শ্বচরদের। তাদেরি একজন ছিলেন এই গোয়েরিং। হিটলারের রণনায়কদের মনান্তর দানা বাঁধতে শুরু করে এই ডানকার্ক উপলক্ষ্য করেই। (জেনারেল ও লর্ড ইস্‌মের মেমোয়ার্স দ্রষ্টব্য।)[১]

সংগ্রামের ভেতর দিয়েই নাকি জাতির শ্রেষ্ঠ গুণ আর রূপ ফুটে ওঠে। সবাইএর ওঠে কিনা বলা কঠিন তবে ইংরেজের সেদিন উঠেছিল। ডানকার্কের পরাজয়ের ভেতর থেকে এই ডানকার্কেই ইংরেজ ভবিষ্যৎ-বিজয়ের সম্ভাবনা দেখতে পেয়েছিল। আর সেই অসম্ভব ও অবিশ্বাস্য স্বপ্ন তাকে দেখিয়ে ছিলেন চার্চিল। তার নেতা চার্চিল। তার প্রধান মন্ত্রী চার্চিল।

আরও একটি লোক সেদিন পলায়নপর ফরাসী সৈন্যের সঙ্গে ইংলণ্ডে স্থান পেয়েছিলেন। নিতান্তই অজ্ঞাত আর অখ্যাত। সামান্য একজন ব্রিগাডিয়ার জেনারেল,—দ্যগল।[২]

সকাল বেলা। রাত্রে এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে। প্রসন্ন মিষ্টি রোদ উঠেছে ঝলমল করে। গাছের বৃষ্টি ধোয়া পাতা ঝিলমিল করছে। চা খেতে খেতে নেতা দ্যগলের কথা বলে চলেছেন।

চিরপ্রিয় জন্মভূমির কোল থেকে ভাগ্য বিপর্যয়ে উৎক্ষিপ্ত হয়ে

১ জেনারেল ইস্‌মেকে চার্চিল চিফ্‌স অব স্টাফ্‌ কমিটির সভ্য এবং তাঁর নিজস্ব স্টাফ্‌ অফিসার নিযুক্ত করেছিলেন।

২ প্রথমে দ্যগল শুধু একটি ট্যাঙ্ক রেজিমেণ্টের অধিনায়ক ছিলেন। পরে ফ্রান্সের প্রধান মন্ত্রী তাঁকে ন্যাশন্যাল ডিফেন্সের আণ্ডার সেক্রেটারী নিযুক্ত করেন।

ছিটকে পড়েছিলেন দ্যগল ইংলণ্ডের কোলে। চারপাশে তাঁরই মতো অসহায় সর্বস্বান্ত পরাজিত ফরাসী সৈন্য। নোংরা আর ছিন্ন বস্ত্র পরিধানে। দেহ শক্তিহীন। মন ভাঙা। দুদিন আগেও এরা ছিল স্বাধীন দেশের সৈনিক। দেশরক্ষী। ভাগ্যের বিবর্তনে তারা ভিখিরী হয়ে উঠেছে। ইংলণ্ডের দাক্ষিণ্যে তাদের বাঁচতে হবে। দেশ ছিল। ছিল জাতিও। কোথায় হারিয়ে গেল ? এই আশাহীন ভাষাহীন সহযাত্রীদের মধ্যে গিয়ে দাঁড়ান দ্যগল। কানে ওদের ভরসার কথা শোনান। ভবিষ্যতের স্বপ্ন ফুটিয়ে তোলেন নিদ্‌হীন চোখের পাতায়।

১০ই জুন ইটালীর মুসোলিনী জার্মেনীর মিত্ররূপে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। ১৭ই জুন প্যারিসের পতন। সব শেষ হয়ে গেল। অতি দীর্ঘ দিনের একটা পরম গৌরবের আলো দমকা ফুৎকারে নিভে গেল। মার্শাল পেতাঁ ভিসিতে নতুন সরকার গঠন করলেন ১৭ই জুন (১৯৪০)। হিটলারের অনুগ্রহভাজন পেতাঁ।

কিন্তু আলো একেবারে চিরদিনের মতো নিভতে দিলেন না এই দ্যগল। ইংলণ্ডে বসে নিরাশ আঁধারের বুকে ছোট্ট একটি পিদিম জ্বালিয়ে দিলেন। জৌলুস নেই। নেই জমকাল রোশনাই। তবু আলো। স্বাধীন ফরাসী সরকার গঠিত হল ইংলণ্ডে। সঙ্গী হল তারাই, যারা তাঁর সঙ্গে পালিয়ে এসেছিলেন। দ্যগলের রেডিও বিশ্ববাসীকে শুনিয়ে দিল: "ভবিষ্যতে যাই ঘটুক, ফরাসী জাতির প্রতি-আক্রমণের অগ্নিশিখা থাকবে অনির্বাণ। তা নিভবে না। নিভতে পারে না।"

জেনারেল ইস্‌মে সেদিনের দ্যগল সম্পর্কে লিখছেন: "তাঁর ব্যক্তিত্ব বা প্রতিভা দিয়ে দ্যগল কোন বৃহৎ আন্দোলন পরিচালিত করতে কিম্বা তাঁর দেশের হয়ে কোন শক্তিশালী প্রতিরোধ-সংস্থা গড়ে তুলতে পারবেন বলে তাঁকে দেখে কিন্তু আমার মনে হয়নি।" রেডিও শুনে এই ইস্‌মেই বলে উঠেছিলেন: "এর চাইতে গর্ব ও গৌরবের স্পষ্টতর ছবি চার্চিলও আঁকতে পারতেন না।"

সেই দ্যগল। সঙ্গে ছিল না নাম করা সঙ্গী। ছিল না অর্থ। একা। প্রথিতযশা ইতিহাস-বিখ্যাত রেনঁ, পেতাঁ, ওয়েগাঁ,—সবাই হারিয়ে গেল। তলিয়ে গেল। অবনত মস্তকে হিটলারের দেয়া শৃঙ্খল গলায় পরে জাতির শৃঙ্খলা রক্ষার কাজে ওঁরা ব্যগ্র হয়ে উঠলেন। শান্তির পথে দেশ ও জাতিকে পরিচালিত করতে মাটি আঁকড়ে পড়ে থাকলেন শবের মতো। এগিয়ে চললেন শুধু বেহিসেবী দ্যগল।

বলে উঠলেন নেতা: "এই দ্যগল চাই আমাদেরও। আজই। যে কোন স্বাধীন দেশে গিয়ে সে গড়ে তুলবে স্বাধীন ভারত সরকার। আর তা শুনিয়ে দেবে বিশ্বের সবাইকে।"

ভিরমি-খাওয়া ইংরেজের কানে বাজের আওয়াজ বেজে উঠেছিল সেদিন চার্চিলের কণ্ঠে: "যত দুর্মূল্য হোক, তাই দিয়ে আমরা আমাদের দ্বীপ রক্ষা করবো। আমরা লড়াই করবো মাঠে, অলিতে-গলিতে, পাহাড়ে-কন্দরে। আত্মসমর্পণ আমরা করবো না।"

ইংলণ্ড-এর সেদিন চার্চিল ছিলেন। দ্যগল ছিলেন ফ্রান্স-এর। আমাদের? কারাগারের এক অপরিসর অন্ধকার প্রকোষ্ঠে বসেও শুধু একটি মানুষের মনে জেগেছিল সেই একই বজ্রগর্ভ বাণী: "সর্বস্ব দেবো কিন্তু আত্মসমর্পণ করবো না।"

৪

শরৎ এসে গেছে। মিষ্টি সোনামাখা রোদ ছড়িয়ে দেয় মুঠো মুঠো স্বর্ণরেণু। মাঝে মাঝে দু-এক পশলা জলও হয়। শাদা মেঘের ভেলা ওড়ে নীল আকাশের বুকে।

দেখা করতে আসে ইলাই বেশি। সঙ্গে করে আনে একটা করে ফুলের ঝুড়ি। রজনীগন্ধার। ময়লা কাপড়-জামা নিয়ে যায়। ধোয়া আর কোঁচানো কাপড-জামা দিয়ে যায়।

সকাল বেলাই সহসা আমাদের রুদ্ধ মনের দোর খুলে গেল। কী যেন একটা অজানা হালকা আনন্দের রেশ গায়ে আর মনে হাত বুলিয়ে দিল। খুলে গেল মনের কপাট।

জীবনের যত-সব গোপন কাহিনী বেরিয়ে এল স্বচ্ছন্দ হয়ে। কোন দ্বিধা নেই। নেই কোন সঙ্কোচ। ওঁর বলবার পিঠে পিঠে আমি। আমারটা শেষ না হতেই উনি।

জিজ্ঞেস করে বসলাম বম্বের সেই মেয়েটির কথা। সেই হাতে ভ্যানিটি ব্যাগ, পায়ে নাগরা, খোলা মাথা, মাথায় এলো-খোঁপা মেয়েটি। (প্রথম খণ্ড, ৬৬ পৃ.)

একটু হেসে বললেন : "খুব সম্ভব মেয়েটির মাথায় একটু ছিট ছিলো। বম্বে পা দিতে না-দিতে ও টের পেয়ে যেতো। আসতো প্রতিদিন। গৃহের এক কোণে বসে থাকতো। কখনো-বা পথের ধারে। কিন্তু থাকতো একেবারে মুখটি বুজে। একটা কথাও বলতো না। কলকাতায় ফিরলেই সপ্তাহে সপ্তাহে আসতো ওর চিঠি। চিঠির গোড়ায় লিখতো, my dear husband (প্রিয় স্বামী আমার)।"

খুব অস্বস্তিকর একটা সমস্যার সমাধান হয়ে গেল নিমেষে।

আমার বন্দী হবার কিছুদিন পূর্বের কথা। স্পেশাল ব্রাঞ্চের নামজাদা অফিসার গিরিজাভূষণ রায় হঠাৎ আমার বাড়ি এসে হাজির। গিরিজা রায় ছিলেন আমার গ্রামবাসী। গ্রাম-সম্পর্কে দেখা হলে দাদা বলতাম। কিন্তু ওঁর সাক্ষাৎ কামনা করা আর মূর্তিমান ফ্যাসাদ ডেকে আনা ছিল একই।

সেটা উনিও জানতেন বিলক্ষণ। পারতপক্ষে আসতেন না আমার বাড়ি। কিন্তু সেদিন এসে বেশ জাঁকিয়ে বসলেন একখানা চেয়ার টেনে।

একথা ওকথা দু-চারটে বলেই হঠাৎ বলে বসলেন : "তোমাদের ব্রহ্মচারী নেতাটি তো আজকাল বেশ ডুবে ডুবে জল খাচ্ছেন।"

"মানে ?"

নিশ্চয়ই আমার কোঁচকানো ভ্রূ আর অপ্রসন্ন কণ্ঠ উনি লক্ষ্য করে থাকবেন। বললেন : "আরে চটো কেন ? ওটার খোঁজ করা আমাদের কাজ নয়। তবে চিঠিপত্রগুলো যে আমাদের হাতেই আবার এসে পড়ে কিনা !"

"হারানদা,—(ডাকনাম ছিল হারান)—বাড়ি বয়ে এসেছেন। বেশি কিছু বলতে বাধছে। আপনি চলে যান।"

চেয়ার ছেড়ে উঠতে উঠতে বলে গেলেন : "পারো তো খোঁজটা একটু নিয়ো। বম্বেতে বিয়ে করেছেন। দেবী হামেশাই চিঠি পাঠান পতিদেবতার কাছে। এখানে।"

বিশ্বাস করিনি। তবু অস্বস্তি একটু ছিল বইকি। মনের মেঘ কেটে গেল। চুপ করেই ছিলাম। সহসা দমকা হাসি পেল। আমি হো-হো করে হেসে উঠলাম।

"কী হলো ?"

"একটা কথা মনে পড়লো যে।"

"কোন্ কথা ?"

"সেই দক্ষিণেশ্বরে—"

"আমি জানতাম, ওটাও তুমি জানতে চাইবে। মেয়েটি বেশ শিক্ষিতা। তাছাড়া আমাদের সঙ্গে মতেরও খানিকটা মিল আছে। এই পর্যন্তই। আমার দেহের জন্য উনি একটু চিন্তিতও ছিলেন।"

সেই কালো মেয়ের কাহিনী। নামটাও আমাকে বলেছিলেন। কোন স্কুলের প্রধানা শিক্ষিকা। (প্রথম খণ্ড, ৩৬০ পৃ.)

কথা আর ফুরোয় না। চলেছে অনর্গল। চলল খাবার টেবলে। খাবার পর ঘরে বসে। তারপর চায়ের টেবল। থামল সেই সন্ধ্যেবেলা।

বসু পরিবারের কথা উঠল। উঠল দাদার কথা। মেজদাদা। ভাই অনেকেই থাকে, আর অনেকও। কিন্তু এমন ভাই দুর্লভ।

বোস ব্রাদার্স। সুভাষ বোস আর শরৎ বোস। সোনার যেন এ-পিঠ আর ও-পিঠ।

জানকীনাথের এই মেজ পুত্রটি পিতার ইচ্ছাই প্রথম জীবনে বরণ করে নিয়েছিলেন। মনেপ্রাণে সার্থকনামা আর প্রথিতযশা হয়ে সংসারে বড় হবার আকাঙ্ক্ষা ছিল খুবই। হয়েও ছিলেন। কিন্তু ভাগ্য যে বড় কথা। ভাইএর টানে সবই গেল বানচাল হয়ে। ভাইয়ের গর্বে আর গৌরবে এই মানুষটি গেলেন আমূল পালটে। রামায়ণের সেই ভাই। যে-ভাই এর কথা লিখতে গিয়ে মহাকবি বলেছিলেন যে, কলত্র আর বান্ধব মেলে দেশে দেশে! কিন্তু ভাই? ভাই কি চোখে পড়ে কোথাও?

কিন্তু এ ভাইও পাওয়া যেত না হয়তো যদি না পাওয়া যেত ঐ ভ্রাতৃজায়াটি। মেজ বৌদিদি।

"অনেকদিন ধরে আমার ঝক্কি সব চাইতে বেশি পোয়াতে হয়েছে মেজ বৌদিদির। উনি না থাকলে আমার যে কী দশাই হতো।"

আমি খানিকটা জানতাম। সুভাষ যাবেন বম্বে, যাবার ঘণ্টা-কয়েক আগে দেখা গেল, জামা নেই, ধুতি নেই, জুতো ছেঁড়া আর ট্যাঁক একেবারে গড়ের মাঠ।

পাঠাও দোকানে, ডাক দর্জি, গুছিয়ে দাও বাক্স-পেঁটরা, থলেতে দাও রসদ। হবে তো সবই, কিন্তু একটু সময় থাকতে—' ঐটি হল না কোনদিন আর কোনক্রমেই। সবই সেই শেষ মুহূর্তে।

একদা দক্ষিণেশ্বরের ন্যালাভোলা গদাধরকে মথুরবাবু আর রাসমণি সেবা আর উপচারে রামকৃষ্ণ করে তুলেছিলেন। এদিনও বসু পরিবারের এই দম্পতি প্রাণের ঐকান্তিক আকিঞ্চনে, অফুরন্ত স্নেহ আর মমতায় অবকাশ দিয়েছিলেন সুভাষ বোসকে নেতাজি হতে। সুভাষ-জীবনের প্রযোজক এঁরা।

উঠল পিতার কথা। বললেন: "বাবার বাইরের রূপ আর ভেতরটা ছিলো সম্পূর্ণ পৃথক। ভেতরে ছিলেন তিনি পুরোপুরি

ভারতীয়, আর—" একটু থামলেন, পরক্ষণেই বলে উঠলেন : "আর খুবই সাত্ত্বিক প্রকৃতির।"

আর তাই জান্‌কী সাহেবের জান্‌কীবাবু হতে আটকালো না কাথাও। সরকারী খেতাব ছুড়ে ফেলে দিলেন অবহেলায়। আহারে-বিহারে অশনে-ভূষণে জানকীনাথ শেষ জীবন পর্যন্ত বেছে নিলেন এক সাধকের জীবন। সমগ্র গীতা তাঁর কণ্ঠস্থ ছিল। গীতার অবিনাশী অসক্ত জীবন-দর্শন তাঁর জীবনে ফুটে উঠল দিব্য রূপ নিয়ে।

অনেক রাতে শুতে গিয়েছিলাম কিন্তু কিছুতেই ঘুম এল না। বড্ডই গরম। খানিকটা সময় এপাশ-ওপাশ করে উঠে পড়লাম। দালানে একটাই আলো। কিন্তু ওরই টানে রাজ্যের বাদলা-পোকায় ছেয়ে যায় সারা দেয়াল। পোকার হাত থেকে বাঁচতে দালানের এক প্রান্তে একখানা চেয়ার নিয়ে বসলাম। বসলাম আলোর দিকে একটু পাশ ফিরে। কতক্ষণ বসে ছিলাম, খেয়াল ছিল না। খাবার ঘরের দরজাটা ক্যাঁচ করে উঠল। ঘাড় ফিরিয়ে দেখলাম, নেতা ঘর থেকে বেরিয়ে আসছেন।

গভীর রাত নিশ্চয়ই। নিঝুম হয়ে গেছে পুরীটা। কদাচিৎ দু-একটা শব্দ কানে আসে। নেতা দরজাটা ভেজিয়ে চললেন নিজের ঘরের দিকে। ওঁর পা টলছে। ঠিক মাতালের মতো। টলতে টলতে চলেছেন ঘরের দিকে।

এত রাত অবধি পূজোর ঘরে ছিলেন ? কী করছিছেন ? পূজো ? জপ ? ধ্যান ? হবেও-বা। কিন্তু অমন টলছেন কেন ?

শুনেছিলাম গভীর ধ্যানে নাকি অমন হয়। অনেক সময় চেতনা হারিয়ে যায়। দেহের ওপর বশ থাকে না। থাকে না সাড়। এও কি তাই ?

ভাবনা এল ভিড় করে। এই মানুষ। বিপ্লব আর বিদ্রোহের মূর্ত রূপ। ইংরেজের পরাজয়ে উল্লাস করেন। নিজের চোখে দেখেছি ইংরেজের কেউ সন্ত্রাশবাদীদেও হাতে প্রাণ হারালে খুশিতে

উপচে পড়েন। অহিংসায় বিশ্বাসী নন। সদা সত্য কথাও কি বলেন ? তবে ?

এঁর কোন্‌টা সত্য ? এই পূজো-রূপ, না বিপ্লবী-রূপ ?

দুটোই কি সত্য ? না, দুটোই এক ?

চিত্তে কৃপা সমরনিষ্ঠুরতা। দেবীরও এই রূপ না ?

দেবী···কালী···বিপ্লব···

চেয়ারের ওপরেই ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।

সকাল হল। আমার তর সইছিল না। ওঁর ওঠবার প্রতীক্ষায় ছটফট করতে লাগলাম। একদা সাধু-সন্ন্যাসীর পেছনে আমিও কম ঘুরিনি। জপ-তপও কিছু-কিঞ্চিৎ দেখেছি বই কি। কিন্তু এ রূপ তো দেখিনি। কথা নেই, কোন জাঁক নেই, নেই জাহির করবার বিন্দুমাত্র চেষ্টা। একান্ত সংগোপনে প্রিয়তমকে জীবনের নিশ্চল আসনে বসিয়ে এই যে রতি-সুখ-আস্বাদন, চাওয়া ও পাওয়ার প্রশ্ন দূরে রেখে এই যে নিভৃত সামীপ্য সম্ভোগ,—এতেই কি এনে দেয় চরম প্রাপ্তি ? ওঁরও কি দিয়েছে ?

উঠলেন। চায়ের টেবলেই কথাটা তুললাম। ভাবছিলাম, দার্শনিক সুভাষচন্দ্র নিশ্চয়ই প্রাচ্য আর পাশ্চাত্য-দর্শনের তুলনামূলক একটা ছবি ফুটিয়ে তুলবেন আমার চোখের ওপর। ধার-কাছ দিয়েও গেলেন না। খানিকটা সময় চুপ করে থেকে আস্তে বললেন ঃ" পূজো করা নয়, পূজো হওয়া। নিজেকে হতে হবে পূজো।"

৮

সবই তো জানা কথা। তবু বলতে হয়। বলতে হয় বার বার। বলতে হয় নানা ছন্দে আর সুরে। নইলে ভুলে যাই। নইলে মন ভরে না। আশাও কি মেটে ?

এক নাঙ্গা জীবন সম্বল করে সুভাষ ঝাঁপিয়ে পড়লেন কর্মের সাগরে। বাংলায় সেদিন বান ডেকেছিল। গঙ্গার বান। উত্তাল হয়ে উঠেছিল। আর এই গঙ্গা বহন করে এনেছিলেন চিত্তরঞ্জন।

ভবিষ্যতের স্বপ্ন-ঘেরা মাদকতায় দেশ তখন মাতাল। অনন্য সুভাষ শান্ত অধ্যক্ষের রূপ নিয়ে ঢুকলেন সর্ব বিদ্যায়তনে। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়। গোলামখানা নয়। ইংরেজের দাস আর স্বার্থবহ দেশ-বৈরী সৃষ্টির কারখানা নয়।

অধ্যক্ষ সুভাষ বোস হাঁ করে চেয়ে থাকেন ছাত্রের আশায়। শিক্ষা-কক্ষ শূন্য, কিন্তু অধ্যক্ষের কর্মের বিরাম নেই। কখন কে এসে পড়বে, স্থিরতা কোথায়? অধ্যক্ষ ঘুরে ঘুরে নোংরাকক্ষ পরিচ্ছন্ন করেন। বোর্ড মুছে রাখেন। চক আর ন্যাকড়া রাখেন যথাস্থানে।

নাল্পে সুখং। এই অফুরন্ত অবকাশে সুভাষ হাঁপিয়ে ওঠেন। কাজ চাই। আরও দায়িত্ব চাই। আরও ঝক্কি চাই। পেলেনও। বাংলা-কংগ্রেসের প্রচার-সচিব আর স্বেচ্ছাসেবকদের নায়কের পদ। ক্যাপ্টেন। যুগান্তরের শিঙা বেজে উঠল। ঝাঁকে ঝাঁকে প্রাণ-পক্ষী সমানে ছুটে যেন নিজ নীড়ে। বাংলার নবোদ্ভিন্ন যৌবন কারাগারকে নীড় বানিয়ে নিল।

বৃটিশ সাম্রাজ্যের যুবরাজের এ-দেশে আসবার দিন ধার্য হয়েছিল ১৮ই নবেম্বর, ১৯২১। সমস্ত দেশ জুড়ে ডাকা হল হরতাল। ক্যাপ্টেন সুভাষ তাঁর বাহিনী নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন পথে।

"সহস্র সহস্র ছাপানো নোটিশ বাংলার নানা স্থানে বিতরিত হয়েছিল। তাতে আমার নাম ছিল না, এমন কি, তার পাণ্ডুলিপিও আমিও চোখে দেখিনি।...গ্রামে গ্রামে আর কলকাতায় হরতালের কার্য অতি সুচারু রূপে সম্পন্ন হয়েছিল এবং সেজন্য আমার স্পষ্ট করে স্বীকার করা আবশ্যক হয়েছে যে, সে সুনামের ভাগী আমাদের কংগ্রেস পাবলিসিটি বোর্ড বা প্রকাশ-বিভাগ এবং তার সুযোগ্য সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু মহাশয়।" (তৎকালীন বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসের সম্পাদক পরলোকগত দেশপ্রাণ বীরেন্দ্রনাথ শাসমল প্রণীত 'স্রোতের তৃণ')

যখনি যে-কাজে হাত দিয়েছেন যাদুকরের স্পর্শে সে-কাজ হয়ে

উঠেছে পূর্ণাঙ্গ। অপ্রতিদ্বন্দ্বী ছাত্র-জীবন, লোকোত্তর কর্ম-জীবন, আর মিষ্টি-মধুর ব্যক্তি-জীবন। এমন সর্বাঙ্গসুন্দর আর কে ছিল? ছিল কি কেউ?

অনেকদিন পরের কথা। রেড ফোর্টে চলছিল আজাদ হিন্দ ফৌজের মামলা। আসামী পক্ষীয় জবরদস্ত কৌঁসিলী ভুলাভাই দেশাই পরবর্তীকালে সেই প্রসঙ্গে বলেছিলেন: "মামলার নথি-পত্র আমি পড়ে চলেছি আর সন্ধান পাচ্ছি তাঁর অলৌকিক শক্তির অসামান্যতা। মাঝে মাঝে আমার দম বন্ধ হয়ে আসছিলো। এই অসাধারণ ব্যক্তিটিকে আমরা কতই-না বিদ্রূপ করেছি। আজ বুঝতে পারছি যে, এই শক্তিধর মানুষটি শুধু সারাজীবন স্বপ্নই দেখেননি, পরন্তু তিনি ছিলেন একাধারে আজন্ম নেতা, দেশপ্রেমিক, রণনিপুণ যোদ্ধা, রাজনীতিজ্ঞ এবং মৃত্যুঞ্জয়ী শহিদ। যেদিন স্বাধীনতার ইতিহাস লেখা হবে, সেদিন এ-কথা লিখতেই হবে যে, তিনি ছিলেন নরোত্তম আর অতুলনীয়।

"একক এক নিঃস্ব ব্যক্তি সেই সুদূর বিদেশে গড়ে তুললেন এক স্বাধীন গভর্ণমেণ্ট, আর তার অধীনে একটি সেনাবাহিনী, ব্যাঙ্ক, প্রত্যেকটি বিভাগীয় দপ্তর, মন্ত্রিসভা,—নয় কি? বার বার বিস্ময় আমাকে নাড়া দিয়েছে, অলীক বলে মনে জেগেছে সংশয়; পরক্ষণেই প্রমাণ দেখে বিস্ময় আমার বেড়েই গেছে।" (অমৃতবাজার পত্রিকা, ২৩শে জানুয়ারি, ১৯৬১)

হ্যাঁ, এই লোকটিই ছিলেন সুভাষ বোস। নেতাজি সুভাষ।

চা খেতে খেতে বলছিলেন প্রথমবারের জেল-কাহিনী। দেশবন্ধু সেদিন বাংলার কারাগারে। আর সুভাষ ছিলেন তাঁর প্রধান সেবায়েৎ। সুভাষের হাতের লুচি খেয়ে তিনিও অবাক হয়েছিলেন। মাতা বাসন্তীদেবীকে বলেছিলেন: লুচি খেয়ে মনে হলো সুভাষ বুঝি জন্ম জন্ম লুচিই ভেজে আসছে। আর কিছু করেনি।"

তখনকার বঙ্গীয় সরকারে কার্যকরী সভার মেম্বর স্যর আবদুর

রহিম গিয়েছিলেন দেশবন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে। কথা প্রসঙ্গে তিনি বলেছিলেন: "সি, আর! তোমার পেছনে সরকারের খরচা বড্ড বেশি। একজন আই, সি, এসকে রাখতে হয়েছে তোমার পাচক করে।"

নেতার জেল-ঠিকুজিতে কাজের পরিচয়-স্থানে লেখা ছিল পাচক বলে।

বৃহৎ ও মহৎ ব্যক্তির সেবা বা পরিচর্যার পেছনে যে-দীনতাও বিনয় থাকে, তার গর্বও বড় কম নয়। কিন্তু জেলের অন্য সঙ্গীরাও এঁর সেবা থেকে বঞ্চিত হননি।

"সুভাষের সেবার তুলনা হয় না। গ্রেপ্তার হয়ে প্রেসিডেন্সি জেলে এসে শাসমল জ্বরে পড়েন। সুভাষ তাঁকে কি ভাবেই-না শুশ্রূষা করে। আলিপুর সেণ্ট্রাল জেলে আমার বসন্ত হয়। সুভাষ এসে আমার সেবার ভার নিল। বসন্তের ঘাগুলো ধুয়ে দেওয়া, তাতে ওষুধ লাগানো, আমাকে খাইয়ে দেওয়া, বাতাস করা—সে-সেবা জীবনে আর পাবো না। ইঁটের গাঁথা কবরের ন্যায় দেখতে শয্যায় সেই অবস্থায় শুয়ে থাকতে পারতাম না। আমাকে স্বস্তি দেওয়ার জন্যে সুভাষ তার কোলে আমার মাথাটি নিয়ে সারারাত কাটিয়েছে।" (সুভাষের সঙ্গে বারো বছর, হেমন্ত সরকার)

দেশ মাটি নয়, খাল নয়, বিল নয়। দেশ শুধু মানুষও নয়। সব নিয়ে দেশ। দেশের সামগ্রিক রূপ যার কাছে ধরা দিল না, দেয় না, সে কেমন করে আর কেনই-বা সেই দেশের জন্য সর্বস্ব পণ করে বসবে?

এই ভারতবর্ষের ধুলিকণা থেকে মানুষ, এরই এক পূর্ণাঙ্গ রূপ,—অংশ নয়, কাঁট-ছাঁট দিয়ে নয়, হিসেব-নিকেষ করে নয়, তুলাদণ্ডে বিচার করে নয়,—এর ভুলত্রুটি, এর ভালোমন্দ, এর গৌরব আর কলঙ্ক, সব নিয়ে, সব জেনে, একে এই মহানায়ক নিজের জীবনে

পরম ঐশ্বর্যময় ইষ্টের আসনে বসিয়ে নিজেকে দিয়েছিলেন উজাড় করে। প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছিল ইষ্ট। নয়নে শুধু নয়, প্রাণেও।

অঝোর ধারায় ঝরে পড়ছিল বর্ষাশেষের বর্ষণ। রাত্রির ঘোর নেমে এসেছে ঘন হয়ে। ব্যথা-কাতর বিষণ্ণ ধরণীর চোখ বেয়ে ঝরে পড়ছে অশ্রুর ধারা। নিজের ঘরের সামনে একখানা চেয়ারে নেতা বসেছিলেন। বসেছিলেন মাথাটা চেয়ারে হেলিয়ে। আর একপ্রান্তে আমি।

সহসা গেয়ে উঠলেন গান। ওঁর নিজের কণ্ঠে এর আগে আমি কখনও গান শুনিনি। অবাকই হলাম। কান পেতে রইলাম। গাইছিলেন ঃ জাগরণে যায় বিভাবরী।

কণ্ঠের গান নয়, প্রাণের গান।

যৌবন প্রায় অতিক্রম করে সহসা এই মেঘ-মেদুর বর্ষারাতে প্রাণে জাগল কোন্-সে নাম-না-জানা দয়িতার চরণ-ধ্বনি, যার ফলে নয়ন থেকে নিদ্রা গেল টুটে? অশান্ত নিদ্রাহীন রাত্রি কাটে সীমাহীন নিঃসঙ্গতায়? কে সে? কেউ কি ছিল? কোনদিন?

আকুলি-বিকুলি সুর কেঁদে ওঠে বার বার। আঁখি হতে ঘুম নিল কাড়ি, মরি মরি—

রক্তাক্ত হৃদপিণ্ড চুয়ে পড়ছে। চুয়ে পড়ছে ধারায় ধারায়।

থেমে গেল গান। কাছে গিয়ে দেখি ঘুমিয়ে পড়েছেন। মুখে ফুটে উঠেছে এক দিব্য শ্রী। শান্ত। সমাহিত।

বুঝলাম, এই সর্বনাশী প্রিয়া আর কেউ নয়। এ তাঁর দেশ। তাঁর মাতৃভুমি।

"সর্বনাশা প্রেম তার, নিত্য তাই তুমি ঘরছাড়া।"

মহাত্মা গান্ধীর সেদিন সত্য সত্যই আর কোন গত্যন্তর ছিল না। দ্বিমুখী আক্রমণে অনন্যোপায় হয়ে ব্যক্তিক আইন-অমান্যের ন্যায় একটি নিষ্ফল আন্দোলন গড়ে তুলতে তাই তিনি ব্রতী হয়েছিলেন।

নিষ্ক্রিয় কংগ্রেস বেশিদিন এই অবস্থায় থাকলে-যে এই বৃহৎ জাতীয় সংস্থা ভেঙে চুরমার হয়ে যেতে সময় লাগবে না, এই আশঙ্কাই তাঁকে সব চাইতে বেশি ব্যাকুল করে তুলেছিল।

অন্যদিকে নিজের দলের আভ্যন্তরিক দুর্বলতা তাঁকে কম শঙ্কিত করেনি। দলের অধিকাংশ তখন পর্যন্ত তাঁর দিকেই, এ আশ্বাসও তিনি যথেষ্ট মনে করেননি। নেহরু, আজাদ, রাজাজির বিপরীত বুদ্ধি-প্রাখর্য তাঁকে সতর্ক করেছে, সাবধানী করেছে কিন্তু নিশ্চিন্ত করতে পারেনি।

দুদিন পূর্বেও গান্ধী বার বার বলেছেন যে, ইংরেজের এই নিদারুণ দুঃসময়ে কোনপ্রকার আন্দোলন সৃষ্টি করে তাকে ব্যতিব্যস্ত করতে তিনি চান না। এই মর্মে তিনি বিবৃতি দিয়েছেন। ইংরেজ রাজপ্রতিনিধি, এদেশের বড়লাটকে আশ্বাস দিয়েছেন। কিন্তু এই আশ্বাস রক্ষা করতে গেলে কংগ্রেসের নাভিশ্বাস যে অপরিহার্য, তা বুঝেই তাঁকে ভিন্ন পথ বেছে নিতে হয়েছে।

হয়তো ব্যক্তি-সত্যাগ্রহ যথেষ্ট মারাত্মক নয়, কিন্তু দুর্বল ও সাত্ত্বিক এই আন্দোলন প্রতিরোধ করতে গিয়ে ইংরেজকে কম করেও ২০।২৫ হাজার কংগ্রেস কর্মীকে বন্দী করতে হয়েছে। এবং গান্ধীর এই অহিংস কর্ম-তৎপরতায় ইংরেজের প্রাণে অকস্মাৎ পুলকের বাণ ডেকেছিল, এর প্রমাণই বা কোথায়? একটুও কি ইংরেজ ব্যতিব্যস্ত হয়নি সেদিন? যুদ্ধের ফলে ইংরেজের ঘণ্টায় ঘণ্টায় যখন-তখন অবস্থা,—গান্ধীর এই সাত্ত্বিক সত্যাগ্রহ ইংরেজ কি খুব প্রসন্ন মনে গ্রহণ করতে পেরেছিল?

একনম্বর সত্যাগ্রহী হবার সাধ প্রবল হয়ে উঠেছিল জহরলালের মনে। গান্ধী-বিরোধী চাল যেদিন বানচাল হয়ে গেল,—সঙ্গে সঙ্গে সেইদিন আর সেই ক্ষণেই জহরলালও পাল্টে গেলেন। অহিংসা আর সত্যাগ্রহের ওপর অত্যন্ত অকস্মাৎ ভক্তি তাঁর প্রচণ্ড হয়ে উঠল।

গান্ধী জহরলালের দু নম্বর আবেদনে রাজী হয়েছিলেন। কিন্তু

ইংরেজ বাদ সেধে বসল। সত্যাগ্রহ করবার পূর্বেই এলাহাবাদের এক বক্তৃতার জন্য তাঁকে বন্দী করা হল।

কোথায় পড়ে থাকল জহরলালের সেই অতি-প্রখর নীতিজ্ঞান? বিপন্ন শত্রুকে আক্রমণ করতে নেই, ডেমোক্রাসীর বাহন ইংরেজের বিরোধিতা ফ্যাসিজিম্‌কে সমর্থনেরই নামান্তরমাত্র, এই সব উচ্চাঙ্গের থিওরী কিসের লোভে আর কোন্ প্রয়োজনে হঠাৎ জহরলাল বিস্মৃত হলেন?

ক্ষুদ্র হোক, আংশিক হোক, ভয়ানক সাত্ত্বিক হোক, তবুও তো সত্যাগ্রহ। ব্যক্তি-স্বাধীনতা, নাগরিক অধিকার, অথবা আর-কিছু নিরামিষ নামই না হয় দেয়া গেল, প্রতিক্রিয়ায় ইংরেজ কি একটুও বিব্রত হয়নি? ডেমোক্রাসির গায়ে কি বিন্দু পরিমাণ আঁচড়ও লাগেনি?

১৯২২এর দেশবন্ধু পরিকল্পিত কাউন্সিল-প্রোগ্রাম হৃদয়ঙ্গম করতে গান্ধী-গোষ্ঠীর লেগেছিল দীর্ঘ পনের বৎসর। আর বিনা সংগ্রামে ইংরেজ তার স্বাধিকার থেকে তিলমাত্র বিচ্যুত হবে না এবং তার এই বিপদসঙ্কুল বর্তমান পরিস্থিতি সেই সংগ্রাম শুরু করবার প্রকৃষ্ট সময়, সুভাষচন্দ্রের এই অত্যন্ত সহজ ও বস্তুতান্ত্রিক কথাটা ওঁদের বোঝাতে এবং ওঁদের বুঝতে লাগল চোদ্দটা মাস। (নেতার চরমপত্র, জলপাইগুড়ি প্রস্তাব প্রভৃতি প্রথম খণ্ডে দ্রষ্টব্য)

না হাওয়ার চাইতে দেরি হওয়া ভালো। নাই মামার চাইতে কানা মামা শ্লাঘ্য। মহাজন পদাবলী। দেরি করেও সেদিন গান্ধী সুভাষচন্দ্রের সংগ্রামী-পথকেই শ্রেষ্ঠ বলে অন্তত অংশত অঙ্গীকার করে নিতে কুণ্ঠিত হননি, এই খানেই তাঁর মাহাত্ম্য।

আর একটা কথাও সম্ভবত এর মধ্যে ছিল। গান্ধীর সন্ধানী প্রজ্ঞা সেদিন নিশ্চয়ই অনেকখানি সজাগ হয়ে উঠেছে। ইংরেজের কথা, ওদের টীকা-টিপ্পনী তিনি শুধু দেখেই যান না, তার পেছন থেকে যে-অভীপ্সা উঁকি দিতে চায়, তাকে উনি ধরেও ফেলেন। ইংরেজের

অপঘাত মৃত্যুর এই বিভীষিকা কেটে গেলে আবার-যে সে স্বমূর্তি ধারণ করতে তিলমাত্র বিলম্ব করবে না, তারও অজস্র উদাহরণ উনি চোখে দেখেছেন।

জহরলালের দণ্ডাদেশের কথা নিয়ে হাউস অব কমন্‌স-এ প্রশ্নোত্তর কালে অ্যামের্রি বেশ বাঁকা হাসি হেসে বলেছিলেন: "আইনের চক্ষে অপরাধ করে একজন ব্যক্তির যদি দণ্ড হয়েই থাকে, তাতে করে একথা বোঝায় না যে, শাসনতান্ত্রিক সমস্যার আমূল পরিবর্তন ঘটে গেল।"

কয়েকদিন বাদেই এই ব্যক্তিটি আবার বলেছিলেন: "পণ্ডিত নেহরু যদি মনে করে থাকেন যে, তাঁর সাজা একটু কঠোর হয়েছে, আপিল তিনি তো করতে পারেন। তাই করুন না।"

বিভিন্ন প্রদেশের ভূতপূর্ব মন্ত্রীরা সেদিন অনেকেই কারাবরণ করেছিলেন। তাঁদের সম্পর্কে এই ঝানু টোরীটি বলেছিলেন: "এই অবকাশে এঁরা গঠনমূলক ভালো ভালো পরিকল্পনা করবার পর্যাপ্ত অবকাশ পাবেন। যুদ্ধোত্তর কালে খুব তাড়াতাড়ি সেগুলি কার্যে পরিণত করতে আর অযথা সময় নষ্ট হবে না।"

এই ইংরেজকে গান্ধী জয় করতে চেয়েছিলেন প্রেম দিয়ে। এই ইংরেজকে জহরলাল ডেমোক্রাসির বাহন বলেছেন পঞ্চমুখে। আর এই ইংরেজকে হিটলারের গুঁতো থেকে পরিত্রাণ দিতে আত্মহত্যার ক্লীবত্বকে সাড়ম্বরে বীরত্ব ও ভারতীয় কৃষ্টির আদি ও অকৃত্রিম উদাহরণ বলে প্রচার করতে ওঁরা কুণ্ঠোবোধ করেননি বিন্দুমাত্র।

যুদ্ধের প্রারম্ভিক অবস্থায় বক্তৃতার স্বাধীনতা হরণ করা হয়েছিল কিন্তু সত্যাগ্রহ শুরু করতে-না-করতে অক্টোবর মাসে নতুন এক অর্ডিন্যান্স জারী করে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা লোপ করা হল। গান্ধী তাঁর পত্রিকা প্রকাশ করা বন্ধ করে দিলেন।

গান্ধী চাইলে কী হবে, ইংরেজ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ যে গান্ধীকে সে সংগ্রামী করে তুলবেই।

তুললও তাই। কিন্তু ইংরেজের সে অভিলাষ পূর্ণ হতে লাগল আরও ছুটি বৎসর। ১৯৪২।

ছটফট করছিলেন নেতা। সকাল বেলার সংবাদ বলতেই নেতা মুখ ধোয়া বন্ধ রেখে কাগজ টেনে নিলেন। পড়লেন। পড়তে পড়তেই, দেখলাম, ক্ষণে ক্ষণে সে মুখের রূপ পালটে যাচ্ছিল।

হাতের কাগজ ফেলে দিয়ে বলে উঠলেন: "মূল্যবান একটি বছর কাটিয়ে এই অভিনয় করবার পেছনে কোন যুক্তি নেই। কোন সার্থকতাও নেই। ইনডিভিডুয়াল সত্যাগ্রহ! দেশশুদ্ধ সবাইকে প্রহ্লাদ বানিয়ে উনি ইংরেজ তাড়াবেন নাকি?"

পেছনে হাত ছুখানা মুড়ে দালানের একপ্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত ঘুরে বেড়াচ্ছেন। খাঁচায় বদ্ধ সিংহ। টগবগ করছেন। মাঝে মাঝে থামেন। আবার বলে ওঠেন: "নিজে উনি ভয়ানক ইনডিভিডুয়ালিস্ট। দেশ নয়, ব্যক্তি। সমাজ বা জাতি নয়, একজন।"

এসময় কথা বলা চলে না। বলতে নেই। আমি চুপ করে থাকি। কাগজখানা ভালো করে পড়ি। বার বার পড়ি। লাইনের ফাঁকে ফাঁকে না-বলা কথা খুঁজে বার করতে চেষ্টা করি।

"সৈন্য বা অর্থ, কিছু দিয়ে ইংরেজকে এই যুদ্ধে সাহায্য করা হবে চরম অন্যায়। সংগ্রাম-কামনা নষ্ট করতে হলে অহিংস প্রতিরোধই একমাত্র উপায়।" সত্যাগ্রহের অঙ্গীকার প্রবন্ধ।

হয়তো কেন, নিশ্চয়ই, স্বাধীনতার প্রশ্ন পরিহাস করা হয়েছে। কিন্তু এতেও কি আগের মতোই গান্ধী আর কংগ্রেসের ওপর ইংরেজ প্রসন্নই থাকবে? থাকতে পারবে? দেশ-জোড়া নিস্তব্ধতার বুকে কোন চাঞ্চল্যই কি এই সত্যাগ্রহ জাগিয়ে তুলতে পারবে না? প্রদেশে প্রদেশে প্রতি ঘণ্টায় বন্দী হয়ে চলেছে কংগ্রেসের শীর্ষস্থানীয় নেতারা। এর আগে শুধু সুভাষ-গোষ্ঠীই এ-সম্মান পেয়েছে। চাকা ঘুরে গেছে। সবাই জেলে যেতে চায়। হোক না সীমাবদ্ধ,

হোক সঙ্কীর্ণ, হোক দুর্বলও, তবু এই অসহায় বিমূঢ়তার বুকে সহসা যে প্রাণ-চাঞ্চল্য ফুটে উঠল, কে জানে, একদিন তা উত্তাল হয়ে ঐ অনড় আর বিশাল ঐরাবতকে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে না!

চেয়ারে এসে বসলেন। কাগজখানা টেনে নিয়ে আবারও পড়লেন। তারপর চোখ তুলে আমার দিকে চাইলেন। এই সুযোগ। বললাম: "হলোওয়েল-মনুমেণ্ট-সত্যাগ্রহের চাইতে কিন্তু এটা জোরদার। আর সঙ্কল্পও বিস্তীর্ণ।"

"তা জানি।"

কণ্ঠ গম্ভীর। চিন্তা ভেতরে ঢুকছে। প্রাথমিক আবেগ-বন্যা সংহত হয়ে আসছে। বললাম: "স্বাধীনতার প্রশ্ন পাশ কাটিয়েও সুভাষ বোস মনুমেণ্ট-সত্যাগ্রহে বিশ্বাসী হয়েছিলেন এই কারণেই যে, ওতে নিশ্চিন্ত ইংরেজকে অন্তত ছটফট করতে হবে খানিকটা। তাছাড়া এর পেছনে ছিলো ভবিষ্যৎ-সম্ভাবনার ইঙ্গিত।"

"সুভাষ বোস ব্যক্তি। কিন্তু ভারতীয় কংগ্রেস জাতির একমাত্র প্রতিষ্ঠান। সুভাষ বোস যা করে আর করতে পারে, কংগ্রেস তা পারে না। পারতে নেই।"

একটা আনকোরা নতুন কথা। আর ব্যঞ্জনাও অত্যন্ত নতুন। ব্যষ্টি আর সমষ্টি। পার্থক্য প্রচুর। ব্যক্তি জহরলাল, কিম্বা গান্ধী, কিম্বা আজাদ, কেউ বা সবাই যদি ইংরেজের দিকে ঢলেই পড়ে, কংগ্রেস মরে যাবে না। কিন্তু কংগ্রেস যদি—,আলোর একটা ছটা এসে আমার চোখে লাগল।

উদ্দীপ্ত কণ্ঠ থেকে তখুনি বেরিয়ে এল: "আমিও বলে রাখছি, তুমি দেখে নিয়ো,—এই গান্ধীই প্রত্যক্ষ জাতীয় সংগ্রামে নামতে বাধ্য হবেন। কিন্তু পরিতাপ থাকলো যে সময়ে তা হলো না।"

অসহিষ্ণু সুভাষ। উদ্দাম সুভাষ। কারও কারও চোখে হয়তো হটকারীও। কিন্তু মুক্তির এই নিরবচ্ছিন্ন অস্থিরতা, এই অবারিত বিপুল আকুতি, সাবধানী আর সতর্ক পদক্ষেপীদের বিচার বুদ্ধির

বিরূপতা করবেই, কিন্তু যুগে যুগে এই বেহিসেবী আর বন্ধুর পথযাত্রীরাই-না সম্ভবপর করে তোলে বেদনা-মধুর সেই মুক্তির সম্ভাবনা।

সহসা আলোচনা থেমে যায়। মেজর পাটনি এসে পড়েছেন। দুর্গোৎসব আসন্ন। নেতা জেল কর্তৃপক্ষকে পূর্বাহ্লেই তাঁর সঙ্কল্পের কথা জানিয়েছেন। পাটনি এসেছেন সেই সম্পর্কে আলোচনা করতে।

বাইরে থেকে পুরোহিত, তন্ত্রধারক, প্রতিমা আর পূজোর উপকরণ আনাতে হবে। যদি কেউ বাইরে থেকে ভোগের বা পূজোর জন্য কিছু পাঠায়, তাও নিতে দিতে হবে। এই সব কথা নেতা জানিয়েছিলেন।

ওদের আপত্তি নেই বেশির ভাগ ব্যাপারেই। আপত্তি করবার উপায়ই কি ছিল? একগুঁয়ে, নাছোড়বান্দা এই লোকটি ওদের অজানা নন। মান্দালয়ের কথাও মনে আছে বিলক্ষণ। পূজো নিয়ে শেষে প্রায়োপবেশন। তারপর সরকারের নতি স্বীকার। এই সব মনে করে উধ্বর্তন কর্তৃপক্ষ পাটনির ওপর সব ভার ছেড়ে দিয়েছে। এখানেই পাটনির চিন্তা। নেতার তুষ্টি আর কর্তৃপক্ষের সন্তুষ্টি, এক কথা নয়। দ্বন্দ্ব বেধে যাবে না তো?

ঢাক, বড় ঘণ্টা, কাঁসর, পূজোর অঙ্গ। হিন্দু মাত্রেরই পূজোয় যোগদান-আকাঙ্ক্ষা মজ্জাগত এবং স্বাভাবিক। নেতার দাবী, সকল হিন্দুকে পূজোর অংশ নিতে অনুমতি দিতে হবে। সবাই,—অবশ্য যাদের ইচ্ছা হবে, অঞ্জলি দেবে। প্রসাদ নেবে। আরতি দেখবে।

আর কিছুতে আপত্তি উঠবে না কিন্তু জেলের মধ্যে অন্তত গোটা পাঁচের ঢাক যদি এক সঙ্গে বেজে ওঠে, সে কী ভয়ানক ব্যাপার ঘটবে। পাটনি ভেবে অস্থির। আর ঐ বড় ঘণ্টা। ওরই শব্দ প্রহরে প্রহরে সময় জানিয়ে দেয়। ওরই আকস্মিক আর অনবরত

ধ্বনি জানিয়ে দেয় বিপদ-আপদের বার্তা। যার নাম জেল-পরিভাষায় পাগলা ঘণ্টী। যদি একটা ফ্যাসাদ বেধে ওঠে!

আমরা তুজন ছাড়াও তখন রাজনৈতিক বন্দীর সংখ্যা অনেক। বিভিন্ন মহলে তারা থাকে। সবাইকে অন্তত পূজো আর প্রসাদ নেবার সময় একসঙ্গে থাকতে দিতেই হবে। তাছাড়া অন্যান্য কয়েদী। তার সংখ্যাও হাজার তুয়েকের কাছাকাছি। সমস্যা সামান্য নয়।

নেতাকে আর একটু ভেবে দেখবার অনুরোধ জানিয়ে পাটনি বিদায় নিলেন। আরম্ভ হল আমাদের পরামর্শ। বড় সমস্যা হল অর্থ।

নেতার খাজাঞ্চি মেজ বৌদিদি কলকাতায় নেই। আর কার কাছেই-বা চাইবেন? এক মা। কিন্তু তাঁর অবস্থা না জেনে চাইলে তিনি হয়তো অত্যন্ত বিব্রত হয়ে পড়বেন।

অন্তত আটকবন্দীরা যদি স্বেচ্ছায় কিছু কিছু দেয়, খানিকটা সুরাহা-যে হয়, সন্দেহ নেই। কিন্তু নেতা নারাজ।

অনেক চিন্তার পর পথ ও পাথেয় তুই-ই মিলল। ইলার কাছে একদা নেতা নাকি শ তিনেক টাকা রেখেছিলেন। মনে পড়ে গেছে। আর ভাবনা নেই। এতবড় মোটা টাকার অঙ্ক। নেতা খুশিতে ঝলমল করে ওঠেন।

কিন্তু নমো নমো করেও হাজার তুয়েক কয়েদীকে একদিনও যদি প্রসাদ দিতে হয়, তাতেই-যে কমপক্ষে পাঁচ শো চাই। আবার তুশ্চিন্তা আসে ভিড় করে।

নাম-করা কয়েকটি মিষ্টান্ন প্রতিষ্ঠানের কাছে জানানো হল। অন্য কিছু নয়, কিছু বোঁদে। অন্তত হাত ভরে যদি সবাইকে একদিনও বোঁদে দেয়া যায়,—ওতেই ওরা খুশিতে উপচে পড়বে। ওতো শুধু বোঁদে নয়, ও যে মায়ের প্রসাদ।

কলকাতা প্রেসিডেন্সী জেলে মহাপূজো শুরু হয়ে গেল।

প্রতিমা এল। বোধন হল।

মহাসপ্তমী। প্রথম যে-মহলে আমরা ছিলাম, সেই মহলে পূজোর স্থান হয়েছে। সাজানো হয়েছে মণ্ডপ। দেবীর প্রতিমা এসে গেছে। এসেছে সব রাজবন্দীরা।

বেশ সকাল সকাল আমরা ঘুম থেকে উঠলাম। স্নান সেরে মণ্ডপে যেতে হবে। কিন্তু সমস্যা দেখা দিল পরিধেয় নিয়ে। নেতার একখানা গরদের ধুতি ছিল। আমার ধুতি ছিল না, ছিল মটকার চাদর। দুটো মিলিয়ে একজনের হয়। কিন্তু সে-একজন কে হবে ?

ওঁর ঘরে গিয়েছিলাম রেডিও খুলতে। দেখি রেডিওর ওপর একটা কাগজের মোড়ক। খুলতেই বেরিয়ে পড়ল গরদের কয়েক গজ কাপড়। কেউ পাঠিয়েছে জামা করিয়ে নিতে। নিয়ে এলাম।

ছোট বহরের কাপড়। গায়ে পেঁচিয়ে দু কাঁধের ওপর দিয়ে দিলাম ঝুলিয়ে। পিন দিয়ে আটকে দিলাম। খুলে না যায়। গলার দুপাশে ঝুলে থাকল দুটি প্রান্ত। চাদরের মতো। চমৎকার লাগছিল দেখতে। প্রথমটায় একটু খুঁতখুঁত করছিলেন। আর্শি সামনে ধরলাম। হাসি ফুটে উঠল মুখে। সেপাইকে ডেকে দরজায় তালা লাগালো হল। আমাদের রওনা হবার ঠিক মুখে সার্জেন্ট এসে দাঁড়াল। ইনটারভিউ।

কাগজখানা হাতে নিয়েই চেঁচিয়ে বলে উঠলেন : "মহাদেব এসেছেন। (মহাদেব দেশাই, গান্ধীজির একান্ত সচিব) নিশ্চয়ই গান্ধীজি পাঠিয়েছেন।"

অবাক হবারই কথা। ক'মাস হয়ে গেল। কৈ, কোন খবরই তো ওঁরা নেননি। অকস্মাৎ এই বার্তাবহ এলেন কেন ? তবে কি ওঁদের মতিগতির পরিবর্তন হয়েছে ?

একসঙ্গেই আমরা বেরুলাম। গেট পার হয়ে যেতে হয় মণ্ডপে। নেতা ভেতরে গেলেন। আমি গেলাম মণ্ডপে।

পুরোহিত চণ্ডীপাঠ করছিলেন। আমিও চণ্ডী খুলে বসলাম।

কিন্তু একটা বর্ণ না পড়া হলো, না হলো শোনা। মনের ভেতর শুধু একটি কথাই তোলপাড় করতে লাগল ঃ মহাদেব এলেন কেন ?

চোখের ওপর ভেসে উঠছে নেতার মুখখানা। মহাদেব এসেছেন শুনে নেতার কী উল্লাস। চোখ-মুখ ফুঁড়ে উল্লাস ঠিকরে পড়ছিল। ভাবছিলাম, এই মানুষকে ওরা বলে গান্ধী-বিরোধী! গান্ধী নন, তাঁর একজন লোক এসেছেন। এতেই এত আনন্দ। এ-মানুষকে ওরা চেনেনি। ভুল করেছে। আগাগোড়া ভুল।

সেদিন, পরবর্তীকালে এবং আজও কেউ কেউ বলেছে এবং বলতে চায় যে, সুভাষচন্দ্র ছিলেন গান্ধী-বিরোধী। কথাটা শুধু ভুল নয়, অসত্য। গান্ধী তো দূরের কথা, এই মানুষটি কোনদিনই কোন ব্যক্তি-বিশেষকে শত্রুও ভাবেননি, আর তা ভেবে তার বিরোধিতাও করেননি। অজাতশত্রু কথাটা খুবই ব্যাপক। ও-কথাটা তাই ব্যবহার করব না। কিন্তু এ-কথাটি অত্যন্তই সত্য যে, সুভাষচন্দ্রের প্রকৃতিতে ব্যক্তিগত সম্পর্ক খুব কমই প্রভাব বিস্তার করবার অবকাশ পেয়েছে। নিছক সম্পর্ক ধরে তিনি সঙ্গী নির্বাচন করেননি। আবার সম্পর্কের অভাবে কেউ তাঁর শত্রুও কোনদিন হয়নি।

গান্ধীকে সুভাষচন্দ্র কতখানি শ্রদ্ধা করতেন এবং কী ভাবে তাঁর অবদান মুক্তকণ্ঠে বলতেনও, তার সাক্ষ্যের জন্য বেশি গবেষণা না করেও নির্দ্বিধায় একথা বলা চলে যে, তাঁর মতো গান্ধীকে অমন নিবিড়ভাবে ও অন্তর দিয়ে কেউ বোঝেওনি আর ভালোও বাসেনি। সেদিনও না, পরেও নয়। সত্যিকারের ভালোবাসার মধ্যে স্বার্থবোধ থাকে না। থাকতে নেই। সুভাষচন্দ্রেরও তা ছিল না। কিন্তু গান্ধীর চাইতেও দেশ ছিল তাঁর আরও বেশি প্রিয়। প্রিয়তম।

আর ঠিক এই কারণেই দীর্ঘ পরাধীনতার পর একান্ত প্রত্যাশিত স্বাধীন ভারতবর্ষের আংশিক কর্তৃত্বের সুযোগ তাঁর জীবনে যে-দিন আর যে-মুহূর্তে দেখা দিল, তার পরক্ষণেই এই গান্ধীকেই সর্বপ্রথম তিনি ঘোষণা করেছিলেন 'জাতির জনক' বলে। পরিচিত এবং

অতি-খ্যাত গান্ধী-ভক্তরা তাঁর বলবার পূর্বে এ-কথা বলবার সুযোগই পেলেন না।

কিন্তু এসব কথা বলব পরে।

একঘণ্টা কাটিয়ে নেতা এলেন। আমার পাশেই বসে পড়লেন। খুলে নিলেন চণ্ডী। খুব ছোট আকার। একটা নস্যির ডিবের মতো।

মুখের দিকে স্পষ্ট করে তাকাতে ভরসা পাচ্ছিলাম না। আবার অদম্য কৌতূহল চেপে রাখাও কঠিন। আড়চোখে তাকালাম। গম্ভীর মুখ। ভাবান্তর নেই কোন। একমনে চণ্ডী পড়ে চলেছেন। পুরোহিত তখন পাঠ করছিলেন :

দুর্বৃত্তবৃত্তশমনং তব দেবি শীলং
রূপং তথৈতদবিচিন্ত্যমনমতুল্যমন্যৈঃ।
বীর্য্যঞ্চ হন্তৃ হৃতদেব পরাক্রমাণাং
বৈরিষ্বপি প্রকটিতৈব দয়া ত্বয়েত্থম্ ॥

শত্রুকেও দয়া করা তোমাকেই সাজে। তুমি যে দেবী। আমরা মানুষ। মিত্রকেও তাই ভালোবাসতে ভরসা পাইনে।

স্থির হয়েছিল মহাষ্টমীর দিন এক সঙ্গে সবাই-এর খাওয়া হবে। আর প্রসাদ বিতরণ হবে ঐ দিনই। দুপুরে আমরা ডেরায় ফিরে এলাম। ওপরে পা দিতে-না-দিতে নেতা বললেন : "না, মহাত্মাজি মহাদেবকে পাঠাননি।"

ঊর্মিলা দেবীর (দেশবন্ধুর ভগ্নী) ধর্মছেলে ধীরেন মুখুজ্যেও আটক-বন্দী হয়েছিলেন ভারত-রক্ষা আইনে। তাঁর সম্পর্কে কিছু বলতে ঊর্মিলা দেবী মহাদেবকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন। মহদেব দেশাইও ঊর্মিলা দেবীকে 'মা' ডাকতেন। কলকাতায় যখন এসেই পড়েছেন, নেতার সঙ্গে তিনি দেখা করে গেলেন।

দুর্ভাবনা কেটে গেল। আকাশ-পাতাল ভাবছিলাম। জট পাকিয়ে উঠছিল মনের ভেতর। আজও অঘটন ঘটে বৈকি। অহরহই ঘটে চলেছে। গান্ধী যদি পাঠাতেন মহাদেবকে সুভাষ

বোসের সঙ্গে দেখা করতে, তাও তো হত অঘটনই। কিন্তু ঘটল না। বাঁচা গেল।

ওয়ার্কিং কমিটির বিনানুমতিতে সুভাষচন্দ্র কারাবরণ করে যে মহাপাতকের ভাগী হয়েছিলেন, সেটাই তো একটা ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ। তার পরক্ষণেই সেই কৃতকর্মের পরিণতির রূপ নিয়ে যা ঘটল, তা আরও গুরুতর ও মর্মান্তিক। সত্যাগ্রহের প্রবর্তক ও উদ্গাতা গান্ধীর বিনা সহযোগিতায়, কংগ্রেস তথা ওয়ার্কিং কমিটির বিনা সাহায্যে সত্যাগ্রহে সাফল্য লাভ করা কাম্য তো ছিলই না, সঙ্গতও কি হয়েছিল ?

ভারতবর্ষের বুকে সুভাষ-জীবনের শেষ ঐতিহাসিক প্রত্যক্ষ অভিযান ছিল এই সত্যাগ্রহ। সাফল্যের বিজয়মাল্য সেদিন দেশবাসী সাদরে পরিয়ে দিয়েছিল এই নির্যাতিত নায়কের গলায়। কিন্তু গান্ধী একটি কথা উচ্চারণও করেননি। তাঁরই প্রবর্তিত সত্যাগ্রহের সফলতা চোখে দেখেও করতে পারেননি।

মহাষ্টমী। ঘুম ভেঙে যেতেই কানে এল প্রভাতী ঢাকের বাজনা। ঘুম ভাঙানো বাজনা। বাইরে এলাম। নেতাও উঠেছেন। স্নানের ঘরে।

বারান্দায় টেবলের ওপর একখানা অ্যালুমিনিয়মের থালায় একরাশ শিউলি ফুল। মৃদু গন্ধ। কেউ দিয়ে গেছে। ফালতু, না, সেপাই ? কেউ হবে।

নেতা বেরিয়ে এলেন। সদ্য-স্নাত। খালি গা। জলের কণা গায়ে। পরনে গরদের ধুতি। ফুলের থালাটা দুহাতে তুলে নিলেন। ফুলের দিকে চেয়ে বললেন ঃ "শিউলি শরতের দূত।"

"সঙ্গে ওর সখীও আছে।" বললাম আমি।

"কে ?"

"অতসী।"

"হ্যাঁ। অতসীপুষ্পবর্ণাভা,—দেবীর রূপ।"

নিজের ঘরে ঢুকলেন।

আমি তৈরী হয়ে বাইরে আসতেই গরদের সেই টুকরোটা হাতে নিয়ে হাসতে হাসতে বললেন: "সাজিয়ে দাও।"

দিলাম। ঠিক আগের দিনের মতো করে। মুখে হাসি ফুটে উঠল। বললেন: "গেল অষ্টমীর কথা মনে আছে?"

"ভুলবো কেমন করে?"

না, ভুলিনি। এই অষ্টমীর দিন আমরা গেল বছর গিয়েছিলাম কোদালিয়া। নেতার পৈতৃক বসত বাড়িতে। নেতা, ইলা আর আমি।

সকাল আটটায় আমরা রওনা হলাম। মোটরে। যেতে ঘণ্টা খানেক লাগল। সোজা গিয়ে আমরা থামলাম একটা ছোট বাগানের সামনে। বাগান শুধু নামেই। শ্রীও নেই, ছাঁদও নেই। নেড়া। এক ধারে ছোট একটা পুকুর। ঘাট বাঁধা। সামনে একটু মাঠ। ঘাসে ঢাকা। একটু দূরে কয়েকটা আম-জামের গাছ। মাঝে-মধ্যে মাথা খাড়া করে দাঁড়িয়ে আছে নিরাভরণ নারকেল গাছ। বেশ পুরোনো। বুড়ো গাছে ঝুলছে নারকেলের কাঁদি। বড় একটা ঝাঁপড়া আম গাছের তলায় একটা ইঁটের পাঁজা। সেটাও অনেক দিনের। গায়ে ছ্যাদলা পড়ে গেছে।

মাঠে বসে ছিলেন সুরেশবাবু। নেতার দাদা। আর কয়েকটি ছেলে। ওঁরা কলরব করে উঠলেন। পেট খাই-খাই করছে। পাশের রাস্তা ধরে মুড়ির বস্তা-মাথায়-লোক যেতে দেখেই হৈ-হৈ করে উঠলেন সবাই। মুড়ি কেনা হল। গায়ের চাদর বিছিয়ে নেয়া হল মুড়ি। কিন্তু শুধুই মুড়ি। মন খুঁতখুঁত করে। সঙ্গে কিছু চাই। নিদেন লঙ্কা আর তেল। কিন্তু মিলবে কোথায়? সুরেশবাবু চোখ তুলে চান ওপরের দিকে। চোখ লোভাতুর হয়ে ওঠে। কিন্তু নিরুপায়। অত উঁচুতে কে উঠবে?

বাইরে লোক জমেছে। ছেলে ছোকরাই বেশি। নেতা এগিয়ে

গিয়ে একটিকে ধরে আনলেন। তর তর করে ছেলেটি গাছে উঠে গেল। ধপাধপ ফেলে দিল কয়েকটা ঝুনো নারকেল। পকেট থেকে পয়সা বের করে নেতা এগিয়ে গেলেন ছেলেটির দিকে। এক ছুটে সে অদৃশ্য হয়ে গেল। নেতাকে ও চিনতে পেরেছে।

কিলিয়ে নারকেল ভাঙা হল। নারকেল আর মুড়ি নিমেষে সব উবে গেল।

এর পরই স্নান পর্ব। গায়ের জামা খুলে নেতা একেবারে তৈরী। পুকুরে নাবছেন। আমি ঘাবড়ে গেছি। এই জলে ? জলের ওপরটা লালচে। ভাং-এ ঢাকা। অবলীলায় নেতা ঝাঁপিয়ে পড়লেন। সাঁতার কাটলেন বেশ অনেকক্ষণ।

স্নানান্তে জামা-কাপড় বদলাবার পরক্ষণেই ডাক এল বাড়ি থেকে। মাজননীর ডাক। ওঁরা এসেছেন আগেই। মাজননী আর অন্যান্য বধূরা। সঙ্গে ছেলে-মেয়ে।

একটানা আনন্দে কেটেছিল সারাটা দিন। খাওয়া হল ভেতর দালানে। কোদালিয়ার বিখ্যাত খাস্তা কুচুরী আনাতে মাজননী ভোলেননি। সঙ্গে রসকরা।

বেলা চারটে নাগাদ আমরা এলগিন রোডে ফিরেছিলাম। ঘুম ভাঙল ইলার ডাকে। চায়ের কাপটা সামনে ধরে ইলা বলে উঠল : "বাবাঃ! কী ঘুম!"

হাসতে হাসতে যাবার সময় বলে গেল : "রাঙা কাকাবাবু ডাকছেন।" (বলত রাঙা কাকাবাবু কিন্তু বলত একটু জড়িয়ে। শোনাত, 'রাংকু'।)

ভুলিনি। কোনদিন ভুলবও না।

সেই অষ্টমী। কিন্তু এবার কারাগারে।

প্রসাদ দেয়া হল সবাইকে। যে এল তাকেই। মায় চীনাদেরও। এক সঙ্গে খাওয়া হল।

কারাগারের দুর্গোৎসব সাঙ্গ হল। বিজয়ার প্রতিমা আমরা

গেটে পৌঁছে দিলাম। বাইরে অপেক্ষমান অসংখ্য জনতা প্রতিমা নিয়ে গেল। শিকের ফাঁকে নিবদ্ধ হয়ে রইল জনতার উৎসুক দৃষ্টি। একটুক্ষণের জন্য তাদের প্রিয় নেতাকে দেখবার আশায়।

সেদিনের অসমাপ্ত আলোচনার জের টেনে আনলেন নেতা নিজেই।

পূর্ণিমার রাত্রি। কোজাগরী পূর্ণিমা। চাঁদের আলো আছড়ে পড়ছিল পৃথিবীর বুকে। কারাগারও বাদ পড়েনি। কালো আকাশ ঝলমল করছিল। দূর থেকে ভেসে আসে শঙ্খধ্বনি। নারীকণ্ঠের উলু। ঘরে ঘরে লক্ষ্মীপূজোর ধূম। একটু পরই শুরু হবে ব্রতকথা। মা লক্ষ্মীর পুত্র কুবের আর কন্যা ঢুস্‌নের কাহিনী।

ঘরের ও বাইরের আলো নিবিয়ে দিয়ে আমরা ফরাস পেতে বসলাম দালানে। আলোর ঢল দালানেও পৌঁছে গেছে।

বেশ খানিকটা রাত হল। নিজে থেকেই রাতের খাবারের ব্যবস্থা করেছিলেন, লুচি আর মাংস। খাওয়া হল। দালানে বসে শুরু করলেন কথা। সেই সেদিনের অসমাপ্ত কথা।

বললেনঃ "গান্ধীজির অবদান আমি কোনদিনই অস্বীকার করবো না। তিনি মহৎ, এ-কথাও খুবই সত্য; কিন্তু তার সঙ্গে একথাটাও অত্যন্ত সত্য যে, ইংরেজ গান্ধীর প্রভাব আর অহিংসানীতি তার নিজের স্বার্থে ব্যবহার করেছে এবং করেই চলেছে।"

ভারতবর্ষের রাজনীতি ক্ষেত্রে গান্ধীর প্রত্যক্ষ সংস্পর্শের পর থেকে তাঁর প্রতিটি কার্যের বিশ্লেষণ চলতে লাগল। গান্ধী কী ছিলেন, কী হয়েছেন আর কী দিয়েছেন,—সব। গান্ধীর মূল সত্তা রাজনৈতিক বিপ্লবের যে-কোন রূপের শুধু প্রতিবাদই নয়, পরন্তু প্রবল বিরোধী। গান্ধী-জীবনের উল্লেখযোগ্য যে-কোন ঘটনা এ-কথা সমর্থন করবে। চিরদিন গান্ধী ছিলেন ইংরেজের গুণমুগ্ধ রাজভক্ত প্রজা। ইংরেজের ভুল, ত্রুটি, দুর্বলতা সবই তিনি দেখেছেন কিন্তু শোধনের উর্ধ্বে আর

কিছু করণীয় থাকতে পারে, এ-কথা ভাবেননি। গান্ধীর 'চেঞ্জ অব হার্ট' শুদ্ধিরই নামান্তর।

যখনই দেশে বিপ্লবের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে, হয় গান্ধী আন্দোলন থামিয়ে দিয়েছেন, আর না হয়, আপোসের দিকে ঝুঁকে পড়েছেন। ১৯২২, ১৯৩০, ১৯৩৩ গান্ধী-জীবনের মর্মান্তিক ট্র্যাজেডি।

নেতা তীক্ষ্ণ হয়ে বললেন: "লক্ষ্য করে দেখো, ইংরেজ এই সব আন্দোলনের মাঝখানে কোনদিনই গান্ধীকে বন্দী করেনি। যদি-বা করেছে অনেক পরে, বাজে অজুহাতে ওঁকে ছেড়েও দিয়েছে কিছু দিন পরই। ইংরেজ জানে, গান্ধী আর যাই করুন, বিপ্লব ঘটাতে দেবেন না। ইংরেজের ভয়ানক কিছু অনিষ্ট হবে, ইংরেজ বিপন্ন হয়ে পড়বে, এমন কিছু গান্ধী করবেন না, গান্ধী করতে পারবেন না, বা চাইবেন না,—ইংরেজ যেন এটা আগে-ভাগেই ধরে রেখেছে।"

ইংরেজ সম্পর্কশূন্য স্বাধীনতা গান্ধী কল্পনা করতে পারেন না। যদি পারতেন, এই সুবর্ণ সুযোগ তিনি হেলায় হারাতেন না। ইওরোপের যুদ্ধে ইংরেজ জড়িয়ে পড়বার সঙ্গে সঙ্গে তিনি কংগ্রেসের তথা দেশের সমগ্র শক্তি কেন্দ্রীভূত করে জাতীয় সংগ্রামে প্রবৃত্ত হতেন। কিন্তু হলেন না। হলেন না কেন? কেন এল দ্বিধা? বিরুদ্ধ পক্ষের বিপদের সময় নাকি তাকে উদ্ব্যস্ত করতে নেই। কেতাবে লেখা আছে এই নিষেধাজ্ঞা। দীর্ঘ এক বৎসর এই নীতিশাস্ত্র মানবার পর অকস্মাৎ ব্যক্তি-সত্যাগ্রহই-বা তিনি চালু করতে গেলেন কেন? ইংরেজ কি একান্তই নিরুদ্বিগ্ন আর প্রসন্ন হয়ে উঠেছে এই ব্যবস্থায়? অর্থাৎ সাপও মরে, লাঠিও যেন না ভাঙে। ইংরেজ একটু দুর্বল হোক, কাবু হয়ে পড়ুক, কিন্তু ঐ পর্যন্তই। তার অস্তিত্বের পক্ষে মারাত্মক যেন কিছু না ঘটে। ঘটলে ইংরেজ মরবে। গান্ধী তা চান না।

"গান্ধী আর জহরলালের মিলন-সূত্রও এইখানে। ওঁরা কেউই ইংরেজের সম্পর্ক কাটাতে চান না।" বললেন নেতা।

"কিন্তু দেশের লোক তো ওঁদের কথাই বেশি শোনে আর মানেও।" বললাম আমি।

"খুবই সত্যি। সংখ্যাগরিষ্ঠদের ভোটে কোন দিন কোন দেশে বিপ্লব আসেনি। ওঁদের কথা বেশি লোকে শোনে, এও একটা প্রমাণ যে, ওঁদের কথা বিপ্লব-বিরোধী।"

"কিন্তু শোনে কেন?"

"কেন? তারও কারণ আছে। একটা অসাধারণ মনস্তত্ত্বের অধিকারী গান্ধীজি। অতি দীর্ঘ দিন পরাধীন থেকে এদেশের লোক পরাধীনতাকেই স্বাভাবিক বলে ধরে নিয়েছে। স্বাধীনতার স্থান গ্রহণ করেছে উদ্দেশ্যহীন, আয়েসী অধ্যাত্মিক উন্মাদনা। গান্ধীজি এই মানসিকতা কাজে লাগিয়েছেন।"

গান্ধী অলৌকিক, গান্ধী অসাধারণ, গান্ধী অবতার। হাজার হাজার অজ্ঞ মানুষ গান্ধীকে দর্শন করবে, প্রণামী দেবে, পায়ের ধুলো নিতে জীবনও বিপন্ন করবে, কিন্তু স্বাধীনতার জন্য কয়জন এগিয়ে আসবে? কোটি কোটি লোকের দেশ ভারতবর্ষ, কিন্তু কোন আন্দোলনেই এক লক্ষ লোকও জেলে যায়নি। নিছক জেল, মরা নয়,—তবুও যায়নি।

"এ সত্ত্বেও যুদ্ধ শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গে যদি গান্ধী সত্যাগ্রহ চালু করতেন, এবার দেশের লোক অনেক বেশি যোগ দিতো আন্দোলনে। কিন্তু গান্ধী তা চান না।"

"কেন?"

"এবার সত্যাগ্রহ শুরু হলে ইংরেজের পরাজয় অবশ্যম্ভাবী। গান্ধী ইংরেজের পরাজয় চান না।"

"কিন্তু ইংরেজের পরাজয় না হলে সত্যাগ্রহেরই-বা জয় হবে কোত্থেকে?"

"গান্ধীর সত্যাগ্রহ জয় চান না, চান আপোস।"

"সত্যাগ্রহ, তা হোক না ব্যক্তি-সত্যাগ্রহ, ও ছাড়াও তো আপোস হতে পারতো ?"

"পারতো। কিন্তু গান্ধীর অলৌকিকতা তাতে প্রমাণিত হতো না। তাছাড়া, গান্ধী ইংরেজকে বোঝাতে চান যে, তিনি আজও অকেজো হননি, উপেক্ষার পাত্রও নন। দেশের লোকও বুঝবে যে, গান্ধী এই পরমক্ষণে বসে নেই।"

অনেকের সুদৃঢ় বিশ্বাস যে, যেহেতু ইংরেজ ভয়ানক সত্য, তাই এক তরফা বে-আইনী আইন-অমান্য সে মুখ বুজে সহ্য করে গেল। হত হিটলার, কিম্বা জাপানী গভর্নমেণ্ট, গুঁড়িয়ে দিত না ? পিষে ডলে উজার করে ছাড়ত না ?

নেতা বলেই চলেছেন ঃ "ইংরেজ যদি বুঝতো যে, গান্ধীর সত্যাগ্রহে তাকে সত্যি সত্যি বিপন্ন হতে হবে, সেও তাই করতো। যেমন করেছিলো সেপাই-বিপ্লবের পর। গান্ধীর সত্যগ্রহ একদিকে ইংরেজকে অভয় দিয়েছে, অন্যদিকে প্রকৃত বিপ্লবের সম্ভাবনা রেখেছে দূরে ঠেকিয়ে।"

অনেক রাত। কোলাহল থেমে গেছে। শব্দহীন পৃথিবী। আলোভরা কারাগার ঘুমিয়ে পড়েছে। আমরাও শুতে গেলাম ঘরে। কিন্তু ঘুম এল না। এই এক অদ্ভুত মানুষ। একই সঙ্গে গান্ধীকে শ্রদ্ধা করেন অপরিসীম, কিন্তু বিচার করেন তন্ন তন্ন করে। গান্ধীকে করেন শ্রদ্ধা কিন্তু ভালোবাসেন স্বাধীনতাকে।

সেদিন ভেবেছিলাম এইটুকুই। কিন্তু আজকের এই অলস জীবন-সায়াহ্নে বিশ্লিষ্ট মনের সম্মুখে ভেসে উঠছে ভারতবর্ষের অলিখিত রক্তাক্ত ইতিহাস বার বার। মানিকতলা, বজবজ, বালেশ্বর, চট্টগ্রাম আর,—আর শেষ সংগ্রাম-ক্ষেত্র কোহিমা। ভারতবর্ষের ইতিহাস। গায়ে ওর গভীর ক্ষতচিহ্ন। রক্ত ঝরছে। টাটকা, তাজা, লাল রক্তের ছোপ আজও মুছে যায়নি।

"শ্যামা বাংলার মিষ্টি মধুর রূপই চিরদিন দেখে আসছি কিন্তু সেই প্রথম দেখলাম বাংলার রুদ্রাণী রূপ।"

রুদ্রাণীই বটে শান্ত মেয়েটি সেদিন অত্যন্ত হঠাৎ দামাল হয়ে উঠেছিল। পদ্মা উঠেছিল ক্ষেপে। উত্তাল ভয়াল হয়ে উঠেছিল ওর মূর্তি। লক্ষ লক্ষ অজগর ফণা তুলে গর্জন করছিল ওর বুকে। ওর সঙ্গে যোগ দিয়েছিল তিস্তা, করতোয়া, ইছামতি আর আত্রাই।

১৯২২। ভেসে গেল উত্তর বাংলা। হাজার হাজার মানুষ আশ্রয় নিল গাছে, রেল লাইনের ধারে, ঘরের চালে। মানুষ সাপ বাঘ পাশাপাশি বাস করতে লাগল।

চারদিকে শুধু নাই নাই ধ্বনি। আশ্রয় নাই, অন্ন নাই, ছেলে নাই, মেয়ে নাই, গোরু-মোষ নাই,—সব ভেসে গেছে। নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে।

কণ্ঠে অভয় বাণী আর বুকে করে অভয়ার রূপ সুভাষচন্দ্র দাঁড়ালেন ওদের সম্মুখে। উত্তর বাংলা আর বাংলার বিভিন্ন স্থান থেকে এল কর্মীরা। এইখানেই উত্তর বাংলার সন্ত্রাশবাদীদের সঙ্গে হল নেতার নিবিড় পরিচয়। হল সখ্য। এবং পরবর্তীকালে ফরোয়ার্ড ব্লক গঠন পর্যন্ত এই পরিচয় আর সখ্য থাকল অটুট হয়ে। বস্তুত সেবা আর মমতার এই অকুণ্ঠ একান্তি সেদিন নব-বাংলার ভাবী নায়ক ও দেশবন্ধুর উত্তর সাধককে শক্তি জুগিয়েছিল সমগ্র উত্তর-বাংলার আনুগত্য ও সখ্য লাভ করতে।

ইংরেজের গোলামী অস্বীকার করবার পর উত্তর-বাংলার আর্তি সেবার এই অনন্য সাংগঠনিক প্রতিভা তাঁর পরবর্তী রাজনৈতিক জীবনের প্রথম বিজয়-পর্ব। শুধু এদেশের আপামর গণ-জীবনই সেদিন তাঁর এই দেশসেবার অপূর্ব অবদানে বিস্মিত হয়নি,—বিদেশের বহু পর্যবেক্ষক, বিশেষ করে ইংরেজের মুখ থেকেও এই নবীন তাপসের সেবা-ধর্ম বহু উচ্ছ্বসিত প্রশংসা আদায় করে ছেড়েছিল।

এর পরেই এল স্বরাজ্যদল গঠনের বিপুল দায়িত্ব। নেতার কথাঃ "আর কোন পথ ছিলো না বলেই আমরা ও-পথ বেছে নিয়েছিলুম। বরদলীর সিদ্ধান্ত দেশকে এক দুর্বিষহ অবস্থায় টেনে নামিয়েছিলো। পরিত্রাণের পথ ছিলো না। এই একমাত্র পথ খুঁজে বের করেছিলেন দেশবন্ধু।"

খুব সম্ভব আইরিশ নেতা পারনেলের দৃষ্টান্তই দেশবন্ধুকে প্রেরণা জুগিয়েছিল। সেদিন আয়র্লণ্ডের ছত্রভঙ্গ বিপ্লবী দল এবং ফিনিয়ান, হোমরুল ও ল্যাণ্ড লিগ প্রভৃতি নিয়মতান্ত্রিক দল সম্মিলিত হয়েছিল পারনেলের ছত্রতলে। আয়র্লণ্ড পূর্ববর্তী নেতা স্যার আইজাক বাটের পরিবর্তে নেতৃত্বে বরণ করে নেয় পারনেলকে। বাংলা দেশ নেয় স্যার সুরেন্দ্রনাথের স্থানে দেশবন্ধুকে। এদেশেও বাংলার এবং সন্ত্রাশবাদীরা দেশের বিভিন্ন বুদ্ধিজীবী ও বিভিন্ন সংস্থার শ্রেষ্ঠ কর্মীরা একযোগে দেশবন্ধুর নেতৃত্ব স্বীকার করে নিয়েছিল। সুভাষও নিলেন কিন্তু অন্তরের পরিপূর্ণ সমর্থন তিনি পেলেন না।

প্রকৃতপক্ষে স্বরাজ্য দলের প্রতি তাঁর যথেষ্ট অনুরাগ থাকা সত্ত্বেও ইলেকশ্যন বা ঐ জাতীয় নিয়মতান্ত্রিক কাজে নেতার বিশেষ আকর্ষণ কোন কালেই ছিল না। অলস নৈষ্কর্ম্যের হাত থেকে জাতীয় প্রতিষ্ঠানকে রক্ষার চাহিদায় তিনি কল্পনাতীত পরিশ্রম করেছেন এর সফলতার জন্য, কিন্তু কোনদিনই প্রাণ ঢেলে দিতে পারেননি। ইলেকশ্যন আর নানা রকমের পদমর্যাদার রন্ধ্রপথে অলক্ষ্যে পরাধীন দেশে কেমন করে ঈর্ষা আর মনান্তর মাথা চাড়া দিয়ে জাতীয় প্রতিষ্ঠানকে সংগ্রামের পথ থেকে ধর্মবিচ্যুত করে, সে-সম্বন্ধেও নেতার ছিল পরিস্ফুট ধারণা।

এই ধারণা অত্যন্ত প্রখর ও প্রবল ছিল বলেই প্রথমবার নেতা ইলেকশ্যনে নাম লেখাননি। এবং কর্পোরেশন দখল করবার পর তাঁকে একসিকিউটিভ অফিসার নিযুক্ত করবার সময়েও আপত্তি করেছিলেন যথেষ্ট। তাঁর আপত্তি টেকেনি। দেশবন্ধুও একথা

জানতেন। কিন্তু বৃহত্তর ভবিষ্যৎ তাঁকে এই অপ্রিয় ও অবাঞ্ছিত পথ বেছে নিতে বাধ্য করেছিল। সখেদে দেশবন্ধু বলেছিলেন যে, কর্পোরেশন দখলে এনে তার কাজ সুচারু রূপে চালাতে গিয়ে তিনি তাঁর শ্রেষ্ঠ সম্পদকে বলি দিয়েছেন। (I have sacrificed my best man for this corporation.)

কিন্তু এই পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে সুভাষচন্দ্রের মনে জাগে ভিন্নতর স্বপ্ন। বাংলার সদ্য মুক্তি-পাওয়া বহু সন্ত্রাশবাদীর সঙ্গে মিশে ইলেকশ্যনের ডামাডোলের আড়ালে দেশকে বৃহত্তর কোন বিপ্লবের পথে এগিয়ে নেয়া যায় কিনা, এ-কল্পনাও এ-পথে নেতাকে আসতে প্ররোচিত কম করেনি।

অন্তত ইংরেজের ধারণা ছিল তাই। ইলেকশ্যন আর কর্পোরেশনের চাকুরির আবডালে এই ব্যক্তিটি ইংরেজ-ধ্বংসের এক ব্যাপক ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়ে পড়েছে। একথা ইংরেজ প্রকাশ্যে বলেছে পরবর্তী কালে।

এরই মধ্যে তাঁর একদল সহযাত্রী বন্ধু তাঁকে ভুলও বুঝেছিলেন যথেষ্ট। বন্ধুরা বিরূপ হয়েছিলেন। ব্যঙ্গের হাসি হেসেছিলেন প্রিয়জনেরা। ব্যক্তিস্বার্থের ঊর্ধ্বে থেকেও-যে ব্যক্তির সম্পদ ও পদমর্যাদা দেশ ও জাতির বৃহত্তর ও মহত্তর আদর্শের সেবায় নিয়োজিত হতে পারে, এই শ্রেণীর বন্ধুদের একথা ছিল অজানা। কিন্তু জানতেন তাঁর গুরু। দেশবন্ধু। যজ্ঞাগ্নির দীপ্ত শিখা সেদিন হয়তো সম্যক তাঁর চোখে চোখেও ধরা দেয়নি, কিন্তু অনাগত ভবিষ্যের প্রকাশ-ব্যাকুল মনোভাব সেই দিন আর সেই ক্ষণে এই কর্মযোগীর কানে কানে এই কথাটিই বলে দিয়েছিল যে, তাঁর মন্ত্র শিষ্যকে দেশসেবার সর্ব বিভাগে যোগ্যতম করে গড়ে তুলতে তাঁর সিদ্ধান্তের প্রয়োজনীয়তা একদিন স্বীকৃত হবেই।

হলও তাই।

২৫শে অক্টোবর, ১৯২৪, সুভাষচন্দ্র বন্দী হলেন।

বন্দী হলেন ছ মাস যেতে-না-যেতে। কিন্তু এই ছ মাসেই ইংরেজ

বুঝে নিয়েছিল এই মানুষটির কর্মদক্ষতা, লোকপ্রিয়তা এবং আরও একটি গুণ—যা ইংরেজের স্বার্থের মূলে হানতে চেয়েছিল প্রচণ্ড আঘাত।

ঘোড়ার আস্তাবল কর্পোরেশনে সত্যিই আচমকা লেগেছিল একটা প্রচণ্ড ধাক্কা। এক দিকে নব নব পরিকল্পনা, অন্য দিকে ইংরেজ কর্তৃত্বের চিরতরে অবসান ; দীর্ঘ দিন ধরে চেয়েও কলকাতাবাসী যা পায়নি, একান্ত আকস্মিক ভাবে তাই হল সম্ভবপর।

সারাদিন চলে অবিশ্রান্ত খাটুনি। একবার কর্পোরেশন, সেখান থেকে ফরোয়ার্ড কাগজের অফিস, সেখান থেকে কংগ্রেস অফিস।

ওরই ফাঁকে রাত্রির অন্ধকারে আসেন চেরী প্রেসে। সন্ত্রাশবাদীদের আড্ডায়। ক্লান্তি নেই বিরক্তি নেই, নেই আহার ও নিদ্রার সময়। কর্পোরেশনের কাজ ছাড়া কর্পোরেশনের গাড়ি কদাচিৎ ব্যবহার করতেন। বাড়ি ফিরতে প্রায়ই হত মধ্য রাত্রি। নিরালা রাজপথ অতিক্রম করতেন পায়ে হেঁটে। কোনদিন কেউ সঙ্গী থাকত, কোনদিন একা। ক্ষিদেয় পেট চোঁ-চোঁ করত। হাঁটতে হাঁটতে খেতেন মুঠো মুঠো চানাচুর।

মাইনে নির্দিষ্ট ছিল দেড় হাজার। কিন্তু টাকা পকেটে থাকত না কোনদিনই। সমিতি আর সঙ্ঘ ভিড় করে আসত। আসত দুঃস্থ আর অনাথ। আসত নিরুপায় ছাত্র আর সন্ত্রাশবাদীরা।

সামান্য কয়েকটা দিন আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে কাটিয়ে যাত্রা করলেন বহরমপুর। সেখান থেকে সেই সুদূর মান্দালয়। তাঁর দেশ, তাঁর ভারতবর্ষের নাগালের বাইরে।

১৬ই জুন, ১৯২৫। সারা ভারতবর্ষের বুকে একটা তীব্র আর্তনাদ ভেঙে পড়ল। সে আর্তনাদের ঢেউ পৌঁছে গেল সাগর ডিঙিয়ে। মান্দালয়ের কারাগৃহে।

দেশবন্ধু নেই।

সর্বস্ব দেশকে দিয়ে, যাবার সময় দেশকে দিয়ে গেলেন সুভাষকে। তাঁর স্যমন্তক মণি সুভাষ। পুত্র-শিষ্য সুভাষ।

৫

কেন্দ্রীয় একটা আসনের জন্য বাই-ইলেকশ্যন হবে। কলকাতার ইলেকশ্যন লোভনীয়। কলকাতা জনবহুল, সচেতন ভোটার, সীমাবদ্ধ নির্বাচনের গণ্ডী। মফস্বলের ন্যায় ভোটার ছড়ানো নয়। বেশি ধরাধরি করতে হয় না। উসখুস করে উঠল অনেকের মন। গাজনের বাজনা শুনেই একশ্রেণীর লোকের মনে যেমন সন্ন্যাসী সাজবার কামনা জেগে ওঠে, তেমনি। চঞ্চল হয়ে উঠল অনেকে।

আমাদের দলেরই জনা-চারেক চাঙ্গা হয়ে উঠল। এর ওপর ছিল অ্যাড্‌হক্ কমিটির সভ্যেরা। ওদের নিয়ে আমাদের মাথাব্যথা ছিল না। কিন্তু সমস্যা দেখা দিল দলের লোকদের নিয়ে: এই নিয়ে আবার নিজেদের মধ্যে খেয়োখেয়ি না বেধে ওঠে। নেতার দুশ্চিন্তার সীমা ছিল না।

এই সময়েই কংগ্রেস হাইকম্যাণ্ড অর্থাৎ কর্তারা এমন একটি কাণ্ড করে বসলেন, যার ফলে বাংলার কংগ্রেস-সংহতি বিলক্ষণ টাল খেল।

অধিকাংশ কংগ্রেস-সভ্যের অনুমোদন ও সমর্থন সত্ত্বেও কর্তারা বাংলার বিধিসঙ্গত কংগ্রেসকে বাতিল করে দিয়ে নিজেদের পোঁ-ধরা কয়েকজনকে নিয়ে বাংলায় পূর্বেই এক অ্যাড্‌হক্ কমিটি গঠন করেছিলেন। সংগঠনের ক্ষেত্রে এর ফলে যে ফাটলের সৃষ্টি হয়েছিল. দীর্ঘদিন তার কুফল ভুগতে হয়েছে বাংলাকে। এ-সত্ত্বেও সেদিন বাংলার অ্যাসেমব্লী ও কাউন্‌সিলে একটি দলই ছিল। এবং দলপতি ছিলেন শরৎচন্দ্র বসু।

বেশী দিন কর্তারা এ অবস্থা টিকতে দিলেন না। নিতান্ত বাজে অজুহাতে শরৎচন্দ্র দল থেকে নির্বাসিত হলেন। কংগ্রেসের শক্তিশালী দলীয় প্রাধান্য ভেঙে তছনছ হয়ে গেল।

ওখানেও হল দুটো দল। দুটোই কংগ্রেসী দল। দুজন নেতা। মুখে অহরহ ডেমোক্রাসির জয়ধ্বনি এঁরা করেন, কিন্তু ডেমোক্রাসির

মূল সূত্র এঁরা নিজেদের প্রয়োজনে এবং গরজের তাগিদে বার বার করেন পদদলিত।

প্রাদেশিক কংগ্রেস বাতিল করবার সময় এঁরা বাংলার নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মতামত জানবার প্রয়োজনীয়তা বোধ করেননি। শরৎ বোসের নেতৃত্ব নাকচ করবার বেলাতেও কংগ্রেসীদলের মতামতের কথা ওঁরা ভুলে গেলেন বেমালুম।

কংগ্রেসী দলের বেশির ভাগ সভ্য ছিলেন শরৎচন্দ্রের সমর্থক। তা সত্ত্বেও নেতৃত্ব তাঁর গেল। গেল কর্তাদের খেয়ালে আর মর্জিতে। কর্তার ইচ্ছায় কর্ম।

এই বাই-ইলেকশ্যনের তাই গুরুত্ব ছিল। বাংলার জনসাধারণ কাকে সর্বাধিক সমর্থন করে? সুভাষ-নেতৃত্ব, না, গান্ধী-নেতৃত্ব? এ প্রশ্নের মীমাংসা হবার প্রয়োজন ছিল।

কিন্তু এই নির্বাচন-প্রশ্ন দেখা দেবার আগে থেকেই নেতার একটা বড় ধরনের পরিবর্তন আমার চোখে পরিস্ফুট হয়ে উঠছিল। প্রায়ই একটা গভীর ও দুর্বোধ্য চিন্তায় উনি ডুবে থাকেন। কথা বলেন কম। সমস্ত সত্তা অন্তর্মুখী হয়ে ওঠে। ভেতরে কী একটা সংকল্প জন্ম নেয়। নিজের মনে দালানে পায়চারি করেন। নিদ্রাহীন রাত্রির বেশি সময় কাটে ধ্যানে আর পূজোয়।

মাঝে মাঝে দীর্ঘ পত্র লেখেন। লেখেন মেজদাদা শরৎচন্দ্রকে। লেখেন সরকারী কর্তৃপক্ষকে। সবটা বুঝি না, কিন্তু লক্ষ্য না করেও পারি না। গোপন অন্ধকারে একটা আলোড়ন চলেছে। নব সৃষ্টির চাঞ্চল্য।

ইলেকশ্যনের শেষ-মনোনয়নের দিন ঘনিয়ে আসে। কাকে বাদ দিয়ে কাকে মনোনয়ন দেয়া হবে? গুরুতর সমস্যা।

অকস্মাৎ আমার মনে একটা সমাধান-সূত্র গজিয়ে ওঠে। আর কেউ নয়, নেতা। উনি নিজে দাঁড়ালে সকল সমস্যার সমাধান হবে সহজে আর নির্বিঘ্নে। তাছাড়া, সব চাইতে যে-কথা আমাদের মনে

বেশি আলোড়ন তুলত সেদিন : বাংলাদেশে এমন কে আছে, যে সাহস করবে ওঁর বিরুদ্ধে দাঁড়াতে? দাঁড়ালেও তার পরিণাম? সেই অত্যন্ত জানা পরিণামই-না আমরা চাক্ষুষ দেখতে চাই।

কিন্তু উনি কি রাজী হবেন?

হঠাৎ প্রস্তাবটা তুলে ফেললাম।

"তোমার যত সব—", শেষ করতে দিলাম না। সম্পূর্ণ নতুন আর একটা যুক্তি সামনে তুলে ধরলাম। দেশের হাজার হাজার মানুষ ইংরেজের তৈরী ইস্পাত-কাঠামোর অন্তরালে গড়া এই মিথ্যা ডেমোক্রাসির জয়ধ্বনি করে সুভাষ বোসকে নির্বাচন করলে আমাদের দাবী খানিকটা জোরদার তো হবেই, অন্যদিকে নির্বাচিত একজন সদস্যকে বিনাবিচারে এইভাবে আটকে রাখলে আন্দোলনের পথও অনেকদিন ধরে আর অনেক রকমে খোলাও থাকবে। আর এর ফলাফল ইংরেজের মাথায় ঢুকবে অত্যন্ত সহজে।

এত সহজে কাজ হাসিল হবে, ভাবিনি মোটেই। কিন্তু হল। রাজী হলেন নেতা। ২৮শে অক্টোবর (১৯৪০) নেতার নির্বাচন-সংবাদ জানা গেল। প্রতিযোগিতা আদৌ হল না। নেতার বিরুদ্ধে কেউ দাঁড়ালই না।

আমার মোকদ্দমা শেষ হবার দিন ঘনিয়ে আসছে। প্রথম দিনই কোর্টকে আমি জানিয়েছিলাম যে, আত্মপক্ষ সমর্থন আমি করব না। এ শ্রেণীর মোকদ্দমার ফলাফল আমার বিলক্ষণ জানা ছিল। মোকদ্দমার পূর্বেই দণ্ড সম্বন্ধে ওরা স্থির সিদ্ধান্ত করে রাখে। মোকদ্দমা হয় পরে। লোক দেখানো মোকদ্দমা।

দুদিনেই শুনানি শেষ হয়ে গেল। বাকি রইল আমার জবানবন্দি ও রায়। একমনে জবানবন্দি লিখতে বসে গেলাম।

বিকেলে আমরা বেড়াতে যেতাম জেলখানার বাগানে। বাগান আমাদের মহলের গাঁ-ঘেঁষা। কাছেই। মাঝখানে বাঁধানো পথ।

দুধারে আনাজের চাষ। শ্রমের মূল্য নেই এখানে। একজনের স্থানে পাঁচজন কয়েদী লাগাতে এদের আটকায় না। কয়েদী শ্রমিক নয়। ওর শ্রমের মূল্যও তাই ধরা হয় না। চমৎকার আনাজ ফলেছে। ঢেঁড়শ, কুমড়ো, বেগুন, পুঁই আর ছাঁচি কুমড়ো। শুরু হয়ে গেছে আগাম কপির চাষের আয়োজন।

ঘণ্টাখানেক আমরা বেড়াতাম। হাঁটতে হাঁটতে হত কথা। সেদিনও হচ্ছিল। উঠল বাংলা সাহিত্যের কথা। আর সেই প্রসঙ্গেই তারাশঙ্কর বাঁড়ুজ্যের নাম।

তারাশঙ্করের সঙ্গে আমার পরিচয় হয় ১৯২৭-এ। কংগ্রেসের কাজে গিয়েছিলাম লাভপুর। সেখানে ওঁর নিজের গৃহে হল পরিচয়। ক্রমে সে-পরিচয় হল নিবিড় আর ঘনিষ্ঠ।

রাজনীতির বাইরে থাকতাম আমরা। আমি জানতাম যে, তারাশঙ্কর ছিলেন একটু গান্ধী-ঘেঁষা। যাকে বলে অনুরাগী। ভক্ত। তবু কোন প্রতিবন্ধকতাই দেখা দিল না। আমরা মিলেছি। হয়তো পরে মিলবও। সাহিত্যের উদার চন্দ্রাতপতলে আমাদের রাজনীতির মত-পার্থক্য ভুলে যেতাম।

তারাশঙ্কর সম্বন্ধে অনেক কথা বললাম নেতাকে।

"আমি ওঁর বেশি বই পড়িনি। যা পড়েছি, তা থেকেই বুঝেছি, উনি বাংলার একটা অংশকে বেশ ভালো করেই চেনেন। ওখানকার মাটি আর মানুষ, দুটোই ওঁর চেনা নয়—অন্তরঙ্গ।"

আমি বললাম, "গান্ধী-ঘেঁষা হলেও তারাশঙ্কর কিন্তু গান্ধীকে কোন বই উৎসর্গ করেননি। করেছেন সুভাষ বোসকে। ওঁর "চৈতালী ঘূর্ণি'। সম্ভবত ১৯৩১-এ বইটা বেরিয়েছিলো।"

"আমি জানি।"

"বীরভূমবাসী অন্তরের দিকে থেকে সুভাষভক্ত।"

"সেটা আবার কী?"

"হ্যাঁ। তারাশঙ্করের পরই রবীন্দ্রনাথ। ১৯৩১-এর পর ১৯৩৮। 'চৈতালী ঘূর্ণি'র পর 'তাসের দেশ'।"

হাসলেন। পরক্ষণেই বললেন ঃ "বাংলার সাহিত্যিকদের মধ্যে যাঁরা একটু বৈপ্লবিক ধারায় বিশ্বাসী, তাঁদের নিয়ে একটা সঙ্ঘ গড়ে তোলবার আমার ইচ্ছে আছে। তারাশঙ্করকে পাওয়া যাবে?"

"নিশ্চয়।"

আমার কথাটা শুনেই আমার দিকে তাকালেন। সঙ্গে সঙ্গে বললেন ঃ "তারাশঙ্করকে তুমি ভালোবাসো।"

ঘরে ঢুকেই কাগজ কলম নিয়ে বসে গেলেন চিঠি লিখতে। বাংলার হোম-মিনিস্টারকে লিখলেন। ছোট চিঠি। লিখে প্যাডখানা আমার দিকে ঠেলে দিলেন। সেদিনকার হোম-মিনিস্টার ছিলেন স্যার নাজিমুদ্দীন।

লিখেছেন ঃ

"প্রিয় মহাশয়, ভারতরক্ষা বিধানের একটি ধারায় আমাকে বন্দী করে কারাগারে আটকে রাখা হয়েছে প্রায়। চার মাস। এ-বিধান আদালত বা বিচারের ধার ধারে না। এরই সঙ্গে ঐ বিধানের অন্য আর এক ধারায় আমাকে অভিযুক্ত করা হয়েছে। এবং শেষোক্ত অভিযোগে আমি বিচারধীন কয়েদী। দুটোই চলছে একই সঙ্গে। বিনা বিচারে আটক করা এবং একই সঙ্গে আবার বিচার সাপেক্ষ অভিযোগে অভিযুক্ত করা শাসন ও বিচার-বিভাগের এক অভূতপূর্ব নজির সন্দেহ নেই। কিন্তু এ নজির নিশ্চয়ই স্পষ্টত আইন ও নীতিবিরুদ্ধ।

(২) আরও আছে ঃ বিচার-কর্তার নিকট যখন আমার জামিনের জন্যে আবেদন করা হলো, সরকারী উকিল তার বিরোধিতা করে বসলেন। নিশ্চয়ই তা করা হয়েছিলো প্রাদেশিক সরকারের নির্দেশ-ক্রমেই। ফলে জামিন-আবেদন অগ্রাহ্য হলো। বিচারকার্যের ওপর অযথা প্রশাসনিক হস্তক্ষেপ ছাড়া একে আর কী বলা যায়? এবং

এই হস্তক্ষেপ আরও আপত্তিজনক হয়ে ওঠে, যখন ভারতরক্ষা-বিধানের প্রতিপাল্য নির্দেশ মানবার ইচ্ছা প্রাদেশিক সরকারের আদৌ দেখা যায় না।

(৩) বিচারাধীন আমাকে এইভাবে কারাগারে অনির্দিষ্ট কালের জন্যে গায়ের জোরে বন্দী করে রাখা নিশ্চয়ই নীতিবিরুদ্ধ, আইন-বিরুদ্ধ এবং ন্যায়বিরুদ্ধ। বিচারালয়ে আমাকে হাজির করানো হলো এই অভিযোগে যে, আমি ভারতরক্ষা-বিধানের বিরুদ্ধতা করেছি। সঙ্গত হতো বিচারের ফলাফল পর্যন্ত অপেক্ষা করা। তা না করে, সেই একই ভারতরক্ষা-বিধানের বলে বিনা বিচারে আমাকে কারাগারে বন্দী করে রাখা কেমন করে একই সঙ্গে চলতে পারে, তা আমার ধারণা-বহির্ভূত।

(৪) আর এই আশ্চর্য ও বেদনাকর ঘটনা ঘটেছে আমাদের তথাকথিত 'জনপ্রিয়' মন্ত্রীদের আমলেই। এই মন্ত্রীরাই, একজন মুসলমান নাগরিক,—বিশেষ করে সে-নাগরিক যদি মুসলিম লীগের সদস্য হয়, তার সম্পর্কে একই ধরনের অভিযোগে কী প্রকার ব্যবস্থা করেছেন, তা আমি লক্ষ্য করে চলেছি। সরকারের এই মনোভাবের সাক্ষ্যের জন্যে বেশি উদাহরণের প্রয়োজন নেই; ঢাকা জেলার মুড়াপাড়ার মৌলবীর আকস্মিক মুক্তির কথাটা উল্লেখ করলেই যথেষ্ট হবে। এই ধরনের প্রতিটি ঘটনার ওপর আমি লক্ষ্য রাখছি।

(৫) এই সব ঘটনা এবং অন্যান্য বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে সরকারের তরফ থেকে করণীয় হবে আমাকে কালবিলম্ব না করে মুক্তি দেয়া। সম্প্রতি আমি কেন্দ্রীয় এ্যাসেমব্লীর সদস্য নির্বাচিত হয়েছি। ৫ই নবেম্বর থেকে অধিবেশন শুরু হবে। এই অধিবেশনে যাতে আমি যোগদান করতে পারি তার ব্যবস্থা করাও সরকারের পক্ষে সঙ্গত হবে। অবশ্য আমার দেহ সুস্থ থাকা চাই। বার্মার সরকার একজন দণ্ডিত বন্দীকে এ্যাসেমব্লীতে যোগদান করবার অনুমতি দিয়েছেন। যে-কাজ বার্মা-সরকার করতে পারলেন একজন

দণ্ডিত বন্দী সম্পর্কে, সেই কাজ বাংলার 'জনপ্রিয়' মন্ত্রীর পক্ষে করা কি এতই দুঃসাধ্য? বিশেষ করে এমন একজন ব্যক্তি সম্পর্কে, যে আজো দণ্ডিত হয়নি?

(৬) আরো একটা কথা বলবো,—অবশ্য তাই আমার সব কথা নয়; আমার দেহের বর্তমান অবস্থায় এই অনির্দিষ্ট আটক-ব্যবস্থা সরকারের প্রতিশোধমূলক মনোবৃত্তি ছাড়া আর কিছু আমি ভাবতে পারিনে। আর এই মনোবৃত্তি সত্যিই আমার কাছে একান্ত দুর্বোধ্য। আমি এই আশাই করবো যে, সরকার আমার এই পত্রের যথাযথ গুরুত্ব দেবেন এবং এ-কামনাও আমার থাকলো যে, আমার বক্তব্য সরকারের সুবিবেচনা লাভ করবে।

প্রেসিডেন্সী জেল, ভবদীয়

৩০. ১০. ৪০. "শ্রীসুভাষচন্দ্র বসু।"

চিঠিখানা আপাতত শুধু চিঠিই কিন্তু এর ভেতর থেকে ভিন্ন ধরনের একটা গন্ধ আমার নাকে লাগছিল। কয়েকদিন পূর্বে হঠাৎ একদিন নেতা আমাকে বলে বসেছিলেন: "এমন কোন ব্যায়রামের নাম করতে পারো, যা সহসা ডাক্তারে ধরতে পারে না?"

আমি স্যায়াটিকার নাম করেছিলাম। আরও বলেছিলাম যে, প্রাথমিক অবস্থায় এ্যাপেন্‌ডিসাইটিসও ধরা কঠিন।

এর ফলে ঐ দুটো ব্যায়রামের লক্ষণই নেতার দেহে অনতিবিলম্বে প্রকাশ পায়। তলপেটের ডান দিকে অসহ্য ব্যথা আর কোমরের তো কথাই নেই। উঠতে বসতে শুতে সে কী যন্ত্রণা! জেলের ডাক্তার অনেকক্ষণ ধরে টেপাটেপি করেও কিছু বুঝতে পারেননি। খবর দিয়েছেন পাটনিকে। পাটনিও দেখেছিলেন। ওঁর মুখে চোখে চিন্তার রেখা ফুটে উঠেছিল।

এর পর বাইরে লেখা সব চিঠিতেই ওঁর দেহ-যে মোটেই সুস্থ নয়, একথাটা উল্লেখ করতে ভুলতেন না। পেটের ও কোমরের ব্যথার কথাও উল্লেখ করতেন।

নাজিমুদ্দিনের কাছে লেখা চিঠিতেও দেহের বর্তমান অবস্থার উল্লেখ আছে।

একটা-কিছুর আয়োজন চলছে। গতি শম্বুকের কিন্তু নিশ্চিত। প্রকাশ পাবার খুব বেশি দেরী আছে বলেও মনে হয় না। খাদ্যের পরিমাণ আরও কমে গেছে। দেহের ওজন কম দেখাতে হবে। নিজেকে দেখাতে হবে রুগ্ন।

এই একই দিনে জেলের সুপারিনটেনডেন্টকেও লিখলেন আর একখানা চিঠি। "প্রিয় মহাশয়, আমার অবিরাম আটক-জীবন সম্পর্কে আজই স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীকে পত্র দিয়েছি। আমার বর্তমান আটক সম্পর্কীয় হুকুমনামা সরকার প্রত্যাহার না করলে এর পরিণাম কী হতে পারে, সে-বিষয়ে সরকারের স্পষ্ট ধারণা থাকা সঙ্গত। আজকের এই পত্রে আপনাকে আমি এই অনুরোধই জানাবো যে, আমার বক্তব্য অনুগ্রহ করে আপনি যথাসম্ভব সংগোপনে সরকারকে জানিয়ে দেবেন। বন্ধ খামে এ-চিঠি আপনার অফিসে আমি পাঠাচ্ছি। আর কেউ এ-চিঠি পড়ে, এটা আমার অভিপ্রেত নয়। ভয় দেখাবার উদ্দেশ্য নিয়ে এ-চিঠি আমি লিখছিনে ? এবং আমার চিঠির ও-অর্থ করা হবে না বলেই আমি আশা করবো। যে অপরিহার্য পরিণতি এগিয়ে আসছে আমার জীবনে, সেই কথাটা জানিয়ে দেয়াই এ-চিঠির সরল তাৎপর্য।

"স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর কাছে লেখা আমার চিঠির ফলে সরকারের মনোভাবের পরিবর্তন হবে বা আমার সম্পর্কে তাঁরা কিছু করবেন, এ-আশা আমার নেই। গত দুমাস ধরে, তাই, আমার ভবিষ্যৎ কর্ম-পন্থা নিয়ে আমি ভেবে চলেছি। অবিচারের বিরুদ্ধে আমার নৈতিক প্রতিবাদ জানানো ছাড়া আমি আর কী করতে পারি ? আর এই প্রতিবাদকে রূপ দিতে স্বেচ্ছাকৃত অনশন ছাড়া আমার গত্যন্তরও নেই। আমি জানি, আমার অনশন 'জনপ্রিয়' মন্ত্রীদের ওপর কোন প্রভাবই বিস্তার করতে পারবে না। কেননা ঢাকা জেলার মুরাপাড়ার

মৌলবী কিম্বা মুসলমান, এর কোনটাই আমি নই। কাজেই আমার পক্ষে, আমি জানি, আমরণ অনশন ছাড়া গত্যন্তর নেই। এ কথাও আমার জানা যে, আমার মৃত্যু সরকারকে গলাতে পারবে না। এ-বিষয়ে বিন্দুমাত্রও আমার সংশয় নেই। অন্যান্য আমলাতান্ত্রিক সরকারের ন্যায় এই 'জনপ্রিয়' সরকার রাজকীয় মর্যাদার প্রশ্ন তুলবেন এবং সরকারকে অনশনের হুমকি দিয়ে বশ্যতা স্বীকার করানো যায় না, এ-কথাও বলবেন। এই রকম একটা সমস্যা নিয়ে কর্কের মেয়র টেরেন্স্ ম্যাক্স্‌ইনী যখন অনশন করেছিলেন, তখন আমি বিলেতেই ছিলুম। গোটা দেশটা সেদিন বিচলিত হয়ে উঠেছিলো। দল নির্বিশেষে গোটা পারলিয়ামেন্ট, এমন কি স্বয়ং রাজাও অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু অটল ছিলো লয়েড জর্জের সরকার। ফলে রাজা প্রকাশ্যে একথা বলতে বাধ্য হয়েছিলেন যে, মন্ত্রিসভার মতি-গতির জন্যেই তাঁর পক্ষে রাজকীয় ক্ষমতা প্রয়োগ করা সম্ভবপর হলো না। এ-সব কথা আজ পুনরুল্লেখ করছি এই জন্যে যে, বাস্তব অভিজ্ঞতা ও যুক্তির আলোয় সমগ্র বিষয়টি যে আমি যাচাই করেছি এবং বিষয়টি-যে মোটেই আমি লঘু করে ভাবিনি, এই কথাটা আপনাকে ও সরকারকে আমি বোঝাতে চাই।

"সত্যি কথা বলতে কি, এই অনশনের ফলে বাস্তব কিছু ঘটবে এ-আশা আমার আদৌ নেই। সরকারের পক্ষপাত নীতির বিরুদ্ধে আমি আমার নৈতিক প্রতিবাদ জানাতে পেরেছি, এটাই হবে আমার তৃপ্তির কারণ। ইংরেজ ও বৃটিশ সরকার স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের পবিত্র আদর্শ বহন করে চলেছে, একথা প্রচারিত হয়ে আসছে বহুদিন ধরে। কিন্তু তাদের অনুসৃত নীতিই বলে দেবে যে, একথা কতখানি মিথ্যে। নাৎসিবাদ ধ্বংস করতে ওরা আমাদের সাহায্য চায়। কিন্তু নাৎসিবাদের পরিপূর্ণ রূপ ফুটে উঠেছে ওদেরই আচরণে। আমার এই প্রতিবাদ আমার হতভাগ্য দেশের প্রতি তাদের ভণ্ড আচরণের স্বরূপ প্রকাশ করে দেবে এবং আরো প্রকাশ করে দেবে

একটা প্রাদেশিক সরকারের প্রকৃত রীতি ও নীতি, যে-সরকার নিজেকে বোঝাতে চায় 'জনপ্রিয়' বলে। আর একথাও পরিষ্কার হয়ে উঠবে যে, বাস্তবক্ষেত্রে এই সরকারের অচলায়তন নড়ে ওঠে তখুনি যখন কোন বিষয়ে জড়িত থাকে একজন মুসলমান। প্রসঙ্গত আরো একটা কথা বলবোঃ ভারতবাসীর মধ্যে যারা এদেশের সীমার বাইরেও পরিচিত, আমি তাদের মধ্যে একজন। আমার এই অনশন ও তার পরিণতির প্রতিক্রিয়া ভারতের বাইরে দেখা দেবে, একথা ভেবেও আমি অনেকটা তৃপ্তি পাবো।

"একটা কথা ভাববার আছেঃ ব্যাধির চাইতে চিকিৎসা বড় হয়ে উঠবে না তো? অনেকগুলি দিন আর রাত কেটেছে আমার এই কথা ভেবে। এ-প্রশ্নের উত্তরে এই কথাটিই আজ বলবো যে, বর্তমান অবস্থা মেনে নিয়ে বেঁচে থাকা আমার পক্ষে অসহ্য হয়ে উঠেছে। জগৎ নশ্বর। সবই নিঃশেষ হয়ে যাবে একদিন। কিন্তু নিঃশেষ হবে না আদর্শ। এই আদর্শের জন্যেই কেউ কেউ জীবন আহুতি দেয়। দিতে দ্বিধামাত্র করে না। আর এই আত্মোৎসর্গের ওপর অবিনশ্বর হয়ে টিকে থাকে আদর্শ। ব্যক্তি-বিশেষ নিজেকে বলি দেয় আদর্শের অম্লান পাদমূলে। মৃত্যুহীন আদর্শ রূপান্তরিত হয়ে ফুটে ওঠে অন্য আর একজনের জীবনে। ব্যক্তি হয়ে ওঠে জাতির প্রতিনিধি। ন্যাস। ব্যক্তির মহান দুঃখবরণ সার্থক হয়ে ওঠে। হয়ে ওঠে অনবদ্য। দেহ জন্ম দেয় দেহ। ঠিক তেমনি জীবন-বহ্নি জ্বালিয়ে দেয় নব-জীবনের মশালবর্তিকা। এই সত্যের পরিপ্রেক্ষিতে আমি এই কথাই বলবো যে, সত্যিই যদি আমার সাধনার কোন মূল্য থাকে, আমার দেশ অথবা বৃহত্তর মানবতা কণামাত্রও ক্ষতিগ্রস্ত হবে না আমার মৃত্যুতে। বরং ভগবানের করুণায় দেশ ও মানবজাতি হয়তো উন্নতর ও সুন্দরতর হয়ে উঠবে। অন্যের জীবন নাশ করে নয়, নিজের জীবনের বিনিময়ে। স্বেচ্ছাকৃত অবলুপ্তিই-না পরমত্যাগ।

"শেষ করবার আগে আর একটা কথা বলবো। জীবনের

অনেকগুলি দিন আমার কেটেছে বন্দিশালায়। এবং এর পূর্বেও আমাকে অনশন করতে হয়েছে। অনশনের উদ্দেশ্য ভণ্ডুল করতে কেমন করে কোন-কোন অতিভক্ত সরকারী কর্মচারী তৎপর হয়ে ওঠে, তা আমাদের জানা আছে। আগে থেকেই, তাই, আমাকে সতর্ক থাকতে হবে। তাছাড়া, জবরদস্তি খাওয়ানো আমি বরদাস্ত করবো না। জোর করে আমাকে খাওয়াবার অধিকার কারো নেই। টেরেন্স্ ম্যাক্স্যুইনীর অনশনের সময় বৃটিশ-মন্ত্রিসভার সঙ্গে এবং ১৯২৬এ আমাদের অনশনের বেলায় ভারত-সরকারের সঙ্গে এ-প্রশ্নের সম্যক আলোচনা হয়ে গেছে। কারাবিধির কোন ধারা বা সরকারী কোন নির্দেশ যদি থেকেই থাকে, আমার ওপর তা কোনো প্রভাব বিস্তার করতে পারবে না, এ-কথাটা বলে রাখা ভালো।

"আবারও আমি বলবো যে, পবিত্র শ্যামাপূজোর দিনে লেখা আমার এই চিঠি যেন হুমকি অথবা চরমপত্র হিসেবে গ্রহণ করা না হয়। মানব-জীবনের মৌলধর্মের এটা ঘোষণা মাত্র। আর তা আমি একান্ত বিনীত ভাবেই আপনাকে জানাতে চাই। এই কারণেই আমি আশা করবো যে, আপনি এই চিঠিখানাকে গোপন দলিল মনে করে সরকারের নিকট পাঠিয়ে দেবেন। আমার অভিপ্রায় সরকারকে জানানোই আমার ইচ্ছা। আমার অনশনের উদ্দেশ্য এবং তার পরিপ্রেক্ষিতে সরকারের অবলম্বিত পথের প্রতিক্রিয়া আমার মনে কী ভাব সৃষ্টি করবে, সে-সম্পর্কে সরকারের ধারণা থাকা সঙ্গত।

"পূর্বাপর আপনি যে-সৌজন্য দেখিয়ে আসছেন, তার জন্যে আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

প্রেসিডেন্সী জেল,
কলিকাতা, ৩০. ১০. ৪০

ভবদীয়
শ্রীসুভাষচন্দ্র বসু"

কালো একখানা মেঘ ছুটে আসছে পশ্চিম আকাশে। কখন কালবোশেখী ছুটে আসবে, জানা নেই। কিন্তু ও আসবে। ওর আগমনী শঙ্খ বেজে উঠেছে।

দুপুরবেলা খাবার পর নেতার ঘরে বসে আমার লেখা জবানবন্দি ওঁকে শোনাচ্ছিলাম। বার বার রাজদ্রোহের অপরাধে আমাকে কারাদণ্ড ভোগ করতে হয়েছে। প্রতিবারই লক্ষ্য করেছি, আসামী-পক্ষের উকিল একই ধরনের যুক্তি খাড়া করেন। অর্থাৎ অভিযুক্ত ব্যক্তির কথা রাজদ্রোহ-ধারার আওতায় পড়ে না, শাসনপদ্ধতির সমালোচনা করবার অধিকার সর্বজনস্বীকৃত, রাজদ্রোহ হয়নি,—ইত্যাদি।

আমি এ-সবের ধারকাছ দিয়েও যাইনি। রিপোর্টার বর্ণিত বক্তৃতা-যে আমিই দিয়েছি, তা প্রমাণ করবার দায়িত্ব পুলিশের, বাদীপক্ষের ;—আমার নয়। রিপোর্টারই বাদীপক্ষের একমাত্র সাক্ষী। একথাও আমি বলেছিলাম যে, রিপোর্টারকে সাক্ষী হিসেবে নির্ভর করা সঙ্গত হবে না। কারণ তার রিপোর্টই যখন মোকদ্দমার মূল এবং একমাত্র বিষয়বস্তু, তখন রিপোর্টারও বাদীপক্ষের সামিল বলে গণ্য হওয়া সঙ্গত। অতএব আমার বিরুদ্ধে আনিত অভিযোগ আদৌ প্রমাণিত হয়নি, ইত্যাদি।

পূর্বে এ-শ্রেণীর মামলায় এ-ভাবের যুক্তি কেউ দেখায়নি। আমার জবানবন্দি শুনে নেতা প্রশংসায় উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন। বললেন : "আর, গুপ্ত যদি বিবেক বিসর্জন না দেন, তোমাকে ছেড়ে দিতেই হবে। যদি তাই হয়—," কথা শেষ হল না, সহসা থেমে গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে বেশ আনমনাও হয়ে পড়লেন। দৃষ্টি চলে গেল বাইরে। তাকিয়ে থাকলেন অনেকক্ষণ।

সন্ধ্যার নীল ছায়া ছড়িয়ে পড়েছে। সেই ঘনায়মান নিভৃত সন্ধ্যার নিরালা দালানে দুজন ছিলাম বসে। একটু আগে বেড়াতে গিয়েছিলাম। একটা কথা কয়েকদিন হল বলি-বলি করেও বলা

হয়নি। বললাম ঃ "আচ্ছা, সবরমতীর ওপর রাগের কারণটা বুঝি, কিন্তু পণ্ডিচারী দোষটা করলো কী ?" (১৯২৮এ কলকাতার যুব-কংগ্রেসের অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতির ভাষণে নেতা বলেছিলেন যে, সবরমতী আর পণ্ডিচারীর দিন শেষ হয়ে গেছে।)

হেসে উঠলেন নেতা। একটু বাদে বললেন ঃ "তখন কিন্তু সত্যিই রাগ হয়েছিলো। দিলীপকে ভালোবাসতুম শুধু নয়, ওকে নিয়ে অনেক প্ল্যানও করেছিলুম। প্রত্যক্ষ রাজনীতি ওর ধাতে সইবে না, এটা জানতুম। ওর স্বভাব গান-বাজনা, কাব্য-নাটক, এই সব নিয়ে থাকা। ওই নিয়েই কী করে ও দেশের কাজে লাগবে, তাই ভাবতুম। স্থিরও করেছিলুম। একটা চারণদল গড়বো, দিলীপ সেটা চালাবে। গান গেয়ে, নাটক করে দেশের লোকের মধ্যে আগুন ছড়াবে। এই ছিলো আমার প্ল্যান। সব ভেস্তে দিলেন ঐ পণ্ডিচারীর ঠাকুরটি। তাই তো রাগ হলো।"

আমি বললাম ঃ "তা এবার বেরিয়ে একবার ডেকে দেখুন না।"

"আর হয় না। ও এখন যোগটোগ না কী সব করছে। তাছাড়া, ওর জন্যে আমার খুব দুঃখও হয়। ও বড্ড মায়ার ভিখিরী। সত্যি করে ভালোবাসে এমন লোক বড্ড কম। ভালোবাসা ও চায় কিন্তু পায় না।"

দিলীপবাবুকে (রায়) আমি জানি। এবং চিনিও। নেতা ওঁকে আন্তরিক ভালবাসেন, একথাও জানি। সেদিন আমিও ওঁর কম গুণমুগ্ধ ছিলাম না। প্রথম দেখি সিরাজগঞ্জ কনফারেন্সে। ১৯২৪-এ। তারপর বহু স্থানে।

দিলীপবাবু নেতার ছাত্রজীবনের বন্ধু, একথাও জানি। এত জানি,—আরও অনেক কথা জানি। তাই তো দুঃখ হয় অনেক সময় নেতার কথা ভাবতে ভাবতে। তাঁর বন্ধু-ভাগ্য নিয়েও কম আশ্চর্য হয়ে ভাবি না। একদা এঁরা ছিলেন অন্তরঙ্গ। নেতার অতি প্রিয়জন। এই বন্ধুরা তাঁর প্রতি যে এবং যা অবিচার করেছে, প্রকৃত শত্রুও তার চাইতে বেশি-কিছু করতে পারেনি।

১৯৪৬-এ দিলীপবাবু নেতার জীবন নিয়ে বই লেখেন, 'দি সুভাষ আই নিউ।' কত বড় আগ্রহ নিয়ে ঐ বই পড়তে গিয়েছিলাম। আজও আমার বেশ স্পষ্ট মনে পড়ে, পড়তে পড়তে বইখানা ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিলাম। বইখানা নোংরা। জঘন্য।

ইংরেজ ও জহরলালের কথার সঙ্গে চমৎকার মিল রয়েছে দিলীপবাবুর। সর্বাগ্রে সেদিন মনে জেগেছিল এই একটি প্রশ্নই ঃ ইংরেজ ও জহরলালের সঙ্গে কি এ বইয়ের কোন সম্পর্কই নেই? বইখানার পেছন থেকে ইংরেজের ইঙ্গিত প্রকট হয়ে ওঠে।

দিলীপবাবু রাজনীতির কারবারী নন। কী দরকার ছিল ও নিয়ে মাথা ঘামাবার? যা জানেন না, বোঝেন না, সেটা না-হয় নাই বলতেন। সাত তাড়াতাড়ি ১৯৪৬-এ—ইংরেজ তখনও ভারত ছেড়ে যায়নি,—নেতাজির সংগ্রাম, নেতাজির আজাদ-হিন্দ বাহিনীর পরিকল্পনা নাই বা আলোচনা করতেন। অনেকে আরও অনেক বেশি জেনেও সেদিন তা করেনি। তিনিই বা অকস্মাৎ অতখানি উৎসাহী হয়ে উঠলেন কেন?

তারপর জহরলাল। ১৯৪৬-এর খুব দূরে ১৯৪৭ নয়। দিলীপবাবু তো অনেক পোড়-খাওয়া মানুষ,—অনেক হাবাগোবারও সেদিন অজ্ঞাত ছিল না যে, ভবিষ্যৎ ভারত-ভাগ্য-বিধাতা কে হবে। দিলীপবাবুও জানতেন। তাই জহরলাল-প্রশস্তি গিয়ে পৌঁছেছে প্রায় চাটুকারিতায়। অবশ্য ফলও ফলেছে। আমেরিকা যাবার রসদ এই জহরলালের সুপারিশেই সম্ভবপর হয়েছিল।

তবু দিলীপবাবুকে মনে-প্রাণে ধন্যবাদ জানাব এই কারণে যে, অন্তত শেষকালে তাঁর অনুতাপ জেগেছে। পরবর্তীকালে 'স্মৃতি চারণ' তিনি প্রায়শ্চিত্ত করেছেন। তখন ইংরেজ চলেও গিয়েছে।

১৯৪৬-এ তাঁর মুখের কথা শুনেছিলাম। আবার শুনলাম ১৯৬৪-তে। মনে জাগল শুধু একটি কথাই ঃ পারিপার্শ্বিকের কাছে মানুষ সত্যি কত অসহায়। সেদিন সুভাষের মৃত্যু-সংবাদে দিলীপবাবুর

দুর্ভাবনা কেটে গেয়েছিল। একজন সহিদ হবার সুযোগ-যে সুভাষ তাঁর জীবনে পেয়ে গেলেন, এতে দিলীপবাবু আশ্বস্তও হয়েছিলেন। আজাদ-হিন্দ-বাহিনী নিয়ে তিনি ভারতে এলে দিলীপবাবু কোথায় যাবেন, এ দুশ্চিন্তাও দিলীপবাবুর কম ছিল না।

১৯৪৬-এ যে-দিলীপবাবু জহরলালের পাশে দাঁড়িয়ে তরবারীর সাহায্যে সুভাষ ও জাতীয় বাহিনীকে রুখতে দৃঢ়সঙ্কল্প হয়েছিলেন, সেই দিলীপবাবুরই ১৯৬৪-তে সুভাষের পরাজয়ে চোখ ভরে দেখা দিল অশ্রু। অঘটন আজও ঘটে বইকি।

টোয় সাহেব (Hugh Toy—এঁরই লেখা 'স্প্রিংইং টাইগার') ইংরেজ হয়ে সুভাষকে বুঝতে পারেননি বলে দিলীপবাবু তাঁর সমালোচনা করেছেন, দুঃখও পেয়েছেন। "জাপানীরা তাকে (সুভাষকে) সে-সাহায্য করতে পারেনি যা করবে বলে তারা কথা দিয়েছিল। যদি সুভাষ সে-সাহায্য পেত তবে ভারতের স্বাধীনতা লাভ হত হয়তো অন্য উপায়ে।...সুভাষ যদি সে সময়ে ইম্ফাল অধিকার করত—প্রায় করেছিল এ-কথা ইংরাজরাও মানেন—তাহলে সুভাষের সামরিক প্রতিভা হিউ টোয় সাহেবের চোখে সম্পূর্ণ অন্য রঙে প্রতিভাত হত, তিনি বলতেন না তাকে দাম্ভিক বা হটকারী।" (স্মৃতি-চারণ)

এর পাশে যখন দেখি দিলীপবাবু নিজেই লিখছেন : "শানওয়াজের সে-বক্তৃতা আমার বেশ মনে আছে। ১৯৪৬-এ সুভাষের জন্মদিন (২৩ জানুয়ারি) তিনি বলে চলেছেন,—'নেতাজি একদিন বলছিলেন যে, ইংরেজ এমন বোমা আজও তৈরী করতে পারেনি, যা তাকে আঘাত করতে পারে।' কথাটা শুনে সভার জনতা হর্ষে ফেটে পড়েছিল। কিন্তু আমি ভয়ানক দুঃখ পেয়েছিলাম। সুভাষের এই অহংসর্বস্ব গর্বোদ্ধত কথাগুলো শানওয়াজ না বললেও পারতেন। সুভাষ হয়তো অসতর্ক মুহূর্তে কথাটা বলে ফেলেছে। হয়তো মেজাজটাও তার বিগড়ে ছিল।" (দি সুভাষ আই নিউ, ৯৫ পৃ.)

আবার,—"জহরলালের সঙ্গে একমত হয়ে আজ একথা আমরা বলতে বাধ্য যে, সেদিন জাপানের সাহায্যপুষ্ট আই. এন. এ. যদি সত্যিই ইংরেজকে উৎখাত করতই, ভারতের দুর্ভাগ্যের সীমা থাকত না।" (দি সুভাষ আই নিউ, ১৮৬ পৃ.)

আবারও,—"ইংরেজের প্রতি বিদ্বেষে অন্ধ মানুষ ছাড়া আর সবাই স্পষ্টই দেখতে পেয়েছিল যে, যদি সেদিন সুভাষ তার হটকারী পরিকল্পনা সার্থক করে তুলতে সমর্থ হত, ভারতবর্ষকে এক চরম বিপর্যয়ের সম্মুখীন হতে হত।" (দি সুভাষ আই নিউ, ১৮৭ পৃ.)

আর না। দিলীপবাবু আমার নেতার বন্ধু। তাঁর প্রতি আমারও আকর্ষণ কম নয়। হয়তো অসতর্ক মুহূর্তেই দিলীপবাবু বইখানা লিখে থাকবেন। তাছাড়া সব সময় সব প্রভাব অস্বীকার করাও কঠিন। দিলীপবাবু 'স্বধর্ম' নিষ্ঠ। তাঁর 'স্বধর্ম' তিনি মেনে চলবেনই।

আমার জবানবন্দি দেয়া হয়ে গেছে। রায়ের দিন পড়েছে ২৮শে নভেম্বর। মনের চাঞ্চল্য থেমে গেছে। দণ্ড হবেই, একথা মন বলছে! সবাইকে ছেড়ে দিয়ে শুধু শুধু আমাকে সুভাষ-সঙ্গী করে জেলখানায় ওরা আটকে রাখেনি।

দুপুরবেলা খেতে বসে হঠাৎ বলে বসলেন: "পায়েস খেতে ইচ্ছে হচ্ছে। আজই রাঁধো। সেই ছানার পায়েস।" (প্রথম খণ্ডে বলা হয়েছে।)

অনেকটা দুধ ছিল। খানিকটা দিয়ে করলাম ছানা। বাকিটায় হবে পায়েস। একটা স্পিরিট ল্যাম্প ছিল নেতার। সেইটাই সম্বল। সারাদিন ধরে চলল আমার রান্না। সন্ধ্যের আগে চিনি চাইলাম। বললেন: "অনেক চিনি আছে। দাঁড়াও, দিচ্ছি।"

তিনটে সিগারেটের কৌটো এনে দিলেন। মনের আনন্দে পায়েস রান্না হল।

বিকেলে বেড়াতে বেড়াতে সহসা বলে বসলেন : "যদি বাইরে যেতে হয়, যেতে পারবে ?"

"বাইরে মানে ?"

"বাইরে মানে, জেলখানার বাইরে নয়, দেশের বাইরে। পারবে ?"

সমস্ত দেহের ভেতর দিয়ে একটা বিদ্যুতের প্রবাহ বয়ে গেল। সবই যেন প্রত্যক্ষ হয়ে উঠছে। সেদিন বলতে বলতে থেমে গেলেন। বলতে গিয়েছিলেন যে, যদি আমাকে ছেড়েই দেয়,— আর বলেননি ! চিন্তায় ডুবে গিয়েছিলেন।

একটুও দেরি না করে আমি জবাব দিলাম : "নিশ্চয়ই পারবো।"

"সংসার, স্ত্রী-পুত্র বাধা দেবে না ?"

"হয়তো দেবে। কিন্তু মানবো কেন ?

"বর্তমান, ভবিষ্যৎ সবই হয়তো তলিয়ে যাবে, ভয় পাবে না ?"

"ভয় ? না। আর বর্তমান যেতে পারে, ভবিষ্যৎ যাবে কেন ?"

"শোনো।"

বলে চললেন। এই জেলে পচে মরবার কোন মানে হয় না। ভাগ্যের এক অপূর্ব সুযোগ দেশের সম্মুখে দেখা দিয়েছে। কদাচিৎই পরাধীন দেশের ভাগ্যে এমন সুযোগ দেখা দেয়। দেখা দিয়েছিল আর একবার। সেই ১৯১৪ সালে! সে সুযোগ গ্রহণ করতে এগিয়ে এসেছিলেন মহাপ্রাণ যতীন্দ্রনাথ, রাসবিহারীরা। পারেননি তাঁরা !

এ-সুযোগ গ্রহণ করতেই হবে। ওঁর মুক্তির পথে বাধা অনেক। হলেও হয়তো দেরি হবে। নেতার মনে একটা ক্ষীণ আশা দেখা দিয়েছিল। আমার জবানবন্দি শুনে ওঁর মনে সে-আশা জেগেছিল। হয়তো ছাড়া পেলেও পেতে পারি। যদি পাই,—এ সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে হবে। এ-পথে বিপদ আছে, আপদেরও অন্ত নেই। তবু বসে থাকলেও তো চলবে না। যেতে হবে এগিয়ে। সর্বস্ব

বাজি রেখে যেতে হবে। পেছনে না চেয়ে যেতে হবে। ফেরবার পথ নেই জেনে যেতে হবে।

বললেন : "হয়তো পেছন পেছন আমিও যাবো। কিন্তু তোমাকে যদি ছেড়েই দেয়, আগে যাবে তুমি। আমার কেউ নেই। তোমার আছে অনেক। ছেলে-মেয়ে আছে। স্ত্রী আছেন। তাঁদের ব্যবস্থা করে আমি যাবো।"

আমার দম বন্ধ হয়ে আসছিল। এ কী অসামান্য প্রাপ্তি। সংসার, মাতা-পিতা, স্ত্রী-পুত্র কোন কথাই মনে জাগল না। শুধু এই একটি কথাই সমস্ত অন্তর কানায় কানায় পূর্ণ করে দিল যে, এত বড় কাজের ভার পেলাম। যোগ্য বলে নেতা মনে করলেন। এমন একটা আকস্মিক বিস্ফারতা, সকলকে ছাপিয়ে এমন একটা বিশেষ গৌরব, নিজের সত্তার এমন একটা বিশিষ্ট স্বাতন্ত্র্য অনুভব করতে লাগলাম যে, মনের যাবতীয় বৃত্তি অতি অকস্মাৎ নিতান্তই ক্ষুদ্র বোধ হতে লাগল।

ফেরবার সময় হলো। ফিরে চললাম। ওপরে গিয়ে বসতে না বসতেই বললেন : "আজ নয়, অনেকদিন ধরে আমি সুযোগ খুঁজছি। এর আগেও যাবার সব ব্যবস্থাই প্রায় হয়ে গিয়েছিলো। এক্কেবারে শেষটায় মনে সন্দেহ জাগলো ; হয়তো ওরা কিছু টের পেয়ে থাকবে। যাওয়া হলো না।"

একটু একটু আমিও জানতাম। নিজের যাওয়া যখন হলোই না, দলের একজনকে পাঠাতে চেয়েছিলেন। শেষ মুহূর্তে সে বেঁকে বসল। ভয় পেল।

যথারীতি স্নান হলো, রেডিও শোনাও হলো। বসলাম দুজনে খেতে। দালানে। টেব্‌লের দুধারে দুজন। মুখোমুখী। পায়েসের বাটি টেনে নিলেন। চামচে করে তুলে মুখে দিয়েই থু-থু করে ফেলে দিলেন। হকচকিয়ে গেলাম। কী হলো ?

"তেতো। শাপের বিষ।"

"শাপের বিষ!" দিলাম তাড়াতাড়ি খানিকটা মুখে ঢুকিয়ে। তাই তো। এ যে পায়সের বদলে কুইনিন রান্না করেছি। ছুটে গেলাম ঘরের ভেতর। নিয়ে এলাম একটা কৌটো। তখনও ওটায় একটু ছিল। তুলে দিলাম মুখে। চিনি নয়,—নুন।

ফালতু শ্রীমান যতীনের এই জাজ্বল্যমান সততার পরিচয়ে আমরা মুগ্ধ হয়ে গেলাম।

সেদিন আর কোন কথা হল না। দালানে একটু ছাড়াছাড়ি হয়ে দুজনে বসে থাকলাম। বসে থাকলাম চুপচাপ। অকস্মাৎ যেন কথা ফুরিয়ে গেল। ভেতরে ঝড় বইছে।

সামনে মাত্র পনেরটা দিন। তারপর?

যদি যাওয়া হয়,—এই শেষ দেখা।

যদি সাজা হয়,—এ-জেলে ওরা রাখবে না।

তারপর? কবে দেখা হবে? হবে কি আর?

সকাল বেলা থেকেই নেতার পেটের ও কোমরের ব্যথা অত্যন্ত হঠাৎ বেড়ে উঠল। সইতে পারছেন না এমনি ভাব। বাইরের দরজা খোলবার আওয়াজ পেয়েই বিছানায় শুয়ে পড়লেন। ছটফট করছেন।

ডাক্তার এলেন। নেতার অবস্থা দেখে বেচারা ভয় পেয়ে গেছেন। ছুটে গেলেন ডাক্তারখানায়। একটু বাদে এসে একটা প্লাষ্টার পেটের ওপর বসিয়ে দিলেন। ডাক্তার চলে যেতেই গরম জলে ভিজেয়ে ওটা তুলে দিলাম। নেতা বসলেন চিঠি লিখতে। জেল সুপারকে লিখলেন:

"প্রিয় মহাশয়, কালীপূজার দিন, গত ৩০শে অক্টোবর, আমি আপনাকে যে-গোপনীয় পত্র লিখেছিলাম, আশা করি আপনি তা সরকারে পেশ করেছেন। আজকের এই চিঠি সেই চিঠিরই জের। ঐ একই তারিখে মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীকে লেখা আমার চিঠির সঙ্গে এই দুখানা চিঠি পড়লেই বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

"(২) আপনাকে চিঠি লেখবার পর কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা-পরিষদে পণ্ডিত লক্ষ্মীকান্ত মৈত্র, এম. এল. এ, মুলতুবী প্রস্তাব উত্থাপন করেছিলেন। জবাবে কেন্দ্রীয়-সরকার স্পষ্ট করে বলেছেন যে, আমাকে বন্দী করা এবং দণ্ড দেবার সম্পূর্ণ দায়িত্ব বঙ্গীয় সরকারের, যে-সরকার দাবী করে যে, তার পরিচালনা চলে 'জনপ্রিয়' মন্ত্রিমণ্ডলী মারফত। এ-কথাও আজ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, আমার প্রতি এই 'জনপ্রিয়' সরকারের আচরণ শুধু অদ্ভুতই নয়, পরন্তু অভূতপূর্বও। আর এ-কথাও স্পষ্ট হলো যে, এই সরকার ভারত-রক্ষা বিধানের আওতায়-পড়া মামলা সম্পর্কে ভারত-সরকারের অনুজ্ঞা কী করে এবং কতখানি লঙ্ঘন করতে পারে। এ-কথা ভেবে আমি ব্যথিত যে, এই 'জনপ্রিয়' সরকার ভারতবর্ষের প্রতিরক্ষার জন্যে আদৌ এই বিধানের শরণাপন্ন হয়নি, হয়েছে এমন একটা দুষ্কর্ম ঢাকতে, যা শুধু আইন-বিরুদ্ধ নয়, অধিকন্তু ন্যায়-বিরুদ্ধও।

"(৩) গত কাল আমার উকিলরা জামিনের জন্য আবেদন করেছিলেন। বিচারক তা মঞ্জুরও করেছিলেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এ মন্তব্যও তিনি করতে বাধ্য হয়েছিলেন যে, তাঁর মঞ্জুর-করা জামিনের প্রকৃত কার্যকারিতার অবকাশ এ-ক্ষেত্রে নেই, কেননা সরকার সুনির্দিষ্ট অভিযোগ ছাড়াও ভারত-রক্ষা বিধানের অন্য ধারা প্রয়োগ করেছেন আমাকে বিনা বিচারে আটক রাখতে। বিচার বিভাগীয় সিদ্ধান্তের ওপর শাসন বিভাগের এই হস্তক্ষেপের সমতুল নগ্ন অবিচার আমার ধারণাতীত। আমি অবাক বিস্ময়ে একটা কথাই ভাবছি,—ভারতরক্ষা-বিধান কি ভারতবর্ষের প্রতিরক্ষার উদ্দেশ্যে অথবা এই প্রকার ন্যায় ও নীতি বিগর্হিত আচরণ সমর্থনের জন্যে প্রবর্তিত হয়েছিলো ?

"(৪) বিলেতে ভারত-বিভাগীয় মন্ত্রীকে (সেক্রেটারী অব স্টেট ফর ইণ্ডিয়া) আমার গ্রেপ্তার এবং আটকের কারণ বলতে গিয়ে অসত্য তথ্য পরিবেশন করে এই সরকার আমার প্রতি যে অবিচার করেছেন, তার জন্যে আমি দুঃখিত। মিঃ সোরেনসেনের প্রশ্নের জবাবে

মন্ত্রীমশাই হাউস অফ কমন্সে একথা বলেছেন যে, হলোওয়েল মনুমেণ্ট অপসরণ-আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে আমাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। যদি প্রকৃত সত্য কথা বলা হতো, এ সম্পর্কে বিলেতে আরও অনেক কিছুই আলোচনা হতে পারতো। কেননা পার্লিয়ামেণ্টে এবং ও-দেশের সাধারণ মানুষের মধ্যে আমার বন্ধু আছেন অনেকে।

"(৫) আমার বৈধ অধিকারের সম্ভ্রম রক্ষার জন্যে আমার সম্মুখে একটিমাত্র পথই উন্মুক্ত আছে। নৈতিক প্রতিবাদ জানিয়েই আজ আমাকে সন্তুষ্ট থাকতে হবে, কারণ বাংলার 'জয়প্রিয়' সরকার আর সব পথই রুদ্ধ করে দিয়েছে। কালীপূজোর দিনে আমি যে-সঙ্কল্প গ্রহণ করেছি, তার এবং আমার প্রতি বাংলা সরকারের আচরণের পরিণতি হিসেবে অদূর ভবিষ্যতে অনশন ছাড়া আমার গত্যন্তর নেই। গত ৩০শে অক্টোবরের চিঠিতে আপনাকে একথা আমি জানিয়েছি। অনশনের নির্ধারিত দিন আমি পরে সরকারকে প্রথানুযায়ী জানাবো। তবে তা জানাবো অনশন শুরু করবার অব্যবহিত পূর্বে। সরকারের অবগতির জন্য আমার ৩০শে তারিখের পত্রই যথেষ্ট।

"একান্ত বিশ্বাসভরেই আপনাকে আজ এই চিঠি লিখছি। আশা করি আপনিও সেই চিঠিখানা গ্রহণ করবেন। এবং এইভাবেই যথাসম্ভব শীঘ্র সরকার সমীপে পাঠিয়েও দেবেন।

প্রেসিডেন্সী জেল
১৪. ১১. ৪০

ভবদীয়
শ্রীসুভাষচন্দ্র বসু"

নিখুঁত পরিকল্পনা রূপায়িত হয়ে চলেছে একের পর আর। কোনদিকে যেন ফাঁক না থাকে। কেউ যেন না বলতে পারে যে, সুভাষ বোস নিয়মতান্ত্রিক পথে কোন চেষ্টাই করেননি। অভিজ্ঞ উকিল যেন লিখছে চিঠিগুলো। অকাট্য যুক্তি, শ্লেষ, পরোক্ষ ভীতিপ্রদর্শন, কোনটারই ত্রুটি নেই।

অন্যদিকে চলেছে সত্যাগ্রহের প্রবল আয়োজন। নিরোগ দেহ অপটু, রুগ্ন, আর অচল করে দেখাতে যা এবং যতকিছু করা প্রয়োজন, তাও বাকি রাখলে চলবে না। অভিনয় চালাতে হবে নিপুণ ভাবে। প্রাগমাটিস্ট সুভাষ বোসের কাছে দেশ আর তার আসন্ন মুক্তি-চিন্তাই একমাত্র এবং অবিসংবাদী সত্য। আর সব মিথ্যা।

লোকে তাঁকে ভুল বুঝুক। ইতিহাস তাঁকে মিথ্যাচারী বলুক। সাধু আর সন্তরা তাঁকে প্রতারক ভাবুক। তাঁর দেবতা আর ইষ্ট, তাঁর মা আর মাতৃভূমি দুখানি ব্যাগ্র-ব্যাকুল বাহু বাড়িয়ে তাঁকে ডাকছে অহরহ। ডাকছে ঘুমে। ডাকছে জাগরণে। ব্যক্তির খেয়াল ও খুশি, ভালো আর মন্দ, তৃষ্ণা আর বিতৃষ্ণা ডুবে যাক অতল জলে। সুভাষ বোসকে চলতেই হবে। চলতে হবে দুর্গম-গিরি-কান্তার-মরু ডিঙিয়ে।

প্রিয়তমের জন্য কাদামাখা,—তার বাড়া গর্ব আছে? আর আনন্দ?

সকালবেলাই এসে পড়লেন দাদা ডাঃ সুনীল বোস। পাটনিই কর্তৃপক্ষের অনুমতি নিয়ে খবর পাঠিয়েছিলেন। অনেকক্ষণ ধরে পরীক্ষা চলল। ব্লাডপ্রেসার নেয়া হল। তারপরই শুরু হল ইন্‌জেক্‌শ্যন। মস্তবড় সিরিন্‌জ্‌। হাতের রগ ফুঁড়ে ডাক্তার বসিয়ে দিলেন। হাত টান করে শুয়ে থাকলেন নেতা। গ্লুগোজ ইন্‌জেক্‌শ্যন।

ডাক্তার যাবার প্রাক্কালে পাটনিকে শুনিয়ে গেলেন যে, অপারেশ্যন করতেই হবে, তবে দেহের বর্তমান অবস্থায় ওটা চলবে না। অপারেশ্যনের পূর্বে ওর ধাক্কা সামলাবার উপযোগী করে তুলতে হবে সর্বাগ্রে দেহ। তারপর অপারেশ্যন। মাথা নেড়ে সায় দিলেন পাটনি। জেলের ডাক্তার জানালেন যে, তিনি একথা অনেক আগেই বলেছেন।

বিকেলে আমাদের দুজনেরই ছিল ইনটারভিউ। ওঁর আগে। তারপর আমার। আমি ইনটারভিউ শেষ করে ফিরে আসতেই বললেন : " সেবার বয়েস হলো কত ?"

"বারো।" বললাম আমি। আমার বড় মেয়ের নাম সেবা।

"বিয়ে-টিয়ে এখন নয়। ঝঞ্ঝাট সব মিটিয়ে ওদের বিয়ে দেবো। ওদের সম্প্রদান করবো আমি নিজে।"

আর সইতে পারলাম না। উদ্গত অশ্রু ঝরে পড়বার আগেই ছুটে নিজের ঘরে গিয়ে ঢুকলাম। সারা জীবনেও তো এ-সব কথা ভুলতে পারব না। এই স্নেহ, এই মমতার বোঝা-যে কত বড় বোঝা, তা তো সে বোঝে না, যে বোঝা চাপিয়ে দেয়।

নিজের নেই, পরের মেয়ের বিয়ের ভাবনা ভাবছেন প্রাণ ভরে। আর ওদিকে বহ্নি-বন্যা জ্বালিয়ে দিয়েছেন মনের দুরন্ত উন্মাদনায়। ঝাঁপ দেয়া বাকি শুধু।

নিজেকে সংবরণ করে ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম। দেখি দালান শূন্য। ঘরে বসে এক মনে চিঠি লিখছেন।

খানিক বাদেই বেরিয়ে এলেন। বসলেন দালানে। আমার মুখোমুখী। একটুক্ষণ চুপ করে থেকেই বলে উঠলেন : "আমাদের দুর্ভাগ্যের বুঝি অন্ত নেই। গোটা-কয়েক নাম-করা দল থাকতেও কেউ বুঝলো না যে, আজই ইংরেজকে ঘায়েল করবার সুবর্ণ সুযোগ।"

সত্যিই বুঝল না। বুঝবেও না। বোঝবার উপাদানই কি আছে ? এ এক মর্মান্তিক অভিশাপের ফল। আর এ ফল ভুগছে এদেশ হাজার বছর ধরে।

গান্ধীর অবদানকে তুচ্ছ না করে বা তাচ্ছিল্যও না দেখিয়ে নির্বিঘ্নে একথা বলা চলে যে, দেশের ক্ষাত্র-শক্তিকে তিনি ধ্বংস করেছেন। প্রথম মহাযুদ্ধের প্রারম্ভিক অবস্থায় আজকের তুলনায় কত সামান্যই-না ছিল বিপ্লবী মনোভাব আর তার আয়োজন। তবু সেদিন ইংরেজের সেই দুর্দিনের সুযোগ নেবার অভীপ্সা দেখা দিতে কালবিলম্ব

করেনি। নায়ক যতীন্দ্রনাথ আর রাসবিহারী অতি সামান্য সঙ্গতি আর ততোধিক সামান্য উপাদান সম্বল করে সেই সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে এগিয়ে এসেছিলেন। এগিয়ে এসেছিল মহারাষ্ট্র আর পাঞ্জাবের বেপরোয়া কয়েকটি আগুনের স্ফুলিঙ্গ। সেদিন তাঁরা পাঁজি খুলে দিনক্ষণ দেখেননি, কেতাবের উচ্চাঙ্গ বাণীর সঙ্গে তাঁদের কৃতকর্ম কতখানি খাপ খাবে, আদৌ খাবে কি না, সে হিসেবও তাঁদের মস্তিষ্কে আলোড়ন তোলেনি। জার্মান সম্রাট কাইজারের সাহায্য নিলে স্বৈরাচারী রাজতন্ত্রকে সমর্থন করা বা মর্যাদা দেয়া হবে, অথবা ইংরেজের শেখানো ডেমোক্রাসি রসাতলে তলিয়ে যাবে, একথা ভেবে তাঁরা হাপুস নয়নে কাঁদতেও বসেননি।

তাঁরাও ছিলেন হটকারী, অকুতোভয়, অপরিণামদর্শী। সাবধানী, হিসেবী, দোকানদারী মনোভাব নিয়ে বিপ্লবী হওয়া যায় না। ও-পথ তাই তাঁরা মাড়ানওনি।

সামান্য কুড়িটা বছর। কুড়িটা বছরে সব নিঃশেষ হয়ে গেল। কোথায় তলিয়ে গেল যতীন্দ্রনাথের অভয়ঙ্কর মৃত্যুহীন মন্ত্র? রাসবিহারীর দুর্বার পরিকল্পনা? ভুলে গেল সবাই। ভুল হল সবই।

সারা দেহের রক্ত চাপ বেঁধে ফুটে উঠছে মুখে। থমথম করছে মুখখানা। লাল গোলাপের একটা স্তবকের মত। কিন্তু চোখ দুটো? বিষণ্ণতায় ওরা চুপসে গেছে। নিষ্প্রভ, উদাস।

ব্যথা-কাতর চোখ দুটো ফিরিয়ে আনলেন আমার মুখের ওপর। তারপরই বলে উঠলেন: "অশোক ভারতবর্ষের পরম গৌরব। অশোক ভারতবর্ষের প্রথম অভিশাপ।"

রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে অহিংসার কার্যকারিতা পরীক্ষা করতে গিয়ে অশোক সেদিন ভারতবর্ষের জন্য যে অকল্যাণকে আমন্ত্রণ জানিয়ে রাখলেন, তাতে করে মৌর্যসাম্রাজ্যই শুধু ধ্বংস হল না, ভবিষ্যৎ-ভারতবর্ষের জন্য রেখেও গেলেন এক অভিশপ্ত পরিণাম। এরই সুযোগ নিয়েছিল পরবর্তীকালে বিদেশীরা। অহিংসা আর সন্ন্যাসের

অলস মন্থর বীর্যহীন কর্মবিমুখতা সেদিন ভারতবর্ষের ক্ষাত্র-শক্তিকে ভিক্ষুতে রূপান্তরিত করেছিল! সেই ইতিহাসই নতুন করে আর একবার ফুটে উঠল আজকের এই বিংশ শতাব্দীতে।

"গান্ধী প্রভূত জাগরণ এনেছেন সন্দেহ নেই কিন্তু সেই ক্ষণিকের জাগরণ যার বিনিময়ে পেলুম, যে মূল্য দিলুম, তার হিসেব জাতি একদিন করতে চাইবেই কিন্তু ভবিষ্যতের দুর্গতি আর লাঞ্ছনার হাত থেকে সে-হিসেব কি পরিত্রাণ দিতে পারবে?"(১)

চোখ দুটো আবার বাইরে চলে গেল। অচঞ্চল দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়ে থাকল নিঃসীম আকাশের গায়ে। বার বার ঠোঁট দুখানা কেঁপে কেঁপে উঠছে।

স্থাণু হয়ে গেছি।

সহসা ফিরে তাকালেন। চোখের ভেতর থেকে একটা আলো বেরোচ্ছে না? ধক্ ধক্ করে জ্বলছে। জ্বালাভরা সেই চোখ আমার মুখের ওপর ন্যস্ত করে বললেন: "যতীন্দ্রনাথের নাম ভাঙিয়ে যারা রাজনীতির আসর জমাতে চায়, তাদের দিকে তাকিয়ে দেখেছো?"

দেখেছি। দেখেছি নরেন ভটচাযকে। দেখেছি আরও কত শূর, বীর, বিপ্লবীকে। উল্কার মতো এসে পড়েছিলেন এই মানবেন্দ্র রায়। হাওয়া-ভরা বেলুন একটি ঢিলে চুপসে গেল। যুদ্ধ শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজের সঙ্গে মিতালি করে বসলেন। টাকা নিলেন হাত পেতে ইংরেজের কাজ থেকে। (···With the

---

(১) "নিখিল-ভারত-কংগ্রেস কমিটির সভায় চীনের আক্রমণ প্রতিরোধ করিবার সর্বাত্মক প্রস্তাব সমর্থন করিতে যাইয়া আসামের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীবিমলা-প্রসাদ চালিহা অহিংসা লইয়া বেশি হৈ-চৈ বা মাতামাতি না করিতে অনুরোধ জানান। তিনি স্পষ্ট করিয়া বলেন যে, একদিকে আমাদের যুবকদের সীমান্তে যাইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে সংগ্রাম করিতে ও প্রাণ দিতে উৎসাহ দেওয়া হইবে, অন্যদিকে ঐ একই মুখে অহিংসার গুণকীর্তনও করা হইবে, এই দুইটি বিরোধী মনোভাব একসঙ্গে চলে না।"—আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৫শে চৈত্র, ১৩৬৯।

out break of the present war, he began to advocate unconditional co-operation with the British Goverment, and that brought about his political doom.—Indian stuggle 1935-42.)

রায় দল করেছিলেন। গাল ভরা নামও দিয়েছিলেন। দল আরও আছে। আছে সোস্যালিস্ট পার্টি, আছে কম্যুনিস্ট পার্টি। কিন্তু এমন নিঃসাড়ে ওরা সরে পড়ল কোথায়?

কী বিপুল সুযোগ আর সম্ভাবনাই-না ওরা পেয়েছিল। গান্ধী-আন্দোলনের ব্যর্থতার ওপর ওদের জন্ম। সারা দেশের ক্ষাত্র-শক্তি সমবেত করে ওরা শত্রুর বুকে আঘাত হানতে পারত। কিন্তু পারল না। গান্ধী আর নেহরুর প্রভাবে প্রথমেই সোস্যালিস্টরা ঝিমিয়ে পড়ল। (···The leaders of this party were won over by Gandhi and Nehru and that blasted the future of the party.—Indian struggle, 1935-42.)

কিন্তু ওরা? কম্যুনিস্টরা? ওরাও হোঁচট খেল বিলক্ষণ। সোস্যালিস্ট পার্টির দুর্দশা দেখে ওদের সচেতন হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু হল না। হতে পারলও না। ওদের গোড়ায় গলদ। বৈদেশিক কোন শক্তি বা দলের লেজুড় হয়ে দেশের বিশ্বাসভাজন হওয়া যায় না। সে লণ্ডন হোক, আর মস্কোই হোক।

বাংলার সন্ত্রাশবাদীদের তরুণরা এদের দলে যোগ দিয়েছিল। কর্মী হিসেবে ওদের তুলনা নেই। কিন্তু নেতৃত্বহীন এই দল বার বার ভারতবর্ষের ভাগ্য নিয়ে পরিহাস করেছে। খেলেছে। সাম্রাজ্যবাদের মধ্যমণি তথা স্রষ্টা ইংরেজের বুকে আঘাত হানতে গিয়ে ওরা থমকে দাঁড়াল।

১৯৩০-এ সত্যগ্রহ-আন্দোলনে এরা যোগ দেয়নি। ওটা নাকি ছিল একান্তই নিরামিষ আর প্রতিক্রিয়াপন্থী। (In 1930, those

who had gone in for a national struggle, were condemned as counter-revolutionaries.—signed article of Subhaschandra in the Forward Bloc, April 13, 1940)

১৯৪০-এও ওরা পিছিয়ে গেল। গেল নতুন অজুহাতে। কংগ্রেসকে বাদ দিয়ে আন্দোলন গড়ে তুলতে গেলে দেশের ঐক্য নাকি বিঘ্নিত হবে।

সেদিন সুভাষচন্দ্র এদেরই লক্ষ্য করে বলেছিলেন ঃ "এই উগ্র বামপন্থীদের আজো একথা শিখতে হবে যে, সেই ঐক্যই বাস্তব আর আকাঙ্ক্ষিত, যা সৃষ্টি করবার শক্তি রাখে কর্মের উদ্দীপনা আর সংগ্রাম। যে-ঐক্য ডেকে আনে পঙ্গুতা, তা অর্থহীন। অকেজো। সে-ঐক্য জীবন্ত সমাজের ঐক্য নয়,—গোরস্থানের ঐক্য।" (ফরোয়ার্ড ব্লক, ১৩ই এপ্রিল, ১৯৪০)

গান্ধীর দলে যতীন্দ্রনাথের মন্ত্র-শিষ্যেরা ভিড়ে পড়েছে। ভুলে গেছে ওরা মন্ত্র। ভুলে গেছে আদর্শ। বিপ্লবের অগ্নি-বীণা ভেঙ্গে গেছে। ওরা মৃত।

মানুষ মরে কিন্তু আদর্শ?

সেই আদর্শের ধারক ও বাহক সুভাষচন্দ্র। সংগ্রামী ভারতবর্ষের নিরবচ্ছিন্ন আপোসহীন যুদ্ধের একক প্রতিনিধি। যতীন্দ্রনাথের নিবিড় সান্নিধ্যে সুভাষচন্দ্র আসেননি ; তাঁর সেদিনকার কর্ম-প্রচেষ্টার সঙ্গে কোন সংযোগ রাখবার সময় ও সুযোগ সুভাষচন্দ্রের ছিল না ; কিন্তু সেই অতুল্য দেশপ্রেম ও আদর্শই আশ্রয় করেছিল উত্তরসাধক সুভাষচন্দ্রকে।

যদি-কিন্তু-কী-কেন-কোথায়-কেমনকরে সুভাষচন্দ্রকে পীড়িত করেনি মুহূর্তের জন্য। দ্বিধা জাগেনি ক্ষণিকের তরেও।

সংগ্রামী ভারতবর্ষের আন্তর কক্ষে ঘুমিয়ে পড়েছিল যে দুর্বার রণতৃষ্ণা, পরাধীনতার প্রতি একান্ত ঘৃণা,—তাই রূপ পরিগ্রহ করে

ফুটে উঠল একটি মানুষের দেহ আর মন ঘিরে। সেই মুহূর্তে সেই মানুষটিই হয়ে উঠলেন সমগ্র জাতির বন্দনা আর পূজোর পাত্র।

মুমূর্ষু দিনের আলো ম্লান হয়ে উঠেছে।

নেতা ঢুকলেন স্নানের ঘরে। আমি বসেই থাকলাম। বালেশ্বর, বুড়ি বালামের অস্পষ্ট তীর চোখের সামনে দিব্য কলেবর নিয়ে ফুটে উঠল।

সেদিন ছিল এই পর্যন্তই। কিন্তু আজ মনের কোণে ইতিহাস আরও বিচিত্র বারতা পৌঁছে দিয়েছে।

যতীন্দ্রনাথের পর রাসবিহারী। ১৯১৫র পর ১৯৪৪। ছেদহীন ইতিহাস। পারম্পর্যময় ইতিহাস। নিঃসঙ্গ সুদূর বিদেশের নির্বান্ধব পুরীতে এই শবসাধক বসে ছিলেন একা। জাগর দুটি আঁখির কোণে বহ্নিজ্বালা নিয়ে বসেছিলেন। তাকিয়েছিলেন নির্নিমেষে। প্রতীক্ষার অবধি ছিল না।

দীর্ঘ রাত্রির অবসান হল। দিন এল। এল তার পরিপূর্ণ ছটা নিয়ে। আশা নিয়ে। স্বপ্ন নিয়ে। ভরসা নিয়ে।

নিজের হাতে শ্রান্ত বীর পরিয়ে দিলেন জয়মালা উত্তরসাধক সুভাষের গলায়। জাতির হাতে তুলে দিলেন সুভাষকে। নেতাজির হাতে তুলে দিলেন দেশকে।

ঘুমিয়ে পড়লেন মহাবীর।

প্রদীপ্ত আননে জেগে রইল পরম তৃপ্তির অনির্বচনীয়তা।

৬

দিন কাটছে না, ছুটছে। হু হু করে ছুটছে। গোনা ক'টা দিন ফুরিয়ে যেতে তর সইছে না।

আমার যাবার আয়োজনে বিভোর হয়ে আছেন নেতা। কত কী সংগ্রহ করতে হবে। একটা ওভার কোট চাই, অন্তত জোড়া-দুই

জুতো চাই। ভারী হয় হালকা। আর চাই কেড্‌স্ অন্তত এক জোড়া। আর কিছু টাকা। ইলার কাছে গোটা পাঁচেক মোহর আছে। নিতে হবে। ওভার কোট ওঁর একটা আছে। একটু বড় হবে। তা, চলেও যাবে। খুচরো কিছু টাকা। বেশি নয়। শ' দুই। ওপথে বেশি টাকা মারাত্মক। ওর কল্যাণে প্রাণ যাওয়াও বিচিত্র নয়।

কলকাতা থেকে সটান দিল্লী। সেখানে গিয়ে সর্বপ্রথম কাজ হবে এম. এল. এ. লক্ষ্মীকান্ত মৈত্রের সঙ্গে দেখা করা। তাঁকে সঙ্গে করে হোম মেম্বর এবং অন্যান্য কয়েকজন হোমরা-চোমরার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে হবে। এবং অনতিবিলম্বে নেতাকে মুক্তি দেয়া-যে শুধু ন্যায় ও নীতির দিক থেকেই শ্রেয় নয়, পরন্তু মানবিকতার দিক থেকেও অবশ্য কর্তব্য, এটা বারবার বলতে হবে। বলতে হবে সবাইকে। এই রুগ্ন আধমরা মানুষটাকে জেলখানায় মরতে দেয়া-যে মূঢ়তারই নামান্তর, এটাও বোঝাতে হবে। আরও বোঝাতে হবে যে, রোগা কিন্তু জ্যান্ত সুভাষ বোসের চাইতে মৃত সুভাষ বোস,—অনেকাংশে শক্তিশালী তো বটেই,—ভয়ঙ্করও।

মোদ্দা কথা ওরা যেন বুঝতে পারে যে, একমাত্র সুভাষ বোসের মুক্তির সমস্যা নিয়েই আমি অতিমাত্রায় উদগ্রীব হয়ে ছুটে এসেছি দিল্লী।

দিল্লীর কাজ শেষ করে সোজা পাঞ্জাব। নেতাকে ওরা মুক্তি দিলেও দিতে পারে, ডালহৌসী হোক বা পাঞ্জাবের আর কোন স্থানে নেতা হৃতস্বাস্থ্য উদ্ধার মানসে থাকতে চান। সেই কারণেই পাঞ্জাবে আমাকে থাকতে হবে কয়েকটা দিন।

পাঞ্জাব থেকে সোজা পেশোয়ার। ওখানকার আকবর শা আমাদের বন্ধুলোক। আমাদের পার্টির মেম্বর। সুভাষ-ভক্ত। বাকি যা করবার তিনিই করবেন।

চেষ্টা করতে হবে যেমন করে হোক সর্বপ্রথম মস্কো যেতে

স্ট্যালিনের নামে তিনি চিঠি দেবেন। সুভাষ বোসের প্রতিনিধি আর বেঙ্গল পারলিয়ামেন্টের মেম্বর। এই পরিচয়ই যথেষ্ট। এম. এল. এ. ওরা বুঝবে না, তাই এম. পি.।

ইমপিরিয়ালিজ্‌ম-এর মধ্যমণি ইংরেজকে ঘায়েল করতে পারলে-যে অন্য গুলো ঘায়েল করতে সময় লাগবে না মোটেই, স্ট্যালিনকে এইটেই জোর দিয়ে বলতে হবে। বারুদখানা হয়ে রয়েছে ভারতবর্ষ। একটু শুধু ইন্ধন। সেইটাই আমাদের ওদের কাছে চাওয়া।

যদি স্ট্যালিন রাজী নাই-ই হন, যেতে হবে জার্মেনী। হিটলারের নামেও নেতা চিঠি দেবেন। হিটলারকে রাজী করাতে বেগ পেতে হবে না। কিন্তু ও-পথে আগে নয়। মস্কোর পথ রুদ্ধ না দেখলে, ও-পথে নয়। আগে মস্কো। পরে বার্লিন।

কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলা। ইংরেজও কাঁটা, হিটলারও কাঁটা। ও-দুটোর একটাও আমরা চাইনে। কিন্তু একটাকে তুলতে গেলেই আর একটার সাহায্য চাই। ইংরেজও কি সাহায্য নেয়নি? দুনিয়া শুদ্ধ সবাই-এর কাছে ধরনা দিয়েছে ইংরেজ। বাঁচবার জন্য ধরনা দিয়েছে। আমাদের বেলা দোষ হবে কেন?

মুখে আমার কথা নেই। ফুরিয়ে গেছে। সামনে ফুটে উঠেছে পেশোয়ার, খাইবার পাস, কাবুল। আকাশ-ছোঁয়া পর্বতের তুঙ্গ শৃঙ্গ পথ রোধ দাঁড়ায়। মাথায় ওদের তুষার-কিরীট। পাশ কেটে বয়ে যায় দুরন্ত ঝরনা। কণ্ঠে দুর্বার রাগিণী। আমি চলেছি। একা।

আঁধারের ঘোর তখনও কাটেনি ঘুম ভেঙে গেল অকস্মাৎ। আমার কপালের ওপর ডান হাতখানা রেখে নেতা দাঁড়িয়ে আছেন আমার শিয়রে। চোখভরা তখনও আমার ঘুমের আবেশ,—কথা কইতে পারছিলাম না। উনিই বললেন: "উঠবে না?"

এত ভোরে? কই, কোনদিন তো জাগেন না। আজ জেগেছেন। তবে কি রাতভোর জেগেই কাটিয়েছেন? ঘুমোননি একটুও?

উঠে বসলাম। স্নিগ্ধ এক ফালি হাসি ফুটে উঠল মুখে। বললেন ঃ "ওঠো। ফালতুরা আসবার আগেই সব তোমাকে বুঝিয়ে দি।"

হাতে-মুখে জল দিয়ে বসলাম দুজন ওঁর ঘরে। দুখানা চিঠি দেখালেন। একখানা স্ট্যালিনের নামে; অন্যখানা হিটলারের। অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত চিঠি। আমার মুখেই ওঁরা সব জানতে পারবেন, সার কথা ছিল এই।

তারপর। অ্যাসেমব্লীর রিপোর্ট আসত আমার নামে জেলের ঠিকানায় নিয়মিত। ওরই একখানা হাতে নিয়ে বললেন ঃ "সামনের মলাটে পেন্সিলে লেখা রয়েছে কতকগুলো সংখ্যা। ওগুলো পৃষ্ঠার সংখ্যা। ঐ সব পাতার প্রথম থেকে কতকগুলি অক্ষরের মাথায় ফুটকি দেয়া আছে। সেগুলি কাগজে লিখে নিলেই একখানা চিঠি হবে।"

চিঠিখানা আলাদা কাগজে লেখা ছিল। জার্মান ভাষায় লেখা। ব্যাখ্যা করে আমাকে শোনালেন। এমেলীর কাছে লেখা চিঠি। এমেলী শেঙ্কল। ইওরোপে বাসকালীন নেতার সেক্রেটারী।

এতবড় কাজের ভার দেয়াই প্রমাণ করবে যে, পত্রবাহক নেতার কতখানি বিশ্বাসভাজন ও অন্তরঙ্গ বন্ধু। ভারতবর্ষের আসন্ন ভাগ্যের সঙ্গে এই পত্র-বাহকের প্রতিটি পদক্ষেপ বিজড়িত। এঁকে সাহায্য করলে তাঁকে সাহায্য করবার সমতুল তো হবেই, উপরন্তু হবে তাঁর জীবনের মহোত্তম সাধনার সঙ্গী হওয়া। এমেলী তা করবেন সানন্দে, নেতা সে-কথা জানেন।

বললেন ঃ "অসঙ্কোচে এঁকে বিশ্বাস কোরো। সমগ্র ইউরোপে এঁর চাইতে বেশি বিশ্বাস ও নির্ভর করবার আমার আর কেউ নেই।"

টেবিলের ওপর থেকে যাদবপুর সোপ ফ্যাক্টরীর তৈরী একটা সেভিং স্টিক হাতে নিয়ে বললেন ঃ "তলার দিক থেকে চিঠি ভেতরে ঢুকিয়ে দেবো। অয়েল পেপারে মোড়া থাকবে। নষ্ট হবে না।"

সাবানখানা আনকোরা নতুন। নিশ্চয়ই আনিয়ে নিয়েছেন।

অবাক বিস্ময়ে সব দেখছিলাম, আর শুনছিলাম। কোনটা বাদ পড়েনি। নিখুঁত নিপুণ সব ব্যবস্থা। খুঁটিনাটিও চোখ এড়ায়নি। এই মানুষই-না দর্শন শাস্ত্র নিয়ে বুঁদ হয়ে কাটিয়েছেন। এই মানুষই ধ্যান করতে করতে দেহ-জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন। সর্বোপরি এই মানুষই আমার মেয়ের বিয়ে নিজে দেখে ও নিজের হাতে দেবেন বলে কল্পনাও আঁকেন।

চিঠি-পড়া শেষ করেই বললেন: "গোটা বইখানা (রিপোর্ট) সঙ্গে নেবার দরকার নেই। পাতা ক'খানা দিয়ে জুতো জড়িয়ে নিয়ো।"

দালানে শব্দ হল। বুঝলাম চা নিয়ে যতীনের আগমন হয়েছে। আমরা বেরিয়ে এলাম। চা শেষ করেই নেতা প্যাড আর কলম নিয়ে বসে গেলেন লিখতে। দীর্ঘ চিঠি। বাংলার গভর্ণর, মুখ্যমন্ত্রী এবং মন্ত্রিসভার অন্যান্য মন্ত্রীদের সম্বোধন করে চিঠিখানা লেখা হয়েছে।

"মাননীয় গভর্নর মহোদয় ও মন্ত্রী মহাশয়গণ,

"গত ৩০শে অক্টোবর, ১৯৪০, আমি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মহাশয়কে একখানা চিঠি লিখেছি। (মুখ্যমন্ত্রী মহাশয়কেও ঐ চিঠির নকল পাঠানো হয়েছে।) ঐ একই দিনে এবং গত ১৪ই নভেম্বর আমি প্রেসিডেন্সী জেলের সুপারিন্টেণ্ডেণ্টকে দু'খানা গোপনীয় চিঠি দিয়েছি। সে চিঠিও (আমার অনুরোধে) বঙ্গীয় সরকারের নিকট

(১) নেতার মুক্তির ৪ দিন পর আমাকে আলিপুর সেণ্ট্রাল জেলে পাঠানো হয়। সেখানে শ্রীসুরেন্দ্রমোহন ঘোষ আর আমি থাকতাম পাশাপাশি ঘরে। নেতার আকস্মিক অন্তর্ধানের কথা কাগজে পড়বামাত্র ওঁকে আমি সব কথা বলি। মায় চিঠির কথাও। সেইদিনই ওঁর নির্দেশে চিঠিগুলো আমি নষ্ট করে ফেলি। উনিই আমাকে বিশেষ করে সাবধান করেন কারও কাছে ঘুণাক্ষরেও এসব কথা না বলতে। আমার কাছে পুলিসের কেউ আসতে পারে, এ আশঙ্কাও উনি প্রকাশ করেন। ১৫ দিনের মাথায় আমার সঙ্গে দেখা করেন স্পেশাল ব্রাঞ্চের শ্রীরাধারমণ চাটুজ্যে।

পাঠানো হয়েছে। বর্তমান পত্রে আমার নিজের সম্পর্কে যা বলবার আছে, তার পুনরুক্তি করবো এবং আমার জীবনের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে কেন আজ বাধ্য হলাম, তাও লিখিত ভাবে জানাবো।

"আপনাদের দ্বারা আমার প্রতি অবিচারের বিন্দুমাত্র প্রতিকার হবে, এ আশা আর আমার নেই। তাই আমি আপনাদের কাছে মাত্র দুটি অনুরোধ জানাবো। দ্বিতীয় অনুরোধটি থাকবে আমার চিঠির শেষের দিকে। আমার লেখা আজকের এই পত্রখানা সরকারী মহাফেজখানীয় সযত্নে রক্ষা করবার ব্যবস্থা যেন করা হয়, এই হবে আমার প্রথম অনুরোধ। আপনাদের স্থলাভিষিক্ত হয়ে ভবিষ্যতে যাঁরা আসবেন, আমার সেই সব স্বদেশবাসী যাতে করে এই পত্র দেখবার সুযোগ পান, তার জন্যেই এই অনুরোধ। এতে আরো আছে আমার দেশবাসীব উদ্দেশ করে পাঠানো আমার বাণীদূত। এই পত্রই আমার রাজনৈতিক জীবনের ইচ্ছাপত্র। উইল।

"কোন প্রকার যুক্তি বা কারণ না দেখিয়েই ১৯৪০এর ২রা জুলাই, ভারত-রক্ষা-বিধানের ১২৯ ধারায় আমাকে বঙ্গীয় সরকার বন্দী করেন। পরবর্তী কালে সরকারী ব্যাখ্যা সর্বপ্রথম শোনা যায় হাউস অব কমন্স্-এ, ভারত বিভাগীয় মন্ত্রী মিঃ অ্যামেরীর মুখে। তিনি স্পষ্ট করে বলেন যে, কলকাতার হলোওয়েল মনুমেণ্ট ধ্বংস করবার আন্দোলন সম্পর্কেই আমাকে বন্দী করা হয়েছে।

"মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ও বঙ্গীয় অ্যাসেমব্লীর এক বৈঠকে কার্যত এই কথা উল্লেখ করেন যে, হলোওয়েল মনুমেণ্ট-সত্যাগ্রহই আমার মুক্তির অন্তরায়। বঙ্গীয় সরকার যখন মনুমেণ্ট অপসারণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, আটকবন্দীদের সবাইকে মুক্তি দেয়া হয়। শুধু মুক্তি দেয়া হলো না শ্রীনরেন্দ্রনারায়ণ চক্রবর্তী এম, এল, এ, ও আমাকে। এই মুক্তি-আদেশে ঘোষিত হয় ১৯৪০এর আগস্ট মাসের শেষের দিকে। এবং সঙ্গে সঙ্গে মূল সাময়িক আটক-আদেশ সম্বলিত ১২৯ ধারা

বাতিল করে ভারত-রক্ষা-বিধানের ২৬ ধারা অনুযায়ী স্থায়ী ভাবে আটক করে রাখবার জন্য আমার ওপর নতুন আর একটি অনুজ্ঞা জারী করা হয়।

"খুবই আশ্চর্যের বিষয় এই যে, ২৬ ধারানুযায়ী নতুন আদেশ জারী হবার পর আমাকে জানানো হলো যে, ভারত-রক্ষা-বিধানের ৩৮ ধারানুযায়ী আমার বিরুদ্ধে দুইজন ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে মামলা দায়ের করা হয়েছে। মামলার কারণ বলে উল্লেখ করা হয়েছে আমার তিনটি বক্তৃতা এবং আমার সম্পাদনায় প্রকাশিত সাপ্তাহিক 'ফরোয়ার্ড ব্লক' পত্রিকার একটি প্রবন্ধ। এই বক্তৃতাগুলির প্রথম দুটি আমি দিয়েছিলাম ১৯৪০এর ফেব্রুয়ারী মাসে। অন্যটি এপ্রিল মাসের গোড়ার দিকে। এই থেকেই বোঝা যাবে, আগস্ট মাসের শেষ দিকে ভারত-রক্ষা বিধানের একটি ধারায় সরকার আমাকে একবার স্থায়ী ভাবে বিনা বিচারে আটকের ব্যবস্থা করে এবং পরক্ষণে ঐ বিধানেরই আর এক ধারায় বিচার বিভাগীয় ট্রাবুন্যালে আমাকে অভিযুক্ত করে যে অবস্থার সৃষ্টি করলেন, তা শুধু অভিনবই নয়, পরন্তু অভূতপূর্বও। শাসন-বিভাগীয় হুকুমনামা আর বিচার-বিভাগীয় ব্যবস্থার এবম্বিধ সংমিশ্রণ আমি এর পূর্বে আর কখনো দেখিনি। এই নীতি সুস্পষ্টরূপে শুধু আইনবিরুদ্ধ ও অন্যায়ই নয়, অধিকন্তু নগ্ন প্রতিহিংসায় পরিপূর্ণ।

"একথা কারোরই দৃষ্টি এড়াবে না যে, আমার বিরুদ্ধে মামলা রুজু করা হয়েছিলো তথাকথিত অপরাধ অনুষ্ঠিত হবার অনেক পরে। এবং একথাও স্মরণীয় যে, 'ফরোয়ার্ড ব্লক' পত্রিকায় প্রকাশিত উল্লিখিত প্রবন্ধের জন্যে পত্রিকাটির জামানত জমা পাঁচশত টাকা বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে এবং নতুন করে শাস্তিস্বরূপ আরো দু হাজার টাকা জমা দিতে বাধ্য করা হয়েছে। অধিকন্তু পত্রিকাটির ওপর এই আক্রমণ ঘটেছিল অত্যন্ত অতর্কিত ভাবে। প্রচলিত রীতি অনুযায়ী পত্রিকাটিকে পূর্বাহ্নে সতর্কও করা হয়নি।

"সরকারী আচরণের মুখোস আরো খুলে পড়ে, যখন দুই জন বিচারকের নিকট আমার জামীনের জন্যে আবেদন করা হয়। সরকারী মুখপাত্র দুইটি আবেদনেরই তীব্র বিরোধিতা করেন। শেষোক্ত ক্ষেত্রে বিচারক ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ ওয়ালি-উল-ইসলাম আমার আবেদন মঞ্জুর করে মন্তব্য করতে বাধ্য হন যে, সরকার যদি ভারত-রক্ষা-বিধানের ২৬ ধারানুযায়ী বিচারহীন আটক-আদেশ প্রত্যাহার না করেন, তাঁর এই মঞ্জুরী নিষ্ফল হবেই। এ থেকে একটা কথা দিবালোকের মতোই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, সরকার এক দিকে বিচার বিভাগীয় মতামতের ওপর বাধা-নিষেধ আরোপ করেছেন, অন্যদিকে শাসন-বিভাগীয় আইন-প্রয়োগও অসম্ভব করে তুলেছেন। প্রাদেশিক সরকারের কার্যাবলি আরো আপত্তিজনক হয়ে উঠেছে এই কারণেই যে, তাঁরা এই সব ক্ষেত্রে ভারত-সরকারের নির্দেশকে আদৌ আমল দিতে চান না।

"দুজন ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে একই সময়ে আমার বিচারের ব্যবস্থা করে সরকার বিষয়টি আরো বেশ জটিল করে তুলেছেন। আমার একাধিক বক্তৃতার মামলা করাই যদি সরকারের অভিপ্রায় হয়ে থাকে, দুজনের পরিবর্তে একজনের কাছেই তা করা হলো না কেন? গত এক বৎসর ধরে কলকাতার নানা স্থানে আমি বক্তৃতা দিয়েছি। সরকার আমাকে দণ্ড দিতে বদ্ধপরিকর এবং এই কারণেই একটা ফেঁসে গেলেও আরেকটায় যাতে আমাকে দণ্ড দেয়া যায়ই তার জন্যেই-যে এ-ব্যবস্থা করা হয়েছে, এ কথাটা যে-কেউ ধারণা করতে বাধ্য।

"যে-কোনো অপক্ষপাত ব্যক্তির নিকট সরকারী আচরণ একান্ত হীন ষড়যন্ত্রমূলক বলে প্রতিভাত হবেই। বিশেষ করে আরো এই কারণে যে, তথাকথিত সরকারবিরোধী অনাচার অনুষ্ঠিত হবার অনেক পরে আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। যদি সত্যিই আমার আচরণ আইন বিরোধীই হয়ে থাকে, সরকার সেই সময়ে,—

যখন তা অনুষ্ঠিত হয়েছিলো,—তার প্রতিবিধান করলেন না কেন ?

"আমার একটা অনুরোধ আছে: ভারতরক্ষা আইনে বন্দী মুসলমান আর আমাদের ন্যায় লোকেদের প্রতি এই সরকারী আচরণ ক্ষণকালের জন্যেও কি একটু তুলনা করে দেখবেন ? কোনো কারণ বা কৈফিয়ৎ না দেখিয়ে ভারত-রক্ষা-আইনে বন্দী কতজন মুসলমানকে আজ পর্যন্ত মুক্ত করা হয়েছে, সে কথা সরকার জানাবেন কি ? সাম্প্রতিক কালের মুড়াপাড়া মৌলবীর ব্যাপারটা আজো সকলের মনে জ্বলজ্বল করছে। আমাদের কি আজ এই কথাই মেনে নিতে হবে যে, এই সরকারের শাসন-ব্যবস্থায় মুসলমানের জন্যে এক আইন আর হিন্দুর জন্যে ভিন্ন আইন চালু হয়েছে ? এবং এ-কথাও কি স্বীকার করে নিতে হবে যে, মুসলমানের জন্যে ভারত-রক্ষা-আইনের অর্থ ভিন্নতর হবে ? যদি তাই হয়, সরকারী এই নীতি পরিষ্কার করে জানিয়ে দেয়া অবশ্য কর্তব্য।

"আমার এই বন্দী-জীবনের জন্যে ভারত-সরকার দায়ী, বঙ্গীয় সরকার নন, এমনি একটা বিতর্কমূলক কথা উঠলেও উঠতে পারে। এর জবাবে আমি এই কথাই স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, সম্প্রতি কেন্দ্রীয় অ্যাসেমব্লীতে আমার সম্বন্ধে যে মুলতবী প্রস্তাব পণ্ডিত লক্ষ্মীকান্ত মৈত্র উত্থাপন করেছিলেন, তার জবাবে ভারত সরকারের পক্ষ থেকে বলা হয়েছিলো যে, যেহেতু বাংলা সরকার আমাকে কারারুদ্ধ করেছেন, সেই হেতু আদৌ এ-প্রশ্ন কেন্দ্রীয় অ্যাসিমব্লীতে উঠতেই পারে না। আমার মনে হয় বঙ্গীয় সরকারের মন্ত্রীও এ ধরনের স্বীকৃতি জানিয়েছিলেন।

"এই সঙ্গে আমরা এ কথাও ভুলে যেতে পারিনে যে, বর্তমানে আমরা 'জনপ্রিয়' মন্ত্রিসভার সদাশয় আশ্রয়ে বাস করে চলেছি।

"কেন্দ্রীয় অ্যাসেমব্লীতে আমার সাম্প্রতিক নির্বাচন আর একটি সমাস্যার সৃষ্টি করেছে। অধিবেশন-কালে সদস্যরা,—যদি কেউ

বন্দীও থেকে থাকে,—অধিবেশনে যোগ দিতে পারে কি না, এ প্রশ্নটিরও মীমাংসা প্রয়োজন। স্পষ্ট করে বিধিবদ্ধ থাক আর না থাক, প্রতিটি শাসনতন্ত্রের এটা একটা মৌল অধিকার। এবং এই অধিকার অর্জন করা হয়েছে দীর্ঘ সংগ্রামের মাধ্যমে। এই সেদিন বার্মা-সরকার একজন দণ্ডিত আসামীকে তাঁদের আইন-সভায় যোগ দেবার অনুমতি দিয়েছিলেন, কিন্তু দণ্ডিত না হওয়া সত্ত্বেও আমাকে আমাদের 'জনপ্রিয়' মন্ত্রিমণ্ডলী সে অধিকার দিতে নারাজ।

"সরকারের সমর্থনে যদি হাউস অফ কমন্সের ক্যাপ্টেন র‍্যামজের মামলা উল্লেখ করা হয়, আমি এই কথাই বলবো যে, ক্যাপ্টেন র‍্যামজের ব্যাপার সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের। গুরুতর অভিযোগ ছিলো তাঁর বিরুদ্ধে। অভিযোগগুলির সব কথা আমাদের জানাও নেই। কাজেই কোন পক্ষের হয়ে কিছু বলা সম্ভবপরও নয়। সম্প্রতি ক্যাপ্টেন র‍্যামজেকে বন্দী করা নিয়ে গ্রেটবৃটেনে অবস্থিত আমেরিকার রাষ্ট্রদূত মিঃ কেনেডি এবং আরও অনেকে নাকি বলেছেন যে, ইংলণ্ডে গণতন্ত্রের মৃত্যু ঘটেছে। (১) এ কথার যথার যথার্থ্য প্রমাণিত হবে যদি ক্যাপ্টেন র‍্যামজেকে অন্যায়ভাবে কারারুদ্ধ করা হয়ে থাকে কিম্বা যদি তিনি সুবিচার থেকে বঞ্চিত হন। তবুও ক্যাপ্টেন র‍্যামজে হাউস অব কমন্সর-এর একটি কমিটির মারফত তাঁর নথিপত্র পরীক্ষা করাবার সুযোগ পেয়েছেন।

"আমার বন্দী-জীবন সম্পর্কে বিচার করতে হলে দুটি ব্যাপক প্রশ্ন আলোচনা করতে হবে। প্রথমত, ভারত-রক্ষা-বিধান ন্যায়ানুমোদিত এবং জনমত-গ্রাহ্য কিনা; দ্বিতীয়ত, আইনের সিদ্ধান্ত আমার সম্পর্কে যথাযথ প্রযুক্ত হয়েছে কিনা। দুটোর উত্তরই নেতিবাচক।

---

(১) মিঃ জোসেফ কেনেডি আমেরিকার পরলোকগত প্রেসিডেণ্ট কেনেডির পিতা এবং ১৯৩৭ থেকে ১৯৪০ পর্যন্ত গ্রেট বৃটেনে আমেরিকার রাষ্ট্রদূত ছিলেন।

"ভারত-রক্ষা-বিধানের পেছনে কোন প্রকার নৈতিক সমর্থন নেই, কোন না ঐ বিধানের দ্বারা জনসাধারণের মৌল অধিকার ও স্বাধীনতার ওপর হস্তক্ষেপ করা হয়েছে। তদুপরি এই বিধান রচিত ও প্রবর্তিত হয়েছিলো যুদ্ধের প্রয়োজনে। এ-কথা সর্বজনবিদিত যে, ভারতীয় জনগণের কিম্বা ভারতীয় আইন-পরিষদের অনুমোদন ছাড়াই ভারতবর্ষকে এই যুদ্ধে নামানো এবং যুদ্ধরত দেশগুলির সামিল রূপে ঘোষণা করা হয়েছিলো। অহরহ বলা হয় যে, বৃটেন স্বাধীনতা এবং গণতন্ত্রের পক্ষে সংগ্রামে রত হয়েছে; এই বিধান সেই সোচ্চার ঘোষণার পরিপন্থী। শেষ কথা, কেন্দ্রীয় পরিষদের কংগ্রেস পার্টি ভারতরক্ষা-আইন বা বিধি কেন্দ্রীয় পরিষদে পাশ করিয়ে নেবার সময় কোনটারই সমর্থক ছিলো না। এই সব যুক্তির পরিপ্রেক্ষিতে এই আইন বা বিধি ভারত-দমন-বিধান অথবা অনাচার-রক্ষা-আইন নামে অভিহিত করাই কি যুক্তিসঙ্গত ও অর্থপূর্ণ বলে মনে হবে না?

"বঙ্গীয় সরকারের তরফ থেকে যুক্তি দেখানো যেতে পারে যে, যেহেতু ভারত-রক্ষা-আইন কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক প্রবর্তিত হয়েছিলো, সেই হেতু প্রাদেশিক সরকার এর বিধি মেনে চলতে বাধ্য। বিধিগুলি যে-ভাবেই বা যার দ্বারাই চালু হয়ে থাক না কেন, এর আগে অনেক যুক্তি দিয়ে আমি দেখিয়েছি যে, আমার বেলায় এই বিধির যথাযথ প্রয়োগ হয়নি। অন্যায় ও অবিচার সুপ্রকট হয়ে উঠেছে। একটি মাত্র কারণ আমি এই বিস্ময়কর আচরণের পেছনে দেখতে পাই: আমার প্রতি এই সরকারের প্রত্যক্ষ প্রতিহিংসা। কারণ? তা আমার অজ্ঞাত।

"আমার বিবেকের দুয়োরে আমি আজ বারবার করাঘাত শুনতে পাচ্ছি। জীবনে এই সংকট মুহূর্তে আমাকে পথ খুঁজে বার করতেই হবে। পারিপার্শ্বিকতার এই ঔদ্ধত্য কি মুখ বুঁজে স্বীকার করে নেবো? অথবা এই ন্যায়-নীতি বিগর্হিত অবিচারের বিরুদ্ধে জানাবো আমার প্রতিবাদ? বিশেষ এবং একাগ্র চিন্তার পর আমি সিদ্ধান্তে

পেঁৗছেও গেছি। এদের এই ঔদ্ধত্যের কাছে আমি নতি স্বীকার করবো না। অন্যায় করার চাইতেও অন্যায়ের কাছে মাথা নত করা গুরুতর অপরাধ। কাজেই প্রতিবাদ আমাকে করতেই হবে।

"কিন্তু প্রতিবাদও কম হয়নি। চিরাচরিত সর্ববিধ প্রতিবাদ জানানো হয়েছে। জানানো হয়েছে সংবাদ-পত্রে, সভা-সমিতিতে। সরকারের কাছে আবেদন, দাবী, আইনানুগ প্রতিকার-চেষ্টা,—বাকি নেই কিছুই। কিন্তু শাসন-যন্ত্রকে টলানো যায়নি। তার প্রাণে বিন্দু পরিমাণ রেখাপাতও করেনি। একটি মাত্র পথ আজো খোলা আছে,—বন্দী-জীবনের শেষ অস্ত্র,—প্রয়োপবেশন বা অনশন।

"যুক্তির অচঞ্চল আলোর পরিপ্রেক্ষিতে বিষয়টি আমি পর্যালোচনা করেছি। ভালো-মন্দ, লাভ-ক্ষতি, দুটোই ভেবে দেখেছি সমান ভাবে। আমার মনে কোনপ্রকার ভ্রান্ত আশা নেই। আমি পরিপূর্ণ সচেতন। আমি জানি, আশু কিম্বা এইক্ষণের কোন সুরাহা এতে ঘটবে না। শাসন-কাঠামো এবং আমলাতান্ত্রিক আচরণ আমার অত্যন্ত জানা। এই মুহূর্তে আমার মন-মুকুরে ভেসে উঠছে টেরেন্স ম্যাক্‌সুইনীর আর যতীন দাসের শাশ্বত এবং অমর আলেখ্য। শাসন-যন্ত্র নিষ্প্রাণ। ও টলে না। গলেও না। কিন্তু এর আছে ভুয়ো বালাই। ও তাই আঁকড়ে পড়ে থাকে।

"আমার জীবনের চারপাশে এক অসহ অবস্থা ভিড় করে আসছে। অন্যায় আর অবিচারের সঙ্গে আপোস করে শুধু বেঁচে থাকবার অধিকার ভোগ করা আমার মূল সত্তার বিরোধী। আপোসের বিনিময়ে বেঁচে থাকার চাইতে মৃত্যু-বরণ আমার কাছে শ্রেয়। সরকারের পাশব শক্তি আমাকে কারাগারে আটকে রাখতে চায়। আমার জবাব স্পষ্ট ঃ মুক্ত করো আমাকে, নইলে এ-জীবনে আমার প্রয়োজন নেই। আমি বাঁচবো কিম্বা মৃত্যুই বরণ করে নেবো, তার বিচার-দায়িত্ব শুধু আমারই।—আর কারো নয়।'

"আমি জানি, এই মুহূর্তে হয়তো কোন প্রত্যক্ষ ফল ফলবে না।

কিন্তু কোন আত্মবলি আর দুঃখ-বরণ বৃথাও যায় না। সর্বদেশে আর সর্বকালে একমাত্র দুঃখ-বরণ আর আত্মাহুতির ভেতর দিয়েই আদর্শ সার্থক ও সুন্দর হয়ে ওঠে। 'শহীদের রক্তের ওপরেই গড়ে ওঠে মন্দির'—শাশ্বত এই বাণী সার্থক হবেই।

"নশ্বর জগৎ। সবই মরে যায় আর যাবেও। কিন্তু আদর্শ, ভাবধারা আর ঊর্ধ্বমুখী স্বপ্ন মরে না। আদর্শের প্রেরণায় ব্যক্তি-বিশেষ হয়তো নিঃশেষ হয়ে যেতে পারে কিন্তু সেই অমৃত আদর্শ সহস্রের ভেতর দিয়ে ফুটে ওঠে। এমনি করেই মৃত্যুর বুকের ওপর ফুটে চলে নবজীবনের নবতম ছন্দ। মৃত্যুবেদী হয়ে ওঠে নব সৃষ্টির প্রসূতি। আদর্শ, ভাবধারা আর স্বপ্ন যুগ থেকে যুগান্তরে রূপায়িত হয়ে ওঠে। আহুতি আর নির্যাতনকে সঙ্গী না করে কোন্ আদর্শই-বা সার্থকতার সন্ধান পেলো?

"বৃহৎ আদর্শ আশ্রয় করে বাঁচা আর মরা,—জীবনে এর চাইতে বড় পাওয়া আর কী আছে? জীবন-কোষের সমিধ দিয়ে অনির্বাণ করে রাখতে হবে প্রাণ-যজ্ঞের হোমাগ্নি। অসমাপ্ত কর্মযোগ পূর্ণতা পাবে পরবর্তী জীবনে। মৃত্যুর বিনিময়ে যে-জীবন উঠলো ফুটে, তার ধ্রুব বাণী পাহাড় ডিঙিয়ে, উপত্যকার ওপর দিয়ে ছড়িয়ে পড়বে তার দেশ-জননীর শ্যামল বুকে। দিগ্‌বিদিকে। সাগর ডিঙিয়ে সুদূর ভিনদেশের তটভূমি শুনতে পাবে সেই অমর বাণী। আদর্শের বেদীমূলে এমন মহান আত্মোৎসর্গের মধ্যেই-না লুকিয়ে থাকে জীবনের মহোত্তম অবলুপ্তি।

"কে বলে নিজেকে নিঃশেষে বিলিয়ে দিয়ে সর্বহারা হতে হয়? মাটির পৃথিবীর কোলে ঢলে পড়েও আর জীবন কি ফুটে উঠবে না শতদল পদ্মের মতো,—যার মর্মকোষে ভরা থাকে অমৃতের ঝর্ণাধারা?

"এই অবিনশ্বরতাই আত্মার প্রকৃত রূপ। ব্যক্তির মৃত্যুর বুকে জাতির জীবন ফুটে উঠুক। তাইতো এমন করে আজ মৃত্যু আমার কাম্য আর প্রিয় হয়ে হঠেছে। আমার জীবনের বিনিময়ে আমার

স্বদেশ আমার ভারতবর্ষ লাভ করবে অবিনশ্বের জীবন, পাবে স্বাধীনতা, পাবে অনন্ত ঐশ্বর্যের উপচার।

"এইবার আমার দেশবাসীকে উদ্দেশ করে বলবোঃ একথাটা ভুলো না যে, দাসত্বের চাইতে বড় অভিশাপ আর নেই। ভুলে যেয়ো না যে, অবিচার আর দুর্নীতির সঙ্গে আপোস করবার চাইতে বড় অপরাধ আর নেই। মনে রেখো সেই শাশ্বত নীতিঃ জীবনকে পরিপূর্ণ করে পেতে হলে জীবনের বিনিময়েই তা পেতে হবে। আর মনে রেখো, সর্বোচ্চ ক্ষয় ও ক্ষতি স্বীকার করে অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাতে হবে অবিরাম।

"বর্তমান সরকারকে আমি বলে যেতে চাইঃ সাম্প্রদায়িকতা আর অবিচারের পথে আপনাদের ঐ উন্মাদ অভিযান সংহত করুন। আজো সময় আছে, আপনাদের পদক্ষেপ সংযত করুন। আপনাদের তৈরি মৃত্যুবাণে একদিন আপনাদের প্রাণ-সংশয় হবে। বাংলার বুকে আর একটা সিন্ধু সৃষ্টি করবেন না।

"আমার বলা শেষ। আমার দ্বিতীয় ও শেষ অনুরোধ আপনাদের কাছে, আমার অনশন নিয়ে কোন প্রকার বলপ্রয়োগ যেন না করা হয়। আমার শেষ সময় ঘনিয়ে আসুক শান্তির কোলে, এইটুকুই আপনাদের কাছে কামনা রইলো। টেরেন্‌স্ ম্যাকসুইনী, যতীন দাশ, মহাত্মা গান্ধী এবং ১৯৬২এ আমাদের ক্ষেত্রেও সরকার অনশন সম্পর্কে কোন প্রকার হস্তক্ষেপ না করবার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। আমি আশা করবো, এবারও অনুরূপ সিদ্ধান্তই নেয়া হবে। নতুবা আমাকে গায়ের জোরে খাওয়াবার চেষ্টা করলে আমি আমার সমস্ত শক্তি নিয়ে তা প্রতিরোধ করবো এবং তার পরিণাম হবে আরও ভয়াবহ এবং বিপর্যয়কর।

"আমি ১৯৪০এর ২৯শে নবেম্বর থেকে অনশন শুরু করবো।

প্রেসিডেন্‌সী জেল,
২৬. ১১. ৪০

ভবদীয়
শ্রীসুভাষচন্দ্র বসু"

"পুনশ্চ ঃ পূর্ব পূর্ব অনশনে আমি নুন-জল খেয়েছি তাই খাবো। এবারও তাই খাবো। তবে প্রয়োজন বোধ করলে পরে তা-ও না খেতে পারি।

স. চ. ব"

কল্পনার গায়ে রং লেগেছে নিশ্চয়ই, কিন্তু ওর সঙ্গে বেদনার তীক্ষ্ণ তীব্র জ্বালাও কম ছিল না। আমার মুক্তি,—যদি হয়ই,— আর নেতার অনশন একই সঙ্গে শুরু হবে। এই নির্বান্ধব পুরীতে না খেয়ে নেতা পড়ে থাকবেন একা। কাছে থাকবে না কেউ। বড় জোর ওরা জনা-দুই ফালতু দেবে। তারপর দেহ অচল হতে থাকলে পাঠিয়ে দেবে হাসপাতালে।

অস্বস্তির অন্ত ছিল না। নেতার চিঠি পড়বার পূর্ব-পর্যন্ত কল্পনা নিয়ে বুঁদ হয়ে ছিলাম। কিন্তু এই নতুন সমস্যা সত্যিই আমাকে অস্থির করে তুলল।

বড় হবার মাশুল। কেউ কোনদিন এই মাশুল না দিয়ে বড় হতে পারেনি। মাশুলের পরিমাণের ওপর বৃহত্ত্বের পরিমাপ নির্ভর করে। যে যত মাশুল দেবে, তত হবে সে বৃহৎ।

কিন্তু বড় হতে চেয়েই কি শুধু এঁরা এমনি করে নিজেকে পুড়িয়ে খাঁক করে দেন? বড় হতে চাইলেই কি বড় হওয়া যায়? দুঃখ ও নির্যাতন সওয়াই কি বড় হবার এক মাত্র পথ?

চোখের ওপর এই মানুষটি কী অপর্যাপ্ত বৃহত্ত্বের মহিমা নিয়েই-না ফুটে উঠছেন। উনিও কি বড় হলেন এবং আরও হবেন শুধু বড় হতে চেয়েই?

কারাদণ্ড, নির্বাসন, দেশান্তর, লাঠি,—কী না গেছে এঁর ওপর দিয়ে? সামান্য ক'টা গোনা দিন হাতে পেয়েছিলেন নিজেকে দাঁড় করাতে। ১৯২১; ১৯২৪ থেকে' ২৭; ৩০; '৩১ থেকে' ৩৭; '৪০এ আবার সেই কারাগার। মাঝে মধ্যে খুচরোরও অভাব নেই।

এঁর চাইতেও অনেকে অনেক বেশি নির্যাতন আর দুঃখ ভোগ

করেছে প্রায় জীবনভোর। তারা বড় হল না কেন? তাদের মাথা আর সকলের মাথা ছাড়িয়ে কেন উঠল না?

একেই কি লোকে প্রাক্তন বলে? সুভাষ বোসকে বৃহৎ হতে হবে, এই কি ছিল তাঁর ভবিতব্য? কোন্-সে তত্ত্ব, কোন্-সে উপাদান, কোন্-সে রহস্যময় ঐশ্বর্য, যা ছিল বলে সুভাষ বোস হলেন নেতা,—আর নেতা থেকে নেতাজি?

জানিনে সবটা; তবু মনে হয় খানিকটা বুঝি। প্রাণ সম্পদের অপরিমেয়তা। সঙ্কীর্ণ মমত্বের গণ্ডী পেরিয়ে যে যেমন আর যতখানি নিজেকে সহস্রের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে পেরেছে,—নির্ব্যক্তিক নয়, সর্ব-ব্যক্তিক করে একককে অনেকের সঙ্গে মিশিয়ে দিতে পেরেছে,—সেই তত বড় হয়েছে আর পূজোও পেয়েছে তত বেশি। বড় হয়েছে সবাইকে দিয়ে। বড় হয়েছে সবাই-এর তা নিয়ে। যে দিয়েছে, সেই পেয়েছে। পেয়েছে নিজেকে অনেকের সঙ্গে। দেখেছে আপনাকে সহস্রের মধ্যে। একোঽহং বহু স্যাম্।

সংসার ছিল, হারিয়ে গেল। উচ্চাশার বোনেদ ছিল, ভেঙে গেল। মানবিক আর আর চাওয়াও কি না-ই ছিল? কোথায় গেল?

সব হারিয়ে, সব খুইয়ে, এই-যে অনির্দেশ, অ-দেখা, অ-পাওয়ার পেছনে উল্কার মতো ছোটা, এর শেষ কোথায়? সমাপ্তিও কি আছে?

আছে। সমাপ্তি সেই জীবন। মৃত্যুহীন জীবন। অমৃত জীবন। যে-জীবনের স্পর্শে শত জীবন ফুটে উঠে; জন্মে নেয়।

সেই জীবন গড়ে উঠতে দেখছি চোখের ওপর প্রতিদিন। নিজের বলতে আর কিছু অবশিষ্ট নেই। নিজ হয়ে গেছে সব। এক হয়ে গেল বহু। দেশ। জাতি।

কল্পনার ওপর কল্পনা, পরিকল্পনার ওপর পরিকল্পনা। হয়তো সবটাই স্বপ্ন। কিন্তু সেই স্বপ্নই যদি মুহূর্তের জন্য রূপ নিয়ে ফুটে ওঠে? হয়ে ওঠে বাস্তব? প্রত্যক্ষ?

জন্ম সার্থক। জননী কৃতার্থা।

অপরাহ্ণ। নরম রোদ পড়েছে গাছের ডগায়। ঝলমল করছে।

প্রায় সব ভুলে নিজের চিন্তায় ডুবে ছিলাম। নেতা নিজের ঘর থেকে বেরিয়ে আমার সামনে চেয়ারে বসে পড়লেন। সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলেন ঃ

"অমন করে কী ভাবছো ?"

"বলবো ?"

"বলো।"

"আচ্ছা, সারা জীবনে কি কোন মানুষ, মানে, কোন নারী আপনাকে টানেনি ?"

হো হো করে হেসে উঠলেন। হেসেই চলেছেন। একটু বাদে বললেন ঃ "হঠাৎ এ-কথাটা মনে উঠলো কেন ?"

"কেন ?"—থেমে গেলাম। কেমন করে বোঝাব এই মানুষকে যে, সংসার মানে কী। স্ত্রী-পুত্র কেমন। তবু বললাম ঃ "এই যে অনিশ্চিত অন্ধকার পথে ছোটা,—এমন কি কেউ নেই, যে শুধু সেই পথের দিকে থাকবে চেয়ে ?"

"আমার দিকে কেউ চেয়ে থাকবে কিনা জানিনে কিন্তু আমি থাকবো অনেকের দিকে চেয়ে।"

"মানে ?"

"শোনো। তুমি জানতে চাইছো আমি কোন নারীকে জীবনে কামনা করেছি কিনা। এই তো ?"

"বলুন।"

"করেছি। অনেক করেছি। দিন-রাত ছটফট করেছি। ভুলে যাও কেন যে, আমিও মানুষ। মানুষ ওটা চাইবেই। ঠাকুর রামকৃষ্ণের মতো মানুষও চাইতেন। মা ঠাকুরুণ দক্ষিণেশ্বর ছেড়ে কোথাও গেলেই খুঁত খুঁত করতেন।"

"তবে বিয়ে করলেন না কেন ?"

"কেন ? সে অনেক কথা।" থেমে গেলেন। পরক্ষণেই হেসে বললেন: "সময় পেলাম কোথায় ?"

সত্যিই তো সময় কোথায় ?

ওঁর বিয়ের প্রসঙ্গ আমিও খানিকটা জানতাম। বিলেত থেকে প্রথমবার ফিরে আসবার সঙ্গে সঙ্গে এক ঝাঁক মেয়ের মা উজিয়ে উঠেছিলেন। কয়েকজন মেয়েও। একজন তো আত্মহত্যাই করে বসল। আর একজনও অনেকদূর এগিয়েছিলেন। বন্ধু হেমন্ত সরকারের মাধ্যমে খবরা-খবর নেয়া হত। জেলখানায় বই আর খাবারও যেত। হেমন্তবাবু প্রথমটায় ভেবেছিলেন যে, তিনিই লক্ষ্য। এবং বলা বাহুল্য বেশ পুলকিতও হয়ে উঠেছিলেন। পরে তাঁর ভুল ভেঙেছিল।

দেশবন্ধুর জীবিতকালে এক মেয়ের পিতা নগদে এক লক্ষ টাকা আর তাঁর এম. এ. পাশ মেয়েটিকে নিয়ে দেশবন্ধুর দ্বারস্থ হয়েছিলেন। দেশবন্ধু তখন তিলক স্বরাজ ভাণ্ডার নিয়ে হিমশিম খাচ্ছেন। বাংলার বরাদ্দ টাকা উঠবে কি উঠবে না, এই নিয়ে তাঁর দুশ্চিন্তার অবধি ছিল না। অকস্মাৎ এল এই প্রস্তব। টেলিফোনে সুভাষকে ডেকে খেতে বসলেন। খাওয়া শেষ হবার পূর্বেই সুভাষ এসে হাজির। খেতে খেতেই বললেন: "ও সুভাষ, নগদ এক লক্ষ টাকা একজন দিতে চাইছে আমাদের ভাণ্ডারে। তুমি একটু রাজী হলেই টাকাটা ঘরে তুলতে পারি।"

মাতা বাসন্তী দেবী বসেছিলেন পাশেই। হাসির দমকে দেহ ওঁর কেঁপে কেঁপে উঠছিল। মুখে আঁচল চেপে জোর করে তবু বসেই থাকলেন।

বেচারা সুভাষ। কল্পনাও করেননি যে, এমনি একটা ষড়যন্ত্র চলছে। দিব্যি প্রাণখোলা হাসি হেসে বলে বসলেন: "বলুন কী করতে হবে। আমি রাজী হবো না, একথা ভাবলেন কী করে ?"

"তাই তো। আমি কী আর তা জানিনে ? তবু একবার

জিজ্ঞেস করে জেনে নিলুম। আর কিছু নয়, একটি মেয়েকে শুধু বিয়ে করতে হবে—"

কাছে ছিলাম না। দেখিওনি। কিন্তু দৃশ্যটা নিখুঁতভাবে চোখে দেখাতে পাচ্ছি। সুভাষচন্দ্র পাথর হয়ে গিয়েছিলেন নিশ্চয়ই। মুখে রা তো ছিলই না, চোখের পলকও কি পড়েছিল? চেয়েছিলেন দেশবন্ধুর দিকে। ততক্ষণে, আর চেপে থাকতে না পেরে মাতা বাসন্তী দেবী দ্রুত পাশের ঘরে ঢুকেও পড়েছিলেন।

"তা হলে—" দেশবন্ধুর কথা আর সমাপ্ত হয়নি। সুভাষ আত্মস্থ হয়ে জবাব দিয়েছিলেনঃ "আপমি ব্যস্ত হবেন না। আমি লক্ষ টাকা ভিক্ষে করে আপনাকে এনে দেবো।"

সত্যিই তো, সুভাষ সময় পেলেন কোথায় বিয়ে করবার?

আরও কথা বলবার ছিল। ছিল শোনাবারও। হল না। পাটনি আসছেন সুনীল বোসকে নিয়ে। নেতা সঙ্গে সঙ্গে বিছানায় শুয়ে পড়লেন। ভয়ানক অসুস্থ যে।

খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব দেখছেন ডাক্তার দাদা। নাড়ীর গতি দেখলেন, দেখলেন ব্লাডপ্রেসার। জিভ, বুক, পিঠ,—বাদ গেল না কিছুই। চোখ তুলে পাটনিকে বললেনঃ "অনেকটা ভালো দেখছি।"

"কিন্তু মন্দ হবার দেরিও-যে নেই।"

"তাই তো। তা—", নেতার দিকে চেয়ে বললেনঃ "ইন্‌জেক্‌শ্যানটা নিতে আপত্তি কোথায়?"

"না।"

ডাক্তার ও দাদা সুনীলবাবু জানতেন যে, এ-না কোনক্রমেই হাঁ হবার নয়।

যন্ত্রপাতি গুছিয়ে নিয়ে চলে গেলেন সুনীলবাবু। সঙ্গে গেলেন পাটনি। নেতা শুয়েই ছিলেন। ক্ষণকাল পরই ফিরে এলেন পাটনি। আমি পাশের চেয়ারে বসে ছিলাম। আর একখানা

চেয়ার টেনে নিয়ে বসেই পাটনি বলে উঠলেন : "একটা কথা বলতে এলাম মিঃ বোস।"

"বলুন।"

"এ-পথে না গেলেই কি নয় ?"

"আমার চিঠি আপনি তো পড়েছেন।"

"তা পড়েছি। কিন্তু আমি ভাবছি অন্য কথা। ওদের প্রাণ গলবে না। ওরা অন্য ধাতের।"

"নাও গলতে পারে। এক ধাতের হয়েও আমাদের সবাই কি একই রকম ? হয়তো দেখবেন, ওদেরি গলবে। গলবে না তাদের যাদের আমরা মনে করি খুবই আপন।"

একটুক্ষণ নেতার মুখের দিকে চেয়ে থাকলেন পাটনি। তারপর চোখ দুটো বাইরের দিকে ফিরিয়ে বললেন : "এদেশের দুর্ভাগ্য। আমি চলি।"

উঠে কয়েক পা গিয়েই আবার পাটনি ফিরে এলেন। বললেন : "আমার অনুরোধ রইলো মিঃ বোস, যখন যা লাগবে, জানাতে দ্বিধা করবেন না।"

নতমুখে পাটনি বেরিয়ে গেলেন। মুখখানা থমথম করছিল। ওঁর সামনে, এই জেলখানায়, এই প্রাণটির কোন অমঙ্গল ঘটবে না তো ? প্রশ্নটা পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে পাটনির চিন্তাক্লিষ্ট মুখে আর চোখেও।

আমরা বেরিয়ে দালানে গিয়ে বসলাম।

বসে থাকতে থাকতেই নামল বৃষ্টি। সঙ্গে প্রবল হওয়া। ঝড়ই বলা চলে। ঝাপটায় ভিজে গেল গোটা দালানটা। ওপাড়ে বড় বড় গাছ মাতামাতি শুরু করেছে। হয়ে উঠেছে মাতাল।

দুজনেই ঘরে এসে ঢুকলাম। ওঁর ঘরে। আলো জ্বেলে বসতেই নেতা বলে উঠলেন : "অনেক দিনের কথা। এই সময়ে খুব বড় একটা ঝড় হয়েছিলো। মনে আছে তোমার ?"

"হ্যাঁ।"

"রাত্রিবেলার ঝড় আমার বড় ভাল লাগে। মনে পড়ে কবির গান: 'ঝড়ের রাতে তোমার অভিসার।" একটু থামলেন। আবার বললেন: দুর্যোগের ওপারেই থাকে সুযোগ। না জেনে দুর্যোগ দেখে আমরা ভয় পাই।"

গুন্ গুন্ করে গান গাইছেন না? অস্ফুট সুর। কণ্ঠের মৃদু চাপে একটু একটু করে সুর বেরিয়ে আসছে। রেডিওটার দিকে চোখ ফিরিয়ে আমি ধরবার চেষ্টা করি।

চলল খানিকক্ষণ। সহসা বলে উঠলেন: "শিবাজীর পালাবার কাহিনীটা তোমার মনে আছে?"

"আছে।"

শিবাজী কথা আমার ভালোই পড়া ছিল। বলে চললাম। সেদিন তাঁর জীবনেও দেখা দিয়েছিল এমনি কারাবাস। অমিতবিক্রম মোগল-সম্রাটের অগাধ শক্তি-প্রাচুর্যের বিরুদ্ধে একাকী দাঁড়িয়েছিলেন এই নগণ্য নাম-না-জানা জায়গীরদারপুত্র। হটকারী শিবাজী। সেদিনকার বিজ্ঞ আর প্রাজ্ঞদের অনুজ্ঞা অনুসরণ না করে, তাদের আদর্শ অগ্রাহ্য করে স্বপ্ন দেখেছিলেন দেশ উদ্ধারের। দুরাশা নয়?

কিন্তু কৈশোরের সেই স্বপ্নই বাস্তব হয়ে উঠল। রূপ নিল। যার ফলে স্বপ্ন হল বাস্তব, তার সঙ্গে অচ্ছেদ্য সম্পর্ক ছিল তাঁর ঐতিহাসিক পলায়নের। ঔরংজেবের সদাসতর্ক দৃষ্টি আর পাহারা তাঁকে আটকে রাখতে পারেনি কারাগারে।

কথা সাঙ্গ হল। দুজনে বেরিয়ে এলাম। দালানের উত্তর দিকটা খোলা। সেই দিকে মুখ করে দাঁড়ালেন। সন্ধ্যার নীল ছায়ায় ঢেকে গেছে চরাচর। তখনও ঝড় থামেনি। বৃষ্টি কমেছে। উন্মাদিনী প্রকৃতির দিকে তাকিয়ে আছেন আর একজন শিবাজী। মুখোমুখী।

২৮শে নবেম্বর, ১৯৪০।

নেতা অন্যদিনের চাইতে সকালে উঠেছেন। চা খেতে খেতে

বললেন ঃ "জিনিসপত্তোর অমনি থাক। আমি গুছিয়ে রাখবোখন। চিঠির সাবানটা থাকবে তোমার স্যুটকেসের মধ্যেই। কামাবার অন্য সব জিনিসের সঙ্গে। আজকে ঐ সাবান দিয়ে কামিয়ে নিয়ো।"

চা শেষ হতেই নটা বেজে গেল। ১১টার মধ্যেই তৈরী হয়ে থাকতে হবে। সার্জেন্ট এসে বলে গেল মোকদ্দমার কথা। রায়ের তারিখ। ভবিষ্যতের নির্দেশ নিয়ে আসছে এই দিনটি। শেষ দিন।

কোন কাজেই মন বসছিল না। পাঁচ মাস গৃহছাড়া। সবাই মাঝে মাঝে দেখা করে যায় সত্যিই, কিন্তু জীবন তো বন্দীরই। তবু এইক্ষণে মুক্তি-সম্ভাবনায় মন উৎফুল্ল হয়ে উঠল কৈ ?

আগামী কাল থেকে নেতা অনশন করবেন। আগামী কাল,—যদি মুক্তি পাই-ই,-- আমি থাকব কোথায় ? নিজের গৃহে। স্ত্রী পুত্র কন্যা-আত্মীয়-স্বজন ধুম করে আসবে উল্লাস জানাতে। তখনও কি এই মানুষটি,—কারাগারের সঙ্গীহীন নির্মম শূন্যতার মাঝখানে যিনি পড়ে থাকলেন একা,—তাঁর কথা মনে পড়বেই ?

কোন বন্দীকেই ওরা-নির্দিষ্ট মহল ছাড়া রাতে থাকতে দেয় না। জেলের ভাষায় সেই স্থানের নাম 'নম্বর'। ঘণ্টার শব্দ হতে না-হতে ফালতুরা চলে যায় যার যার নম্বরে। ওঁর কাছে থাকবে কে ? দীপহীন রাত্রির অন্ধকারে যদি তেষ্টা পায় ? যদি জল খেতে উঠে পড়েন ? যদি মাথা ঘুরে পড়েই যান ?

অসহায় বন্দী-জীবন। তার চাইতেও অসহায় এই অকাম্য মুক্তি। দুটোই শৃঙ্খলে বাঁধা ! নিজের ইচ্ছায় বন্দী-জীবন হয়নি, মুক্তিও স্বেচ্ছাকৃত নয়। বন্দীরা প্রাণহীন খেলার পুতুল। অলক্ষ্য ইঙ্গিত হাসায়, কাঁদায়, ধরে রাখে, ছেড়ে দেয়।

দশটার ঘণ্টা পড়ল। স্নান করে বাইরে এসে দেখি নেতা নেই। উনিও স্নানের ঘরে। নিজের ঘরে ঢুকে টেবলটার পাশে একটু দাঁড়াই। বইপত্তোর একটু গুছিয়ে রাখি। ঘরের চারপাশটায় চোখ বুলিয়ে নি। আমার ঘর। এখনও। কিন্তু একটু পরই ?

নেতা এসে দাঁড়ালেন দোরের সামনে। বললেন ঃ "খাবে, এসো!"

পাশাপাশি খেতে বসলাম। ফালতু পাচককে বলে খুব সম্ভব দুধ ঘন করিয়ে রেখেছেন। নিজের হাতে ধরে দিলেন আমার থালার পাশে।

খাওয়া শেষ হতেই বললেন ঃ "জামা-কাপড় পরে নাও। এখুনি সার্জেণ্ট আসবে।"

সঙ্গে সঙ্গে এলও। ওকে বাইরে দাঁড়াতে বলে জামা-কাপড় বদলাতে ঘরে ঢুকলাম।

ঘর থেকে বেরিয়ে সোজা নেতার ঘরে ঢুকে পড়লাম। কিন্তু ঘর শূন্য। এমন সময় কোথায় গেলেন? স্নানের ঘরে? পাল্লা খোলা। তবে? পাশের পূজোর ঘর ভেতর থেকে বন্ধ। দাঁড়িয়ে থাকলাম সেই দিকে চেয়ে।

কতক্ষণ ছিলাম? খেয়াল করিনি। দরজা খুলে নেতা বেরিয়ে এলেন। হাতে একটা জবা ফুল। মুখ আরক্ত। ওষ্ঠে ক্ষীণ হাসি।

হাঁটু ভেঙে বসে পড়লাম পায়ের কাছে। পায়ে হাত রাখবার আগেই দু হাতে টেনে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। দুজনের চোখের জলে ভিজে গেল দুজনের বুক।

অবাক বিস্ময়ে সার্জেণ্টটা তাকিয়ে ছিল।

হাতের ফুলটা আমার মাথায় ছুঁইয়ে জামার বুক-পকেটে ঢুকিয়ে দিলেন। আমার নেতা, বন্ধু, সহকর্মী আবছা হয়ে গেল। সামনে এসে দাঁড়ালেন মা। ঠিক তেমনি মমতা। তেমনি চোখের জল।

ত্রস্তপদে নিজের ঘরে ঢুকেই নেতা নিজের গান্ধী-টুপিটা হাতে করে এসে বললেন ঃ "বড্ড রোদ।"

নিজের হাতে টুপিটা মাথায় পরিয়ে দিলেন।[১]

সিঁড়ি বেয়ে নেমে এলাম নিচে। ফটক পার হয়ে ওপারে গেলাম।

১ টুপিটা নেতাজি মিউজিয়ামে রক্ষিত আছে। ওটার এককোণে লেখা আছে, আর. কে.; অর্থাৎ রাঙা কাকাবাবু। ইলার লেখা।

আরও খানিকটা গিয়ে ফিরে তাকালাম। রেলিং-এ দেহভার চাপিয়ে একজোড়া স্থির নেত্র অনিমেষে চেয়ে আছে আমার দিকে।

ফিরে এলাম আবার সেইখানেই। ঘণ্টায় ঘা পড়ল এক, দুই, তিন, চার। ওপরে পা দিয়ে দেখি চা-এর সরঞ্জাম সাজিয়ে বসে আছেন নেতা। প্রশান্ত হাসি মুখ। কল্পনা ভেঙে গেল বলে বিন্দুমাত্রও দুঃখ নেই। বারে বারে জ্বালবি বাতি। একটা গেল। আরেকটা?

বললেন: "বেলা দুটোর পরই মনে হলো, তুমি ফিরে আসছো। তাই চা আর খাইনি।"

বসে পড়লাম।

চা-এ চুমুক দিয়ে আবার বললেন: "কতো?"

"ন মাস।"

"রাবিশ। এদের স্বাধীন বিচার বুদ্ধি নেই। পুলিসের কথায় এরা ওঠে বসে। ক্ল্যাসিফিকেশ্যন করেছে?"

"বি ক্লাস।"

"বল কী? মাথা ওদের খারাপ হয়েই গেছে।"

"তাহলে তো স্বীকার করে নিতে হয় যে মাথা ওদের কোনদিন ছিলো। ইংরেজের পায়ে ওটা ওরা অঞ্জলি দিয়ে রেখেছে অনেকদিন আগেই।"

আর কথা নয়। উঠে পড়লাম। পাটনিকে চিঠি দিতে হবে। শুধু এই রাতটি বাকি। কাল থেকে শুরু হবে নবতম পথে যাত্রা। ওরা সেন্ট্রাল জেলে যাতে এখুনি আমাকে না পাঠায়, তার ব্যবস্থা করতেই হবে। আমি ওঁর পাশে থাকতে চাই। থাকতে চাই এই জেলে।

চিঠি লিখলাম নাজিমুদ্দীনকেও। হোম মিনিস্টার নাজিমুদ্দীন। অনেকবারই তো জেলে আমার শুভাগমন হয়েছে। কিন্তু এ-সম্মান আর কখনও ওরা আমায় দেয়নি। প্রতিবারই করেছে প্রথম শ্রেণী। এ ক্লাস। এবার বি ক্লাস করল কেন? এম. এল. এ. হয়েছি বলে? তাই চিঠির শেষে লিখলাম: "আপনার সঙ্গে একই অ্যাসেমব্লীর সদস্য

হয়েছি বলে কি আমার সামাজিক প্রতিষ্ঠা ও মর্যাদা কমে গেল ? অন্তত আপনার অধীনস্থ ম্যাজিস্ট্রেটও পুলিশ সম্ভবত তাই মনে করে।”

স্নান শেষ করে নেতা দালানে বসেছিলেন। গোধুলির স্মিত হাসি নিভে গেছে। এসেছে রাত্রি। আমি নেতার ঘরে রেডিও খুলে শুনি গান। হরিমতি কীর্তন গাইছিল।

দালানে একটা ফিসফাস আওয়াজ। গানের ফাঁকে কানে আসে। মন দিইনি মোটে। বার বার অশ্রুভেজা কণ্ঠ গেয়ে চলেছে ঃ “তোমার পিরিতি লাগিয়া বঁধুঁয়া কাঁদিয়া জীবন গেল।”

গান শেষ হয়ে গেল। গম্ভীর কণ্ঠ স্পষ্ট হয়ে উঠল। শরৎবাবু। মেজদাদা এসেছেন।

মাথাটা বের করে একটু তাকালাম। হেসে উনি বললেনঃ “হরিমতির গানে যে ডুবে আছো হে। অতিথি তোমার দ্বারে। তুমি নেই।”

ব্যস্ত হয়ে বললাম ঃ “একটু চা করে দি ?”

“থামো তো।” স্নেহমাখা ধমকের সুর। বললেন ঃ “সোজা এ্যাসেমব্লী থেকে আসছি। তোমাদের জন্যে কিছু আনতেই পারলাম না।”

বলেই থমকে গেলেন। মনে পড়ে গেল সহসা। কাল থেকে এখানকার একজন করবে উপোস। আর একজন থাকবে ঠিকই,—হয়তো খেতেও হবে,—কিন্তু সত্যি সত্যিই কি খাবে ? খেতে পারবে ?

আবার রেডিও ধরে বসি। ওঁদের কথার মাঝখানে থাকতে নেই। নিশ্চয় খুবই জরুরী কিছু। নইলে জেল গেটে না ডেকে, সোজা এখানে ওরা শরৎ বোসকে আসতে দিত না। সঙ্গে কেউ নেই। একজন সার্জেন্টও না। কী কথা ? এত কী জরুরী ব্যাপার ?

চলে গানের পর গান। কথার পর কথা। আওয়াজ কমিয়ে দিয়েছি। ওঁদের ব্যাঘাত না ঘটে। গানের দিকে আর মন নেই। কানও নেই। উন্মনা মনে চার-পাশ থেকে রকমারি কথা জাগছে। জাগছে ঝাঁকে ঝাঁকে।

কথা আর শেষ হয় না। চলেইছে। শেষ হল ঘণ্টাখানেক পর। ওঠবার সময় শরৎবাবু কাছে ডাকলেন। বললেন : "তোমার জন্যে এ্যাসেমব্লী কাঁদছে। ফিরে এসো শিগগির শিগগির। চলি আজ।"

চলে গেলেন।

রাত্রিবেলা নেতা আর কিছু খেলেন না। সোডার সঙ্গে মিশিয়ে খানিকটা কমলালেবুর রস খেয়ে তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়লেন।

২৯শে নবেম্বর সকালবেলা। ঘুম থেকে উঠেই আনতে দিলাম টেবল সল্ট। জলে মিশিয়ে খেতে হবে। সকালবেলাই জল ফুটিয়ে ছেঁকে কাঁচের জগে ভরে রাখলাম।

ঘুম থেকে জাগলেন অনেকটা দেরি করে। উঠেই বললেন : "চা খেয়েছো ?"

মাথা নেড়ে জানিয়ে দিলাম, না।

"শোনো। ওটা করবে না। যার যা কাজ, সেটা ঠিকমতো হবে। নইলে টিম ওয়ার্ক হয় না।"

"বুঝলাম। একজনের কাজ না খেয়ে থাকা, আর একজনের কাজ শুয়োরের মত গেলা, এই তো ?"

হেসে ফেললেন। ফালতুকে ডেকে চা আনালেন। রোজকার মতো নিজের হাতে মাখন মাখিয়ে রুটি সামনে ধরে দিলেন। মুখে বললেন : "খাও।"

একখানা রুটি মুখে জোর করে পুরে দিয়ে চুপ করে ওঁর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম।

আবার হাসলেন। বললেন : "রাগ কোরো না। তুমি ঠিক না থাকলে আমাকে দেখবে কে ?"

আমার চোখ থেকে তখন টস টস করে অশ্রু গড়িয়ে পড়ছিল।

পাটনি এসে পড়ায় বাঁচলাম।

দালানের একপ্রান্তে গিয়ে রুটি ফেলে দিলাম।

পাটনির সঙ্গে নেতার কথা হচ্ছিল। নানা কথা। জোলাপ নেয়া হয়েছে কিনা, স্নান দুবেলা নিয়মিত করা, ভালো করে আর বেশি করে ঘুমনো, এমনি সব। নেতার সঙ্গে কথা শেষ করে পাটনি উঠলেন। আমার দিকে এগিয়ে এলেন। আমি একটু দূরে দাঁড়িয়ে ছিলাম।

পাটনি বললেন : "দণ্ড হওয়ায় অন্তত আমি খুব খুশি হয়েছি।"

"কেন ?" জিজ্ঞেস করলাম আমি।

"খুব ভাবনায় পড়েছিলাম। দিনের জন্যে নয়, রাতের জন্যে। এখানে রাখতাম কাকে ?"

"কিন্তু আমাকে ওরা বি ক্লাস করেছে।"

"সে আমি দেখবো।"

পাটনি চলে গেলেন।

বেলা দশটায় নেতা স্নান করলেন। স্নান সেরে একটু সময় দালানে বসেছিলেন। তারপরই ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়লেন। আমাকে ডেকে স্নান করে খাওয়া সেরে নিতে বললেন। একটু থেমে পরক্ষণেই বলে উঠলেন : "আমাকে কথা দাও, ঠিকমতো খাবে।"

বললাম : "ঠিকমতো খেতে আপনি পারতেন ?"

চুপ করে গেলেন। একটু পর আবার বললেন : "আমি বলে দিচ্ছি, সেইমতো খাবে। সকালে একটা ডিম ও চা। দুপুরে চার চাঁচ ভাত, একটু মাছ, একটু দই। বিকেলে শুধু চাই খেয়ো। রাতে দুধ আর দু পিস রুটি। এতে তো আপত্তি নেই ?"

"নাঃ। এ তো প্রায় উপোসেরই সামিল। আপত্তি আর করবো কী করে ?"

হাসলেন। বললেন : "দেখো, এও এক ধরণের সংযম। যে-কাজ করতে মন কিছুতেই রাজী নয়,—করলেও দুঃখ হয়, যন্ত্রণা হয়,—কর্তব্যের জন্যে তাও করতে হবে। আদর্শের জন্যে ইচ্ছা, অনিচ্ছা, সুখ, দুঃখ, সব না দিতে পারলে প্রেমেই-বা কিসের, আর তার প্রতি অনুরক্তিই-বা কোথায় ?"

চুপ করে থাকা ছাড়া আমার গত্যন্তর ছিল না। জবাব দিলেই আবার এক ঝলক উপদেশ দেবেন। ওতে হবেন ক্লান্ত। নেতা বেশি কথা বলেন, আমি চাইনে।

তাছাড়া, ওঁকে বোঝাবার উপায়ই কি আমার ছিল? আমি বেশ বুঝতে পারছিলাম ওঁর মনের কথা। চোখের সামনে যে-কেউ না খেয়ে থাকলে এমনিতেই খাওয়া হয়ে ওঠে স্বভাবত কষ্টসাধ্য। এ তো নেতার ব্যাপার। উনি জানতেন যে, একই সঙ্গে থেকে ইচ্ছে থাকলেও কি আমি স্বচ্ছন্দচিত্তে খেতে পারব? না, তা যায়ই? স্নেহ ছিল, মমতার বন্ধও ছিল,—কিন্তু তা ছাড়াও ছিল একটা জটিল প্রশ্ন। সরকার, জেলের লোক, বাইরের সহস্র দেশবাসী শুনল, জানল যে, সুভাষ বোস অনশন করছেন। কেউ দুশ্চিন্তিত হল, কেউ হল উদ্বিগ্ন। কিন্তু একথা তো কেউ ভাববেও না যে, ওঁরই সঙ্গে আর এক অসহায় বন্দীও অনাহারের দুর্ভোগ হয়তো অনিচ্ছাতেই বরণ করে নিতে বাধ্য হয়েছে। এই চিন্তাই নেতাকে বেশি চঞ্চল করে তুলেছিল। আর তাই অন্তত উপোসের কষ্ট থেকে আমাকে বাঁচাতে ব্যাকুল হয়ে উঠেছিলেন অতখানি।

সেদিনও ভেবেছি, আজও ভাবি: সুভাষ-জীবনের প্রাণ-কেন্দ্রের গোপন রহস্য কী? আর কোথায়ইবা? কোন সে অমূল্য আর অতুল্য সম্পদ, যা তাঁকে সর্বকার্যে আর সর্বক্ষেত্রে পরিচালিত করেছে, প্রেরণা যুগিয়েছে, করেছে কালজয়ী?

প্রেম। দেশের প্রতি প্রেম, নিজের নেতার প্রতি প্রেম, সহকর্মীদের প্রতি প্রেম। প্রেমের একটা প্রচণ্ড বিস্ফারতা ওঁকে উদ্দাম করেছে, অসহিষ্ণু করেছে, দুর্বার করেছে। প্রেম তাঁকে সর্বহারা করেছে, সঙ্কীর্ণ মমত্বের ঊর্ধ্বে সকল চাওয়া আর পাওয়াকে মিশিয়ে দিয়েছে দেশ ও জাতির মহাসত্তায়।

দুকূল বজায় রাখা ছিল ওঁর স্বধর্মবিরোধী। কূলে কালি দিয়েছিলেন বলেই তাঁর শ্যামা দেশমাতা অমন করে নিভৃতনিলয়ে

ফুটে উঠেছিলেন মূর্ত হয়ে। সুভাষ-জীবনের এই সর্বগ্রাসী প্রেম কোনদিনই অল্পে তুষ্ট হয়নি, রফা বা আপোসে বিশ্বাস করেনি পরিপূর্ণ, নিখাদ, অন্তহীন প্রেমে নিজে হাবুডুবু খেয়েছেন,—অন্যকে, বহুকে ভাসিয়েছেন।

দেশ ও জাতিকে এমন উজাড় করে ভালোবাসতে পেরেছিলেন বলেই জাতি ওঁকে ভুলতে পারে না, দেশ লোকচক্ষুর অন্তরালে সংগোপনে লালন করে ওঁর আগমন প্রতীক্ষা।

ধ্রুবের হরি-কামনা। হরি-প্রেমে উন্মাদ ধ্রুব জড়িয়ে ধরে গাছ, চোখের জলে তাকেই বলে পদ্মপলাশলোচন হরি। জ্ঞানহারা ধ্রুব জাপটে ধরে বনের পশু, আর ভাবে তাকেই তার ইষ্ট বলে। তাই তো দেখি, যেখানে একটু সাদৃশ্য, একটু রহস্যের নিবিড়তা, একটু না-বোঝা আশার ছলনা,—অমনি চেঁচিয়ে ওঠে তাঁর দেশের ভাই,— নেতাজি…নেতাজি…নেতাজি…অমন পাগলের মতো ভালোবাসতে পেরেছিলেন বলেই এমন উন্মাদ ভালোবাসার অফুরন্ত প্রাপ্তি ভরে দিল তাঁকে কানায় কানায়।

খেয়েছিলাম সেদিন। না খেয়ে পারিনি।

খাওয়া শেষ করে নেতার কাছে এসে বসলাম।

নেতা বললেনঃ "রোজ এই সময়টা আমার কাছে বসে মহাভারত পড়বে।"

মহাভারত ওঁর কাছে ছিল। টেনে নিলাম। বললামঃ "কোন্‌টা পড়বো ?"

"পাণ্ডবের অজ্ঞাত বাস।"

পড়ে চললাম। রাজার পুত্র রাজা হয়েও যুধিষ্ঠির হলেন বিদূষক ; ভীম, সুপকার ; অর্জুন হলেন বৃহন্নলা ; নকুল আর সহদেবের একজন হলেন গনৎকার, অন্যজন অশ্ব-চিকিৎসক। আর স্বয়ং দ্রৌপদী হলেন সৈরিন্ধ্রী।

আর কুলের মায়া নয়, নয় শীলের মোহ। পদমর্যাদাও আর পথ

আগলে দাঁড়াবে না। ধ্রুব হয়ে গেছে লক্ষ্য, স্থির হয়ে গেছে সংকল্প। আদর্শের পথে চলতে হবে একমনে। গত জীবনের সকল ঐশ্বর্য আর গৌরব নিঃশেষে ভুলে, বিসর্জন দিয়ে, নবজীবনের অঙ্গীকার সম্বল করে এগিয়ে যেতে হবে আদর্শে পথে।

ইন্দ্রপ্রস্থের রাজার, তাই, বিদূষক হতে আটকালো না। মহাবীর ভীম ক্ষণকালের জন্যও পাচক বৃত্তিকে হীন মনে করে হোঁচট খেলেন না। অপ্রতিদ্বন্দ্বী অর্জুন বরণ করে নিলেন প্রসন্ন মনে ক্লীবের জীবন। মাতা কুন্তীর অতুল্য স্নেহ ও মমতার আড়ালে গড়ে-ওঠা নকুল আর সহদেব বেছে নিলেন এক ঘৃণ্য বৃত্তি। আর দেবদুর্লভ পঞ্চ-পাণ্ডবের নয়ণের মণি, রাজমহিষী পাঞ্চালী পরিচারিকার কাজে নিজেকে সঁপে দিলেন কঠোর হয়ে।

এক বিচিত্র আখ্যায়িকা। ভারত-ইতিহাসের এই অনন্য কাহিনী শুনছেন আগামী দিনের আর এক মহাকাব্যের নায়ক তন্ময় হয়ে। আসন্ন কুরুক্ষেত্রের প্রাক্কালে নিজেকে পরিপূর্ণ আর অটুট করে গড়ে তুলতে সঙ্কল্পের এক বজ্র-দৃঢ় বর্মে নিজেকে আবৃত করবার দুর্জয় পণ জাগছে মনের নিভৃত কন্দরে।

প্রশান্ত প্রসন্নতায় মন আকণ্ঠ ভরে ওঠে। সুভাষ ঘুমিয়ে পড়েন।

বই বন্ধ করে নিঃশব্দে দোর ভেজিয়ে বেরিয়ে এলাম। দালানে এসেই মনে পড়ল একটি কথাঃ দুঃখ, বেদনা, কিম্বা আনন্দ, কোনটাকেই পরিহার করে, এড়িয়ে গিয়ে বৃহৎ আদর্শ সাফল্য পায় না। পায় এদের সঙ্গী করেই। দুঃখও সত্য, সুখও সত্য। বেদনা যেমন আর যতখানি সত্য, আনন্দও তেমনি আর ততখানি সত্য। এসবই আপাত সত্য। কিন্তু সেই চরম আর নির্বিকল্প সত্যের সন্ধান পেতে হলেও এদের ভেতর দিয়েই পেতে হবে। জানতে হবে। এদের ত্যাগ করে নয়। পরিহার করে নয়।

হাজার প্রশ্ন, সহস্র কথা ভিড় করে আসে। পরাধীন দেশ, পরাধীনতা পাপও,—কিন্তু দেশ পরাধীন না হলে, না থাকলে, সুভাষ

বোসকে পেতাম কেমন করে? গান্ধীই কি আসতেন? না, মাতৃপূজোয় শত শত জীবন বলিই হত সম্ভবপর?

স্বাধীন দেশে এঁরা জন্মান না কেন? একজন গ্যারিবল্ডী, একজন ম্যাটসিনি, ওয়াশিংটন আর লেনিন,—কেউই সম্পদের কোলে, শান্তির পরিবেশে জন্মালেন না কেন? মাইকেল কলিনস্ বা ডি ভ্যালেরা, জগলুল আর কামাল, কেন স্বাধীনতার ঐশ্বর্যময় শান্তির পরিবেশে দেখা দেন না?

অন্ধকার আলো নিয়ে আসে। দুঃখ ও বেদনা জন্ম দেয় আনন্দকে। পরাধীনতার ভয়ঙ্কর আঁধার ভেদ করে দেখা দেয় স্বাধীনতার জ্যোতির্ময় সূর্য।

এঁরা সেই আলোকের ঝর্ণা ধারা। সূর্যরথের সারথি।

জানা-শোনা অনেকের কাছেই গোপনে চিঠি দিয়েছিলাম। দেশ বা জাতির কথা সেদিন ক্ষণকালের জন্যও মনে জাগেনি। জেগেছিল শুধু এই মানুষটির কথাই। এমনি করে এত বড় একটা সম্ভাবনা অকালে নিঃশেষ হয়ে যাবে? যাবে লোকচক্ষুর অন্তরালে? একটা কথা কেউ কইবে না? কোন প্রতিবাদ উঠবে না? জাগবে না একটু সাড়াও?

দেশের বুকে সেদিন কোন কথা উঠেছিল কিনা, কোন প্রতিবাদ হয়েছিল কিনা, সাড়া জেগেছিল কিনা, জানিনে। কিন্তু দুর্ভাবনা ঠিকই জেগেছিল কর্তাদের মনে। স্বয়ং নাজিমুদ্দীন অনেক অনুরোধ করেই সেদিন শরৎচন্দ্রকে পাঠিয়েছিলেন।

নেতার কাছে শুনেছিলাম পরক্ষণেই। এ্যাসেম্ব্লী থেকে শরৎবাবুকে ধরে নাজিমুদ্দীন নিয়ে গিয়েছিলেন একটা বড় হোটেলে। সেখানে খেতে খেতে অনুরোধ জানিয়েছিলেন নাজিমুদ্দীন। সুভাষচন্দ্রকে নিরস্ত করতে হবে। এই সর্বনাশা প্রতিবাদে ওরা ভয় পায়। ঘাবড়ে যায়। এ-প্রতিবাদের রূপ নেই,—কিন্তু ভয়ঙ্কর।

মুখে এর কথা নেই কিন্তু বজ্রগর্ভ। চাক্ষুষ শত্রুকে ওরা বোঝে। লড়াইও তাই করতে পারে। কিন্তু এই রূপহীন, শব্দহীন, নামহীন প্রতিরোধ ওরা বোঝে না। ভারতবর্ষের সনাতন প্রতিরোধ। ভগবানের বিরুদ্ধেও এই প্রতিরোধ চালিয়েছে এই জাতি। ধরনা দিয়েছে দেবতার দুয়োরে।

শরৎবাবু নেতাকে নিরস্ত করতে একটি কথাও বলেননি। কিন্তু ওদের দুর্ভাবনার যথাযথ বর্ণনা দিতে কার্পণ্যও করেননি। আর তা শুনে নেতার দৃঢ়তা আরও বেড়েই গিয়েছিল। জরাসন্ধের দুর্বল দেহ-সন্ধিই ভীমকে জয়ী করিয়েছিল।

সমস্ত পুরীটা যেন নিঝুম হয়ে গেছে। কোন শব্দ নেই। নেই হাঁকডাক। সেপাই বা সার্জেণ্ট ওপরে আসে পা টিপে। নিচের সাহেবগুলো কুঁকড়ে গেছে।

রাত্রি নেমে আসে অলস মন্থর পায়ে। তন্দ্রাহীন রাত্রি। জাগর রাত্রি। নেতার গায়ে হাত বুলিয়ে ঘুম পাড়াই। তারপর দালানে এসে বসি। কমজোরি আলো বাইরে। দূর বড় বড় গাছের জমাট জাঙ্গাল। চাপ-বাঁধা আঁধারের বুকে জোনাকী জ্বলে। ঝিঁ ঝিঁ পোকা ডাকে। মাঝে মাঝে উৎকর্ণ হয়ে শুনতে চাই নেতার শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ। অসহায় নিঃসঙ্গতায় ভয় পাই।

সকালে ডাক্তার আসেন। একটু বেলা করে আসেন পাটনি। নাড়ি দেখেন। বুক দেখেন। ব্লাডপ্রেসার পরীক্ষা করেন। পাটনির মুখ আরও থমথমে হতে থাকে। তৃতীয় দিন কাটে। কাটে চতুর্থ দিনও।

পঞ্চম দিনে ডাক্তার চঞ্চল হয়ে ওঠেন। বার বার নাড়ির গতি মেলান ঘড়ির সঙ্গে। ত্রস্ত পায়ে বাইরে আসেন। ইঙ্গিতে আমাকে ডেকে বলেন: "আমার ভালো লাগছে না মোটেই। বড্ড বেশি দুর্বল হয়ে পড়েছেন। বড় সাহেবকে খবর দিগে।"

চলে যান ডাক্তার।

কাছে গিয়ে বসি। চোখ মেলে চান। এক ফালি হাসি

ঠোঁটের ডগায় এসে থেমে যায়। বলেন: "ওরা হয়তো জোর করে খাওয়াতে চাইতে পারে। প্যাডখানা দাও তো।"

এগিয়ে দি। হাতে তুলে দি কলম। প্যাডে আগে থেকেই খানিকটা লেখা ছিল। বুকের নিচে বালিশ জড়ো করে লিখতে থাকেন:

"মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী,

এবং

মন্ত্রী-সভার সভ্যমহাশয়গণ,

"প্রিয় মহাশয়গণ,

"এই পত্রেই আপনাদের কাছে আমার শেষ আবেদন জানাবো:

"(১) এর আগেই সরকারকে আমি অনুরোধ জানিয়েছি, আমাকে জোর করে না খাওয়াতে। এবং এ-কথাও জানিয়েছি যে, আমার অনুরোধ সত্ত্বেও যদি সে-চেষ্টা হয়ই, আমি আমার সমগ্র শক্তি দিয়ে তা প্রতিরোধ করতে সচেষ্ট হবো। এর পরিণাম হয়তো হবে আরো ভয়াবহ এবং বিপর্যয়কর।

"(২) প্রেসিডেন্স জেলের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টকে লেখা আমার ৩০শে অক্টোবরের চিঠিতে এবং সরকারকে লেখা ২৬শে নবেম্বরের চিঠিতে আমার বর্তমান অবস্থা আমি অত্যন্ত পরিস্ফুট করে উপস্থাপিত করেছি। জেল কর্তৃপক্ষের কানাঘুষো থেকে আমার মনে হয়েছে যে, আমার বেলায় জোর করে খাওয়াবার কল্পনা এখনো পরিত্যক্ত হয়নি। আমি এতে বিস্মিত হয়েছি।

"(৩) ঐ দুই পত্রে আমি যে-সব যুক্তি দেখিয়েছি, তার পুনরাবতারণা করা আমার ইচ্ছা নয়, কিন্তু বিষয়টি সংক্ষেপে বিবৃত করা ছাড়া আমার উপায়ও নেই।

"(৪) বর্তমান পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে আমাকে গায়ের জোরে খাওয়াবার কোন প্রকার চেষ্টা করা সরকারের তরফ থেকে হবে সম্পূর্ণ বে আইনী কাজ।

"(৫) সরকার, তাঁদের বিচারহীন, বেআইনী, এবং উগ্র

সাম্প্রদায়িক কাজের দ্বারা প্রথমত আমার জীবন করে তুলেছেন দুর্বহ, এবং এই অবস্থায় আমাকে জোর করে খাইয়ে বাঁচিয়ে রাখবার চেষ্টার পেছনে তাঁদের নৈতিক অধিকার কোথায় ?

"(৬) এই বিষয়ে গভর্ণমেণ্ট আইনত বল প্রয়োগ করতে পারেন, এমন কোন আইন আমার জানা নেই। সরকারের কোন বিশেষ বিভাগীয় বিধি আইনের স্থান গ্রহণ করতে পারে না। বিশেষ করে যখন সেই সরকারই ব্যক্তিবিশেষের মৌলিক অধিকার ও স্বাধীনতা হরণ করে থাকে।

"(৭) আমার পুনঃ পুনঃ অনুরোধ সত্ত্বেও যদি সত্যি সত্যি আমাকে জোর করে খাওয়াতে চেষ্টা করাই হয়, এতে করে আমার দেহ ও মনের ওপর যে-আঘাত দেয়া হবে, এবং আমি যে-কষ্ট পাবো, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে যারা এ কাজের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকবে, তাদের প্রত্যেককে নাগরিক অধিকার ভঙ্গের এবং ঘৃণ্য অপরাধের অনুষ্ঠাতা হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করতেই হবে।

"(৮) এতো গেল নীতিগত আপত্তি। অনশনের পূর্বে এবং অনশন শুরু করবার পর থেকে আমার দেহ যে-অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে, তাতে জোর করে খাওয়াবার কথা চিন্তা করাও হবে অসঙ্গত। এই অবস্থায়, একথাটা অত্যন্ত পরিস্ফুট যে, বলপ্রয়োগের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হতে বাধ্য। আমাকে দীর্ঘদিন বাঁচিয়ে রাখবার পরিবর্তে, বলপ্রয়োগ আমার মৃত্যুকে ত্বরান্বিত করবে। এবং এর ফলে সাধারণ বিধি ও দণ্ড-আইনের দায়িত্ব আরো বেড়েই যাবে।

"(৯) এই সম্পর্কে আমার মনোভাব আপনাদের গোচরে আনা সঙ্গত মনে করি! যদি আমার অসম্মতি ও প্রতিবাদ সত্ত্বেও বল-প্রয়োগ করা আপনাদের সিদ্ধান্তই হয়ে থাকে, এই অসহ্য, দীর্ঘ ও বিলম্বিত যন্ত্রণার হাত থেকে পরিত্রাণের পথও আমাকে খুঁজে বের করতে হবে। আত্মহত্যাই সেই পথ। আর এর সকল দায়িত্ব বহন করতে হবে সরকারকে। যে-ব্যক্তি জীবনের প্রতি সকল

আকর্ষণ হারিয়ে ফেলেছে, তার পক্ষে আত্মহত্যার সহস্র পথ থাকবে উন্মুক্ত। জাগতিক কোন শক্তি তাকে বাধা দিতে পারবে না। আমি সব চেয়ে শান্তির পথ বেছে নিয়েছি। আমার এই পথ থেকে গায়ের জোরে সরাতে গেলে আমার মৃত্যুর দুয়োর রুদ্ধ হবে না, কিন্তু পথ হবে শান্তিহীন এবং আরো কষ্টকর। আমার এই অনশন সাধারণ উপোস নয়। এর পেছনে রয়েছে অনেক দিনের সতর্ক এবং নিঃসংশয় সিদ্ধান্ত। আর এই অঙ্গীকার গ্রহণ করেছি আমি পবিত্র কালী-পূজোর তিথিতে। আমার এ অঙ্গীকার পূজোরই নামান্তর।

"(১০) আগে অনেকবার আমি প্রায়োপবেশন করেছি, কিন্তু এই অনশনের রূপ সত্যিই সম্পূর্ণ পৃথক। এই প্রকার অনশন আমার জীবনে এই প্রথম।

"(১১) শুধু খাদ্যই মানুষের জীবন ধারণের পক্ষে যথেষ্ট নয়। তাকে সত্যি সত্যি বাঁচবার মতো বেঁচে থাকতে হলে নৈতিক প্রেরণা চাই। চাই আধ্যাত্মিক প্রেরণা। এ থেকে বঞ্চিত করে তাকে দিয়ে কারো কারো স্বার্থ বা কূট-কৌশল চরিতার্থ হতে পারে, কিন্তু যথার্থ বাঁচা তাকে বলে না।

"(১২) গত ২৬শে নবেম্বরের চিঠিতেই আমি আপনাদের বলেছি যে, আমার মাত্র দুটি অনুরোধ থাকলো আপনাদের কাছে। ২৬শে তারিখের চিঠিখানা আমার শেষ ইচ্ছা-পত্র বা উইল। সরকারী মহাফেজখানায় চিঠিখানা সযত্নে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে আমার প্রথম অনুরোধ; আমাকে আমার আকাঙ্ক্ষিত সমাপ্তি-পথে যেতে দিন শান্তিতে, এই আমার দ্বিতীয় অনুরোধ। খুবই কি বেশি কিছু চেয়েছি?'

প্রেসিডেন্সী জেল, ভবদীয়

২।৫।১২।৪০ শ্রীসুভাষচন্দ্র বসু"

১। নেতা চিঠিখানা লিখতে শুরু করেছিলেন ২রা তারিখ, শেষ করেন ৫ই ডিসেম্বর। ঐ দিনই চিঠিখানা পাঠিয়ে দেয়া হয়। সবগুলি চিঠিই সম্প্রতি 'ক্রশ রোডে' প্রকাশিত হয়েছে।

লেখা শেষ করে বালিশের ওপর মাথাটা কাত করে খানিকক্ষণ চুপ করে শুয়ে থাকলেন। চোখ বুজে। বুঝলাম ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন। আঙ্গুলের ফাঁকে কলমটা তখনও ধরা, আস্তে টেনে নিলাম। প্যাডখানা সরিয়ে রাখলাম।

রণক্লান্ত সৈনিক। চোখের নিচে কালি জমেছে। শুভ্রললাট নিষ্প্রভ। কারাগারের অপ্রশস্ত কক্ষে শুয়ে, তবু মনে হয় একটি দীপশিখা জ্বলছে।

পাটনি এলেন। পাশে বসে আমি পায়ে হাত বুলোচ্ছিলাম। নেতার মুখের দিকে চেয়ে পাটনি স্থির হয়ে গেলেন। দৃষ্টি একাগ্র করে তাকিয়ে থাকলেন নেতার মুখের দিকে। আস্তে হাতখানা তুলে নিয়ে নাড়ি দেখলেন। অপ্রসন্ন মুখে বেরিয়ে গেলেন। পেছনে পেছনে আমি।

দালানের উত্তর প্রান্তে দুজন দাঁড়ালাম। পাটনি বললেন: আমি অবাক হয়ে ভাবছি এদেশের নেতাদের কথা। একটা কথাও কি ওঁরা বলবেন না?”

লজ্জায় ধিক্কারে নিজেকেই অপরাধী মনে হয়। ইংরেজের বেতনভুক্ত ভৃত্যও আজ কথা বলতে চায়। কিন্তু এঁর সামনে কেমন করে আমি বলব আর এঁকে বোঝাব যে, অনন্ত দুঃখ আর অভিশাপের পশরা নিয়ে যে-জাতি সহস্র বৎসর পরাধীন হয়ে থাকে তার দশা এমনই হয়।

পাটনি বলেই চলেছেন: “একটা কথাও যদি বেরোতো গান্ধী বা জহরলালের মুখ থেকে,—বুঝতাম, ওঁরা শুধু নেতাই নন, মানুষও।”

দুঃসহ গ্লানির প্রবল ধাক্কা এসে গায়ে লাগে। মুহূর্তে গান্ধী-জহরলালের ব্যক্তি-রূপ দূরে সরে দাঁড়ায়। সামনে এস দাঁড়ায় আত্মীয়তার মমত্ব। বলি: “ওঁদের কোন দোষ নেই। মিঃ বোস নিজেই চান যে, কেউ ওঁর জন্যে এবার কিছু যেন না করে। ওঁর জীবনে চলেছে একটা বিশেষ সমীক্ষা।”

"মানে ?"

"নিজের আত্মিক শক্তি কেমন করে অসম্ভবও সম্ভব করে তোলে, এ তারই পরীক্ষা।"

"আই সি।"

বিরাটকায় পাটনি সহসা নিশ্চল হয়ে গেলেন। বহুদূরে চলে গেল দৃষ্টি। দাঁড়িয়ে থাকলেন শীলা মূর্তির মতো।

আমি ওঁকে দেখি। তন্ময় হয়ে লক্ষ্য করি। ঐ বিরাট দেহের মানুষটির বুকের ভেতরটা যদি দেখতে পেতাম। দেখছি না, তবু বুঝতে পারছি। একটা প্রবল ঝড় বইছে ভেতরে। আলোড়ন। সিদ্ধান্ত খুঁজছেন। স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছেন না। হাতড়াচ্ছেন।

মুখখানা ফিরিয়ে বললেন : "আমি দেখছি। খুব সাবধানে লক্ষ্য রাখবেন। আবার আমি হয়তো আসবো বিকেলে।"

ত্রস্ত পায়ে চলে গেলেন। চলে গেলেন আলতো পায়ে। শব্দ যাতে না হয়।

নতুন আর একজন ডাক্তার এলেন পরদিন সকাল বেলা। ৪ঠা ডিসেম্বর। অনেকক্ষণ ধরে পরীক্ষা করলেন। আমাকে বাইরে ডেকে নিয়ে বললেন : "হি ইজ সিংকিং।"

বুকের ভেতরটা ধক করে উঠল। তবে কি সত্যিই শেষ হবার মুখে ? নিভে যাবে ? এত বড় একটা জ্যোতিষ্ক-আলো এই ভাবে যাবে নিভে ?

ডাক্তারের মুখের দিকে চাইতে পারছিলাম না। তাকিয়ে থাকলাম বাইরে। একটা দুর্বোধ্য রিক্ততা আমাকে গ্রাস করতে চাইছে। বোবা হয়ে গেছি। জিভ আড়ষ্ট।

অনুভব করলাম ডাক্তারের দুটি চক্ষু আমার মুখের ওপর ন্যস্ত। ফিরে চাইলাম। কিন্তু কথা কইতে পারলাম না। ডাক্তারই বলতে লাগলেন : "বড়ই দুর্বল। হঠাৎ কিছু না হয়। বড় সাহেব ছটফট করছেন পাগলের মতো।"

অনেক চেষ্টা করে বললাম : "মেজর পাটনিকে একবার বলুন আসতে।"

"নিশ্চয়।"

ডাক্তার চলে গেলেন।

ঘরে গিয়ে ঢুকলাম। চোখ বুজে পড়ে আছেন। শবের মতো। শুধু বুকটা ওঠা-নামা করছে। ঘুম? সংশয় জাগে মনে। কপালে হাত রাখি। চোখ মেলে চান।

বাইরে শব্দ হয়। ফিরে তাকাই। দাঁড়িয়ে আছেন পুরুষোত্তম দাশ ট্যাণ্ডন আর বিশ্বনাথ দাশ। নেতার সহকর্মী। কংগ্রেসের নামজাদা নেতা। একজন উত্তর-প্রদেশের, অন্যজন উড়িষ্যার। কলকাতা এসেছিলেন কোন কাজে। নেতার অবস্থা শুনে দেখা করতে এসেছেন।

দুজনে দুখানা চেয়ারে পাশে বসলেন। আমি ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম।

মনের সাড় কমে আসছে। শিথিল স্নায়ুর কথা বলে না। বিচার করবার ক্ষমতা নেই। একটা খাপছাড়া শূন্যতা হাঁ করে করে গিলতে চায়। সামনে দাঁড়ান মাজননী, ইলা, মেজ বৌদিদি, শরৎবাবু। আর দাঁড়ায় দেশের সহস্র নয়ন।

কী জবাব দেব? দেবার কীই-বা থাকবে? কেউ কি জবাব চাইবে? যদি চায়?

বিমূঢ় শুধু একজন কয়েদী আমি। এর বেশি একচুলও নয়। এম, এল, এ! যাত্রার সঙ! ছাইপাঁশ এলো-মেলো চিন্তা জট পাকিয়ে যায়। সবই মিথ্যে মনে হয়। সব। শুধু সত্য হয়ে সামনে দাঁড়িয়ে থাকে ঐ নিরেট ইটের পাঁচিল।

ক্ষীণ একটু কাশির শব্দ হয়। ছুটে ভেতরে যাই। হেসে বলেন : "মহাভারত পড়বে না?"

পড়তে থাকি। আসন্ন মুক্তির প্রাক্কালে পাণ্ডবেরা নদীতে স্নান করছেন।

মুক্তি পেলেন পাণ্ডবেরা।

আর সুভাষ? ওঁর মুক্তি হবে কবে? কতদূর সে দিন?

রাত্রি ঘনিয়ে আসে। আমি শিউরে উঠি। আবার সেই রাত্রি। আমি একা। কেউ নেই পাশে। একটা কথা কইবারও কেউ নেই। বোবা রাত্রি। কথা বলে না। কানেও শোনে না। স্থবিরা রাত্রি। অনেক দিনের রাত্রি। নোংরা দেহ। জরার চিহ্ন গায়ে। আশ্বাস দিতে জানে না। শুধু ভয় দেখায়।

সেপাইটিকে ডেকে আনব? বসিয়ে রাখব ওপরে? হোক-না সেপাই, তবু তো মানুষ। একজন মানুষ,—যে কোনও মানুষ আমার কাছে পরম নির্ভরতা। একজন কাউকে না পেলে আমি পাগল হয়ে যাব।

ঘণ্টায় ঘণ্টায় জল দি। গা-হাত-পা টিপে দি। হাতের আর পায়ের আঙ্গুল টেনে দি। পাউডার মাখিয়ে গা-হাত-পা ঘষে দি। কপালে দি হাত বুলিয়ে।

ওরই ফাঁকে প্রশ্ন করেন: "কিছু খেয়েছো?"

গলা আটকে যায়। তবু বলি: "হ্যাঁ।"

পূজোর প্রদীপটা ঘরে এনে রেখেছি। পলতের ক্ষীণ আলো ঘরে। স্বল্পালোকিত কক্ষ অবাস্তব বলে মনে হয়।

বাইরে কালপেঁচা ডেকে ওঠে। চমকে উঠি। দেখতে পেয়ে বলেন: "ভয় পেয়ো না। কিচ্ছু হবে না। প্রথমটায় অমন হয়।"

না, ভয় নেই। ভয় কিসের?

"'পথে পথে অপেক্ষিছে কালবৈশাখীর আশীর্বাদ,
শ্রাবণ রাত্রির বজ্রনাদ',—ভুলে গেলে?"

না ভুলিনি। ভুলব না। এই ভয়ঙ্করী রাত্রির কথা জীবনে ভুলতে পারব না।

বাইরে ডাকে উষার পাখি। পাশ ফিরে নেতা শোন। আমি সন্তর্পণে বেরিয়ে আসি।

নিচে বড় জমাদার আর কয়েকজন সেপাই। দাঁড়িয়ে আছে ওপরের দিকে চেয়ে। ওরা নম্বর খুলতে এসেছে। দাঁড়িয়েছে নেতার ঘরের মুখোমুখি। ইঙ্গিতে জানতে চায় নেতার কথা। ইশারায় জানিয়ে দি।

৫ই ডিসেম্বর। ছদিন কেটে গেল। ডাক্তার এলেন। আমাকে ডেকে নিয়ে গেলেন এক প্রান্তে। বললেন ঃ "হাসপাতালে নিয়ে যাবার হুকুম এসেছে।"

কেঁপে উঠল বুকখানা। এর পরই কি ফোর্সফিডিং? এই মানুষকে জোর করে খাওয়াবে ওরা? আমাকে ওরা নিশ্চয়ই হাসপাতালে নেবে না। যেতেও কি দেবে? এখানে রাখবেই-বা কেন? পাঠিয়ে দেবে অন্য জেলে। কে থাকবে তখন পাশে? একা। একা এই মানুষটার দেহ নিয়ে ওরা ছিনিমিনি খেলবে। তারপর খাওয়াবার নাম করে একে হত্যা করতেও কি ওদের বাধবে? হাত কাঁপবে?

বিপর্যস্ত অসহায়তা ছাড়া চারদিকে আর কিছু নেই। করবারও নেই কিছু। নেই কোন প্রতিকার। সংবিৎহারা একটা বোবা প্রাণী ছাড়া আমি আর কিছু নই।

ডাক্তার তাড়াতাড়ি কাছে এসে আমার হাত ধরে বলে উঠলেন ঃ "অতোটা ব্যাকুল হবেন না। আমরা আছি। আর আছেন বড় সাহেব। তিনি শেষ পর্যন্ত চেষ্টা করবেনই।"

ডাক্তার চলে গেলেন। নেতা ঘুমুচ্ছেন। বসে আছি দালানে। হঠাৎ কী মনে করে ঢুকলাম পূজোর ঘরে। কোণের দিকে বসে আছেন মা কালী। লকলকে জিভ। চোখ থেকে ঠিকরে পড়ছে আলো। মায়ের ছবি। ছবির মা।

সুভাষ নিত্যদিন এঁকে পূজো করতেন। এঁরই সামনে বসে

করতেন ধ্যান। আজ? ঐ সামর্থ্যহীন মুমূর্ষু পুত্রের প্রার্থনা শোনবার প্রয়োজন কি শেষ হয়ে গেল?

হঠাৎ কী যেন মনে হল? উপুড় হয়ে পড়লাম সেই ছবির সামনে। ফুল নয়, ধুপ নয়, চন্দন নয়,—শুধু চোখের জলে ডাকলাম, মা, মাগো—

অনেক দিন আগেই এ-সব ছেড়ে দিয়েছিলাম। অবলম্বনের আর কিছু নেই। 'প্রডিগ্যল সান' ফিরে এল মায়ের কোলে।

উঠে দেখি দোরের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন পাটনি। চোখে ওঁর জল।

সস্নেহে আমার কাঁধে হাত রেখে পাটনি বললেন: "ভাববেন না। হাসপাতালে ওঁকে যেতে হবে না। এখানেই থাকবেন। নাজিমুদ্দীন আর হক সাহেব এখানে নেই। আমি একটু বাদেই যাচ্ছি রাইটার্স্ বিল্ডিংএ।"

পাটনি চলে গেলেন। কৃতজ্ঞতায় বুক আকণ্ঠ ভরে উঠল। মানুষের মধ্যেও মানুষ থাকে। সহস্রর মধ্যে একজন। সেই একজন পাটনি।

ঘুম ভেঙেছে। মুখ ধোবার গরম জল চেয়ারের ওপর এগিয়ে দিই। এগিয়ে দিই ব্রাশ আর পেস্ট। মুখ ধোবার পর খাইয়ে দিই পুরো এক গেলাস জল।

ডাক্তার এলেন। দেখলেন। মুখখানা একটু প্রসন্ন ঠেকছে না? একটু যেন সজীবও? নিবিষ্ট হয়ে চেয়ে থাকি ডাক্তারের মুখের দিকে। ডাক্তার বললেন: "একটু যেন ভালো বোধ হচ্ছে।"

ক্ষীণ হাসি নেতার মুখে। বললেন: "মরা কি এতই সোজা? মরতে আসিনি শুধু শুধু। বাঁচতে হবেই।"

বাঁচতে হবেই। তাই হোক। মৃত্যুঞ্জয়ী জয়টীকা পরিয়ে দিক বিধাতা এই ব্যক্তিটির ললাটের মধ্যভাগে।

প্রসন্ন রোদে চারদিক হেসে উঠেছে। অকারণে মন হালকা

লাগছে। ফালতুকে ডেকে কড়া চা খেলাম। নিচে গিয়ে এক গোছা ফুল নিয়ে এলাম টেবলে সাজিয়ে রাখলাম। ধূপকাঠি দিলাম জ্বালিয়ে। ফালতু ফিনাইল দিয়ে ঘর মুছে দিল। কাপড়-জামা বদলে নেতা বসে থাকলেন বিছানায়।

১১টা বেজে গেল। নিজে থেকে স্নান করতে চাইলেন। গরম আর ঠাণ্ডা জল মিশিয়ে দিলাম দুটো বালতিতে। নিজের ঘরেই স্নান করলেন। একটুক্ষণ বসে থেকে শুয়ে পড়লেন।

স্নান সেরে একটু কিছু খেতে হবে। ১টা বেজে গেছে। চড়চড়ে রোদ ঠিকরে পড়ছে। ঘরে ঢুকলাম। ঢাকনি খুলে খাবারগুলো দেখছিলাম। দূরে শুনলাম, 'সরকার সেলাম'। বাইরে বেরিয়ে এলাম। দূর থেকে দেখতে পেলাম পাটনিকে। সঙ্গে ছ' সাতজন সেপাই। দুজনের হাতে একখানা স্ট্রেচার। বুকখানা ছ্যাৎ করে উঠল। তবে-যে পাটনি বললেন হাসপাতালে যেতে হবে না! ঐ তো ওরা হাসপাতালেই নিয়ে যেতে আসছে!

সহসা সমগ্র অন্তর আমার বিদ্রোহ করতে চায়। এরা শঠ, এরা মিথ্যেবাদী, এরা প্রবঞ্চক। চীৎকার করে বলতে চাইলাম যে, তোমাদের আকারই শুধু মানুষের কিন্তু ভেতরটা—

পাটনি এসে দাঁড়িয়েছেন সিঁড়ির মাথায়। হাতের মৃদু তালি দিয়ে আমাকে ডাকছেন। অপ্রসন্ন মুখে ওঁর সম্মুখে গিয়ে দাঁড়াতেই ফিসফিস করে পাটনি বললেনঃ "হি ইজ আন্‌কন্‌ডিশ্যনালি রিলিজ্‌ড্‌।"

মুক্তি। বিনাসর্তে মুক্তি। এত আনন্দ আমি রাখব কোথায়? উপচে পড়তে চাইছে। পাটনিকে বুকে জড়িয়ে ধরতে ইচ্ছে করছে।

পাটনি বলেই চলেনঃ "আমি আগেই যাবো না। আপনি যান। তৈরী করুন। হঠাৎ শকড্‌ হতে পারেন।"

অত্যন্ত সন্তর্পণে ঘরে ঢুকি। ঘুমিয়ে আছেন। চিৎ হয়ে শোওয়া। বুকের ওপর দুখানা হাত। ডান হাতে জপের মালা।

তাকিয়েই থাকি। চোখ ভরে দেখি। নিরুদ্বিগ্ন প্রসন্ন আননে একটা পরম শান্তি ও সান্ত্বনার প্রলেপ। টানা দুটি অনবদ্য চক্ষু মুদ্রিত। ওষ্ঠ ঈষদ্‌ভিন্ন। জপ করতে করতেই ঘুমিয়ে পড়েছেন।

চোখ খুলে যায়। পাশে গিয়ে বসি। কপালে রাখি হাত। মুখের ওপর ঝুঁকে বলি : "ইনটুইশ্যন যে ফলে গেল।"

"কী ?"

"পাটনি এসেছেন। মুক্তি। সর্তহীন মুক্তি।"

সহসা এক ঝলক রক্ত চোখে-মুখে ছিটকে পড়ে। চোখ দুটো ভরে ওঠে জলে। সবলে আঁকড়ে ধরেন আমার হাত। থর থর করে কাঁপছে ঠোঁট দুখানা।

প্রাণপণে নিজেকে সংবরণ করছেন। একটু স্থির হতেই বললাম : "পাটনিকে ডাকি ?"

"ডাকো।"

অন্য কোনও কথা নয়। পাটনি শুধু বলেন : "গেটে এ্যামবুলেন্স অপেক্ষা করছে।"

স্ট্রেচার এল। ওরাই শুইয়ে দিল। নেতা চললেন। আমি কী করব ? আমার সব কাজ সাঙ্গ হয়ে গেল। ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকি। ফালতুরা স্ট্রেচার নিয়ে নিচে নামছে। তাকিয়েই আছি।

পাটনি এগিয়ে এলেন। বললেন : "চলুন, গেট পর্যন্ত আপনার নেতাকে এগিয়ে দেবেন না ?"

চললাম। অবাক বিস্ময়ে এই লোকটির কথাই ভাবছিলাম। এত ভালো উনি হলেন কী করে ?

এ্যামবুলেন্স-এ শুইয়ে দেবার পর পাটনি আমাকে ডেকে নিয়ে বললেন : "আমার একটা অনুরোধ আপনার নেতাকে রাখতে হবে। এখান থেকে যাবার আগে আমি নিজের হাতে একটু গ্লুকোজ খাইয়ে দেবো।"

বললাম। একটু হেসে নেতা বললেনঃ "নিশ্চয়। ডাকো মেজর পাটনিক।"

নিজের হাতে মেজর গ্লাসে একটু একটু করে গ্লুকোজ নেতার মুখে ঢেলে দিলেন পাটনি ওঁর দুখানা হাত নিজের হাতে টেনে নিয়ে নেতা শুধু বললেনঃ "জীবনে ভুলবো না।"

গেট খুলে গেল। এ্যাবুলেন্স বেরিয়ে গেল ধীর পায়ে। জেলের ডাক্তার বসেছেন নেতার পাশেই।

* * * *

ফিরে এলাম নিজের মহলে। শূন্য মন্দির। দেবতা চলে গেছেন। নিঃসঙ্গ সীমাহীন শূন্যতা আমাকে গ্রাস করতে চায়। ডুকরে ওঠে সমগ্র সত্তা। অলক্ষ্যে গণ্ড বেয়ে জলের ধারা নেমে আসে অঝোরে।

কতক্ষণ দালানে একা বসেছিলাম, জানিনে। আলো জ্বালিনি। হঠাৎ কাছে এসে দাঁড়াল একজন এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান সারজেন্ট্। আলো জ্বেলে দিল। আমার দিকে চোখ রেখে বসে পড়ল কাছে। একেবারে গা ঘেঁষে। খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে নিজে থেকেই বলে উঠলঃ "আমি বুঝতে পারছি তোমার মনের কথা।"

অনেকক্ষণ একা একাই কথা বলল। যাবার সময় পকেট থেকে কয়েকটা সিগার বের করে টেবিলের ওপর নামিয়ে রাখল। বলে গেলঃ "ঘুম আসবে না জানি। তবু চেষ্টা করো বন্ধু। চলি।"

বিচিত্র মনের খেলা। নেতার জীবন-সংশয় অবস্থা দেখে কতই-না ব্যাকুল হয়েছিলাম। মৃত্যুর আশঙ্কায় অস্থিরও কি কম হয়েছি? সেই নেতা মুক্তি পেলেন। নিজের গৃহে গেলেন ফিরে। কিন্তু স্বস্তি এল না তো। আনন্দই-বা কোথায় রইল? নেতা মুমূর্ষ হয়েও কাছে থাকুন, তাই কি চেয়েছিলাম? না তো। তবে?

তা চাইনি। কিন্তু এও চাইনি। শুধু চেয়েছিলাম সুস্থ নেতার অফুরন্ত সাহচর্য। সেই পরম সম্পদ আমার হারিয়ে গেল। নিঃশেষ

হয়ে গেল। নিঃস্বতার অসহ্য দুঃখ তাই-না এমন প্রবল আর বৃহৎ হয়ে দেখা দিয়েছে। আরও অসহ্য বোধ হল এই কথা ভেবে যে, এই দেখাই হয়তো শেষ দেখা।

অতি অকস্মাৎ মনের ওপর ভেসে উঠল সেই অনিবার্য ভবিষ্যৎ চিত্র। নেতা চলেছেন। পাহাড় ডিঙ্গিয়ে, নদী পেরিয়ে, তুষারের স্তূপ ভেঙে নেতা চলেছেন তাঁর লক্ষ্যের পথে। অভিযানে। সাথীহীন। একা। নিঃসম্বল। অজানা পথ। ততোধিক অজানা ফলাফল। শত্রুর সজাগ চক্ষু পেছন পেছন তাড়া করে চলেছে। তবু বিরামবিহীন সেই যাত্রা। বিরতি নেই।

তৃতীয় দিনের মধ্যাহ্নে সহসা শ্রীমান কার্তিক এসে দাঁড়াল আমার সম্মুখে। খাকি হাফপ্যান্ট পরনে। গায়ে একটা সার্ট। হাত কাটা! হাতে ছোট একটা থলে। বিস্মিত-আমার সংজ্ঞা ফিরিয়ে আনল সঙ্গের সেপাই। ও-ই বলল: "মিস্ত্রী এসেছে রেডিও নিয়ে যেতে। দেখিয়ে দিন। আর বোস সাহেবের জিনিসপত্রও ঠিক করে দিন।"

বুঝলাম। কার্তিক সেজেছে রেডিও মেকানিক। কার্তিক নেতার ভাইপো। সুরেশবাবুর ছেলে। কার্তিক ঘরে ঢুকেই হাতে গুঁজে দিল ছোট্ট একটু চিরকুট। "তোমার কাজে লাগবে, এমন-সব রেখে বাকিগুলো পাঠিয়ে দিয়ো। সাবধানে থেকো। দেহের দিকে দৃষ্টি রাখতে ভুলো না। সুভাষ।"

কিছু কিছু জিনিস রেখে দিয়েছিলাম। যে কম্বলটা উনি গায়ে দিতেন, যে শতরঞ্জ পেতে মাঝে মাঝে আমরা বসতাম দালানের মেঝেতে, ওঁর মুখ মোছবার তোয়ালে, একখানা চামচে, একটা কাঁটা, একখানা ছুরি। এমনি সব। বাদ-বাকি কার্তিক নিয়ে গেল।

বুকে করে রেখেছিলাম জিনিসগুলো। মাত্র সেদিন কল্যাণীয়া শ্রীমতী অনিতার হাতে তুলে দিয়েছি। সে রেখে গেছে মিউজিয়ামে। সেখানেই আছে।

৭

এলগিন রোডের বাড়ি। বাড়িটা পড়েছিল নিঝুম হয়ে। পাংশু। বোবা। সহসা ও জেগে উঠল কলরব করে। রুদ্ধ বাতায়ন খুলে গেল। খুলে গেল রুদ্ধ কক্ষের দ্বার।

আচমকা শিহরণ। কেউ জানত না। কেউ ভাবেনি। সহসা অনেক দিনের অর্গলরুদ্ধ মন্দিরে আলো জ্বলে উঠল।

এগিয়ে এলেন মা জননী। বুকে ঝড়ের মাতামাতি। নির্বাক মুখের কোণে কল্যাণী হাসি। তাঁর সুভাষ ফিরে এসেছেন। তাঁর দুঃখরাতের রাজা সুভাষ।

বার্তা রটে যেতে সময় লাগল না। দলে দলে আসতে লাগল আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব। কিন্তু এত লোকের সঙ্গে দেখা করবেন কেমন করে? আর এই দেহ নিয়ে?

কেউ দেখল চোখের দেখা। কেউ জানাল নীরব প্রণাম। আসা কেউ রোধ করল না। আসা আর যাওয়া চলতে থাকল অবিরাম।

সাবধানী সতর্ক ডাক্তার এবং দাদা হুলিয়া জারি করলেন। কেউ যেন কথা না বলায়। সবাই আসুক, অনেকে আসুক, ক্ষতি নেই। কিন্তু কথা বলা চলবে না। নিয়মিত খাওয়াবার ব্যবস্থা হল। আর লোকের দেখা করবার সময় হল নিয়ন্ত্রিত।

এলেন মাতা বাসন্তী দেবী। এল কর্পোরেশনের কাউন্সিলার, এ্যাসেমব্লীর মেম্বর, এল গোষ্ঠীর লোকেরা। এলেন মুখ্যমন্ত্রী ফজলুল হক, এলেন মেয়র সিদ্দিকি।

আর এল প্রথম থেকেই এক ঝাঁক পুলিশ। থাকল তারা গেটের পাশে, থাকল রাস্তার ওপারে, আরও দূরে। এরা থাকল উর্দি পরে। সাদা কাপড়ে থাকল আরও বেশি। তারা থাকল আত্মীয়, বন্ধু আর ভক্তের সঙ্গে মিশে। তাদের দলে ভিড়ে।

জানালায় পড়ল মোটা পর্দা। কক্ষের দ্বারে ঝুলিয়ে দেয়া হল আরও মোটা পর্দা। নেতা বেশি সময় কাটান একা। অনর্গল লিখে যান চিঠি। লেখেন বান্ধবদের। আর লেখেন দু-একখানা সরকারী হোমরা-চোমরাদের কাছে।

ওরা মুক্তি দিয়েছে। মুক্তি আর বন্ধনের মধ্যে ফাঁক কতটুকু? লহমা মাত্র। মুক্তি দিতে ওদের বাধল না। আবার বাঁধতেও আটকাবে না। তিনটে মামলা দায়ের করাই আছে। একটা-না-একটাতে ফাঁসাবেই। মাঝ থেকে অনর্থক ঝক্কি পোয়ানো কেন?

কংগ্রেসের ব্যক্তি-সত্যাগ্রহের কল্যাণে অনেকে ঢুকছে জেলখানায়। জেলের অন্দরমহল বিলক্ষণ তপ্ত। তার মধ্যে সুভাষ বোসের যদি কিছু হয়, সামলানো দায় হয়ে উঠবে না? ইংরেজ বিশেষ করে এই সময়ে এত বড় ঝুঁকি নিতে নারাজ।

বন্ধুদের কাছে লিখছেন যে, দেহ এখনও অপটু। সুস্থ হলে আবার তো জেলে যেতেই হবে। ফলাফল জেনেও মহাত্মাজির কাছে বন্ধু মারফত অনুরোধ জানিয়েছেন যে, ব্যক্তি-সত্যাগ্রহে তাঁকে অনুমতি দেয়া হোক। মহাত্মাজি রাজী হননি।

কারাগারে থাকতেই জনৈক বন্ধু মহাত্মাজিকে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানিয়েছিলেন যে, সেই সত্যাগ্রহ যখন শুরু করাই হল, গান্ধী-সুভাষের মতপার্থক্যও তো বেশিটারই মীমাংসা হয়ে গেল। এ-অবস্থায় বোস-ব্রাদার্সের ওপর থেকে কংগ্রেসের শাস্তিমূলক দণ্ডাদেশ প্রত্যাহার করাই কি শোভন আর সঙ্গত হবে না? এ-কথাও বলা হয়েছিল যে, বাংলা-কংগ্রেসের শক্তি বহুলাংশে খর্ব হয়েছে এই অন্তর্দ্বন্দ্বে। দণ্ডাদেশ প্রত্যাহৃত হলে বাংলার শক্তি হবে অপ্রতিরোধ্য।

মহাত্মাজি সে-অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করেছেন। ওয়ার্ধা থেকে ২৮শে নবেম্বর (১৯৪০) উক্ত বন্ধুকে জানিয়েছেন: "বসু-ভ্রাতৃদ্বয়ের ওপর আমার যথেষ্ট অনুরাগ ও বান্ধবতা থাকা সত্ত্বেও এ-বিষয়ে কিছু করতে আমি অপরাগ ও অনিচ্ছুক। যতদিন তাঁরা তাঁদের অবাধ্যতার

জন্য ক্ষমাপ্রার্থী না হবেন, দণ্ডাদেশ প্রত্যাহার করা যেতে পারে না বলে আমি মনে করি।" (Regret inability even unwillingness to interfere notwithstanding my regard and friendship for the brothers. Feel bans cannot be lifted without their apologising for indiscipline.)

মুক্তি পাবার পর টেলিগ্রামখানা হাতে করে এসেছিলেন বন্ধুবর। তারিখটা ছিল ৯ই ডিসেম্বর, ১৯৪০। উত্তরে নেতা বলেছিলেন ঃ "রাজনৈতিক মতদ্বৈধ যতই কেন না থাক, তা থেকে ব্যক্তি-সম্পর্ক রাখতে হবে যতটা সম্ভব উর্ধ্বে—এই শিক্ষাই আমি পেয়েছিলাম আমার রাজনীতিক্ষেত্রের গুরু স্বর্গত দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের কাছ থেকে। গান্ধী-গোষ্ঠীর কাছ থেকে আমি কম আঘাত পাইনি,—আর আজো পেয়েই চলেছি ; তবু মহাত্মা গান্ধীর প্রতি রয়েছে আমার গভীর শ্রদ্ধা আর ভালোবাসা।

"ছেলেবেলায় স্কুলে পড়েছিলাম সুইজারল্যাণ্ডের সর্বশ্রেষ্ঠ বীর উইলিয়ম টেল সম্পর্কে একটি কবিতা। কবিতাটিতে ছিলো ঃ

শান্ত কণ্ঠে বলিলেন তিনি, উন্নত মম শীর
শুধু নত হবে, শুধু তাঁর পায়ে, বিধাতা ধরিত্রীর,
অষ্ট্রীয়-অরি-প্রসারিত-করে পরাণ থাকিতে পারে,
বিবেক আমার শুধু-যে আমারি, কারো নাহি ধার ধারে।
(My knee shall bend, he calmly said,
To God and God alone,
My life is in the Austrian's hands,
My conscience is my own.)

"আমার রাজনৈতিক জীবনে কোনো দুর্নীতির আশ্রয় নিয়েছি, এ কথা আমার জানা নেই। সামান্য রদ-বদল করলেই মহাত্মাজির কথার প্রত্যুত্তর হবে ঐ কবিতাটি।" (ক্রশ রোড, ৩৪৬ পৃ.)

পত্র, পত্রিকা ও লোকের মুখে মুখে গান্ধীর যে অলৌকিক ঔদার্য আর অগাধ প্রেমের কাহিনী প্রচারিত হয়েছিল দীর্ঘদিন ধরে, হয়তো বন্ধুটি তারই ওপর নির্ভর করে অনুরোধটি জানিয়ে থাকবেন। কিন্তু বন্ধুবরের এই কথাটি জানতে বাকি ছিল যে, গান্ধী শুধু মহাত্মাই নন, গান্ধী একটি দলবিশেষের দলপতিও। মহাত্মা গান্ধী জহরলালের অবাধ্যতা ক্ষমা করতে পারেন অনায়াসে, রাজাজি ও প্যাটেলকে হয়তো উপেক্ষাভরে পাশও কাটিয়ে যেতে পারেন, কিন্তু দলপতি গান্ধী তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী নেতা সুভাষচন্দ্রকে তাই বলে আর একবার কংগ্রেসে ডেকে এনে তাঁর সিংহাসন হারাবার ঝুঁকি নিতে পারেন না। গান্ধী কথায় কথায় নিজের পরিচয় দেন বেনে বলে। বেনের এ-ব্যবসায়-বুদ্ধি সহজাত।

ভারতের মাটি থেকে ইংরেজ-রাজ-প্রতিনিধির কাছে নেতার শেষ চিঠি গেল ২৯শে ডিসেম্বর, ১৯৪০। বড়লাট লিন্‌লিথ্‌গো তখন বাংলায় ছিলেন। এর পূর্বে তিনি একবার নেতার সঙ্গে দেশের পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনাও করেছিলেন। নেতা লিখলেন ঃ

"মাননীয় মহোদয়,

অনেক দ্বিধার পর আমি স্থির করলাম যে, বাংলার বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে আপনার কাছে একখানা চিঠি লিখবো। আমি আজো শয্যাশায়ী, কিন্তু বিষয়টি এতোই গুরুতর যে, আমার আর দেরি করবার উপায় নেই। তাছাড়া, ঠিক এই সময়ে আপনি বাংলায় রয়েছেন। আমি যে-কথা আপনাকে জানাবো, তার যথার্থ্য যাচাই করবার এবং সমস্ত বিষয়টি সরজমিনে তদন্ত করবার আপনার সুযোগও ঘটবে। এমন যোগাযোগ কদাচিৎই দেখতে পাওয়া যায়। দেশের স্বার্থের খাতিরে, তাই, এই অবস্থার সুযোগ নেবার জন্যে আমি ব্যগ্র হয়ে উঠেছি। আপনার সময়ের মূল্য-যে অনেক, তা আমার অজানা নয়, কিন্তু বিষয়টির গুরুত্ব এবং জনসাধারণের মঙ্গল কামনা সেই সময়ের একটু অংশ নেবার জন্যে আমাকে প্ররোচিত করেছে।

"(১) ১৯৩৫-এর ভারত-শাসন আইনের ফলে যদিও প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন স্বীকৃতি লাভ করেছে, তবু প্রাদেশিক কতকগুলি ব্যাপারে বড়লাটেরও খানিকটা দায়িত্ব আছে। কিন্তু শাসনতান্ত্রিক এই অধিকার থাকলেও একটা কথা আশা করা নিশ্চয়ই সঙ্গত হবে না যে, প্রাদেশিক শাসন-কার্যের প্রতিক্ষেত্রে হামেশাই আপনি এসে কর্তৃত্ব করবেন। কিন্তু সাম্প্রতিক মহাসমর খানিকটা পরিবর্তন এনেছে। ভারত-শাসনের অনেক কাজই আজ কেন্দ্রানুগ এবং ভারত শাসনের সামগ্রিক দায়িত্বও আজ কেন্দ্রীয়-সরকারকেই গ্রহণ করতে হয়েছে।

"(৩) যে-বিষয়টির দিকে আমি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই, এইবার সোজাসুজি আমি সেই কথাটি বলবো। ১৯৩৭ থেকে যে-মন্ত্রিসভা বাংলাদেশের শাসন-ব্যবস্থা পরিচালনা করছেন, তার প্রায় পুরোটাই আকারে ও লক্ষ্যে সাম্প্রদায়িক। এ ছাড়া, মনে হয়, কোন কোন মুসলমান এম, এল, এ, বৃটিশ সরকার এবং ইংরেজ বণিকদের মধ্যে একটা চুক্তিও হয়েছে ; যদিও লিখিত-পড়িত কোন প্রমাণ মেলা শক্ত। এর ফলে, সাম্প্রদায়িক ব্যাপারে মুসলিম সম্প্রদায়কে দেয়া হয়েছে নিরঙ্কুশ ক্ষমতা, অন্যদিকে রাজনীতিক্ষেত্রে মেনে নেয়া হয়েছে গভর্ণর ও ইংরেজ বণিকদের স্বেচ্ছাচার। এই দুই দলের বাইরে যাঁরা রয়েছেন, ১৯৩৭ থেকে বাংলার প্রশাসনিক ক্ষেত্রে তাঁদের কোনো স্থান নেই। অবিশ্যি শাসন-কার্য যদি তৎপরতা, শুচিতা এবং অপক্ষপাতিত্বের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকতো, এঁদের এই অসহায় অবস্থা সহ্য করা হয়তো কঠিন হলেও অসম্ভব হতো না। আমাকে একান্ত দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে যে, বাংলার অবস্থা আদৌ সে-প্রকার নয়। বাংলার প্রশাসনিক ক্ষেত্র আজ নগ্ন সাম্প্রদায়িকতার মূঢ় লক্ষ্যে অনুপ্রাণিত। তাকে পরিপুষ্ট করেছে অযোগ্যতা আর দুর্নীতি।

"(৪) একথা বলবার সঙ্গে সঙ্গে আমি স্পষ্ট করেই বলতে চাই যে, যখন আমি বর্তমান মন্ত্রিসভাকে সমালোচনা করি, আমার

দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে হিন্দুসভার দৃষ্টিভঙ্গীর বিন্দুমাত্রও মিল নেই। মুসলমান-সম্প্রদায়ের প্রাপ্য অধিকার স্বেচ্ছায় ও সানন্দে অঙ্গীকার করে নিতে আমি ও আমরা সব সময় প্রস্তুত। আমাদের অতীতের কাজ আমাদের একথার সত্যতা প্রমাণিত করবে এবং আরও প্রমাণ করবে যে, আমাদের অতীতের অনুসৃত কর্মপদ্ধতি সাম্প্রদায়িক হিন্দুদেরও আমাদের প্রতি বিরূপ করে তুলেছিলো। বর্তমান ভারতবর্ষের রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে আমরা সেই দলের প্রতিনিধি বলে নিজেদের মনে করি, একমাত্র যে-দল আজও হিন্দু এবং মুসলমানের ঐক্যে বিশ্বাসী এবং এ-কথাও একান্ত সত্য যে, একমাত্র সেই দলই ভারতবর্ষের মুসলমান-সম্প্রদায়ের এক বৃহৎ অংশের বিশ্বাস ও সদিচ্ছাভাজন।

"(৫) ইংরেজ-প্রভুত্বের সূচনা থেকে বাংলাদেশকেই দেখা গেছে জাতীয়তার সূতিকাগার রূপে। বিশেষ করে হিন্দু-অধ্যুষিত বাংলা-অঞ্চল বিগত শতাব্দী ধরে একমাত্র জাতীয়তার ভিত্তির ওপরেই গড়ে তুলেছে তার চিন্তার ধারা এবং এরই পরিণামে কোনদিনই বাংলাদেশে হিন্দুসভা শেকড় দাবাতে পারেনি। কিন্তু মুসলিম-সাম্প্রদায়িকতার ঘূর্ণাবর্তে জাতীয়তা আজ দিশেহারা। বিপন্নতার মধ্যে তার দিন কাটছে।

"(৬) অবশ্য এ-কথা হয়তো কেউ কেউ বলতে চাইবে যে, এতে বৃটিশ সরকার বা ইংরেজ বনিকের কীই-বা এসে গেলো? ১৯৩৭ থেকে হিন্দুরা দুর্গতি ভোগ করছে বা সাম্প্রদায়িকতার বিষ তাদের সমস্ত অন্তর নীল করে যদি দিয়েই থাকে, তার জন্যে মুসলমানেরাই বা উদগ্রীব হয়ে উঠবে কেন? দেশ্ নয়, সম্প্রদায় আজ প্রশাসনের মানদণ্ড, অসাধুতা আর অযোগ্যতা তার নিয়ামক,—একথাই-বা কে ভাবতে বসেছে? কথাটার সবটাই হয়তো উড়িয়ে দেয়া যায় না। কিন্তু তবু বলবো, সবটাই এর সত্যও নয়। বাংলার হিন্দুরা আজ দুর্গতি আর সঙ্কটের বুকের ওপর দাঁড়িয়ে আছে, এ-কথা

খুবই সত্য কিন্তু আমি মনে করি যে, সেদিনের খুব বেশি দেরি নেই, যেদিন বাংলার অন্যান্য সম্প্রদায়ও এই সর্বনাশা ঘটনাচক্রে জড়িয়ে পড়তে বাধ্য হবে। আরো বিশদ করে বলতে হলে বলবো যে, বাংলার মুসলিম-মন্ত্রিসভা এমন এক বুমেরং নিয়ে খেলতে নেমেছে, যা হয়তো আজ শুধু হিন্দুর গলায়ই ফাঁস হয়ে দাঁড়িয়েছে, কিন্তু সেদিন আমি চোখের সম্মুখে দেখছি, যেদিন অন্য অনেককেও এই বুমেরং জড়াতে চাইবে। এবং যেদিন সিন্ধুর সঙ্কট বাংলাদেশেও দেখা দেবে, তখন প্রতিকারের আরকোনো পথই খোলাথাকবে না।

"(৭) বাংলা দেশে হিন্দুরা একটা বিপর্যয়ের মুখে পড়েছে, এই জন্যেই বাংলার এই সঙ্কট-সম্ভাবনাময় পরিস্থিতির প্রতি আপনার দৃষ্টি আমি আকর্ষণ করতে চাইছি, একথা মনে করা মোটেই সমীচীন হবে না। সমগ্র প্রদেশের শান্তি যাতে বিঘ্নিত ও উৎসাদিত না হয়, অনতিবিলম্বে তার কোন ব্যবস্থা হওয়া আশু প্রয়োজন, এই কথাটিই আপনাকে আমি জানাতে চাই।

"(৮) এই অবস্থার প্রতিকার করতে হলে সর্বাগ্রে এমন একটি গভর্ণমেণ্ট গঠন করতে হবে, যার ওপর থাকবে সমগ্র প্রদেশের ছুটি প্রধান সম্প্রদায়েয় বিশ্বাস ; আর এক মাত্র এই প্রকার সরকারই বাংলা দেশের প্রকৃত উন্নতি করতে পারবে। সুবিচার, সততা এবং কার্যকারিতার ওপর প্রতিষ্ঠিত প্রশাসন-ব্যবস্থাই বর্তমান দুর্দশার হাত থেকে বাংলাকে রক্ষা করবে। বর্তমান মন্ত্রিসভার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট দু-একজন মন্ত্রী আছেন, যাঁরা নিজেদের হিন্দু বলেই পরিচয় দিয়ে থাকেন, কিন্তু উল্লেখ করবার মতো এঁদের কোন প্রভাব নেই। এর ফলে সমগ্র হিন্দু-সম্প্রদায়ের আস্থা থেকে বর্তমান সরকার বঞ্চিত হয়েছেন। তপশীলভুক্ত শ্রেণীর হিন্দুদের অধিকাংশই বিরোধী পক্ষীয়। এই শ্রেণী থেকে দুজনকে মন্ত্রী করে নেয়া হয়েছে। অকৃপণ হয়ে তাঁরা যথেষ্ট অনুগ্রহ বিতরণ করেও তপশীলীদের বিরোধী মনোভাব অনুকূলে আনতে পারেননি। মুসলমান সম্প্রদায় হিসেবে

এই কথা বলাই সঙ্গত হবে যে, এ সম্প্রদায়ের সবাই বর্তমান সরকারকে সমর্থন করেন না। এবং এঁদের একটা মোটা অংশ বর্তমান সরকারের বিরোধী। উদাহরণ স্বরূপ আমি কৃষক-প্রজা-দলের নাম উল্লেখ করবো। এদের প্রভাব মোটেই উপেক্ষণীয় নয়। বরাবরই এরা বিরোধী দলভুক্ত।

"(৯) প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে বাংলার সমস্যা সম্বন্ধে আপনার বিশেষ দায়িত্ব আপনি অস্বীকার করতে পারেন না। শাসনতান্ত্রিক কাঠামোতেই রয়েছে (বড়লাটের) প্রত্যক্ষ দায়িত্বের অঙ্গীকার। বর্তমান মন্ত্রিসভা সম্পূর্ণ ভাবে গভর্ণর এবং ইংরেজ বণিকদের ওপর নির্ভরশীল, এই ক্ষেত্রেই আসে অপ্রত্যক্ষ দায়িত্বের প্রশ্ন।

"(১০) যদি বাংলার বর্তমান অবস্থা দেখে আপনি,—যে-কোন কারণেই হোক,—খুশি থেকেই থাকেন, আমার কিছু বলবার নেই। এবং আপনাকে আমার এই চিঠির কথা বেমালুম ভুলে যেতেই বলবো। কিন্তু প্রকৃত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আমি এই কথাই বলবো যে, বর্তমান পরিস্থিতির একটা বিপুল সম্ভাবনা আছে। এবং বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট এবং ইংরেজ বনিকসম্প্রদায়ের নিজেদের স্বার্থের খাতিরে সজাগ হবার প্রয়োজনীয়তাও রয়েছে যথেষ্ট। হলোওয়েল মনুমেণ্ট-সত্যাগ্রহ-আন্দোলন সম্পর্কে বেসরকারী শ্বেতাঙ্গ সম্প্রদায় দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়েছিলেন। এবং এই কারণে তাঁরা প্রশংসাও পেয়েছেন। বর্তমানেও তাঁদের রাজনৈতিক দূরদর্শিতার অভাব হয়তো নাও দেখা যেতে পারে।

"(১১) আর একটা পথও আছে। যুদ্ধের অন্তর্বর্তীকালে সমগ্র শাসনতন্ত্র স্থগিত রাখা। কিন্তু সমাধানের আর একটি সম্ভাবনা যখন রয়েইছে, তখন এ-সম্পর্কে বেশি কিছু আমি বলতে চাইনে।

"(১২) ১৯৩৭ থেকে বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট এবং ইংরেজ বণিকরা বাংলার গণ-জীবন-ক্ষেত্রে যে-খেলা দেখিয়ে আসছেন, তাই যদি

চলতে থাকে, অবস্থার দ্রুত এবং ক্রমিক অবনতিই দেখা যাবে এবং এমন একটা অবস্থার সৃষ্টি করবে, যার কোন প্রতিকার আর সম্ভবপর হবে না। যদি দুর্ভাগ্যক্রমে তাই হয় বংলার বিধিলিপি, আমাদের এই শেষ সান্ত্বনা থাকবে যে, সময় থাকতে আমরা অন্তত প্রশাসন-ক্ষেত্রের সর্বপ্রধান ব্যক্তির দৃষ্টি আকর্ষণ করবার চেষ্টা করেছিলাম।

৩৮।২ এলগিন রোড,
কলিকাতা,
২৯শে ডিসেম্বর, ১৯৪০।

ভবদীয়
শ্রীসুভাষচন্দ্র বসু"

চিঠিখানা পড়ে হয়তো লিন্‌লিথগো বার বার চক্ষু মার্জনা করেছিলেন। চিঠির মধ্যে প্রত্যক্ষ সংগ্রামের একটা কথাও নেই, নেই ভারত ছাড়বার আল্‌টিমেটাম। ইংরেজের পরাজয়ে কোন উল্লাসও প্রকাশ পায়নি। নিছক নিয়মতান্ত্রিক কথা। অত্যন্ত নিরামিষ আর নরম সুর। হয়তো তাঁর মনে সংশয় জেগে থাকবে। সুভাষ বোস কি পালটে গেলেন? শ্বেতাঙ্গ সম্প্রদায় আর বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের প্রতি একটা প্রচ্ছন্ন আমন্ত্রণও রয়েছে যেন! সুভাষ বোসের একটা নতুন রূপ ফুটে উঠতে চায়। এত কালের সুভাষ বোস অপেক্ষা এ-সুভাষ বোস অস্পষ্ট।

দেশে অজস্র চেয়ার বিলাসী পলিটিশিয়ান আছে, তারা অহরহ এই শ্রেণীর কথা বলে আসছে চিরকাল। কিন্তু সুভাষ বোসও ঐ একই সুরে কথা বলবেন?

অন্যদিকে, গান্ধীর সত্যাগ্রহে যোগ দিতে সুভাষ বোস সহসা এমন উৎসাহী হয়ে উঠলেন কেন? অনুমতি চেয়েছেন গান্ধীর। ব্যক্তি-সত্যাগ্রহে অনুমতির প্রয়োজনীয়তা কোথায়? চিরদিন ব্যক্তিগত কারণে আর অকারণেও কত মানুষ আইন ভেঙেছে, সাজাও পেয়েছে। এর জন্য কেউ কারও অনুমতি তো নেয়নি। ইচ্ছা করলেই সরকারী যে-কোন আইন ভেঙে সোজা আবার তিনি কারাগারে ঢুকতে

পারতেন। তা না করে, বেশ খানিকটা ঘটা করেই গান্ধীজির অনুমতি চেয়েছেন।

প্রতিদিন চিঠি লিখছেন নানাজনকে, নানা বিষয়ে। প্রায় প্রতি চিঠিতে বলে চলেছেন যে, আবার তাঁর জেলে যাবার দিন ঘনিয়ে আসছে; অসুস্থ দেহ, দুর্বল দেহ: ঐটে সুস্থ আর একটু সবল হবার অপেক্ষা মাত্র।

এ-সবই কি অনশনক্লিষ্ট মস্তিষ্কের অসার কল্পনা? দুর্বল মনের সময় কাটাবার ছুতো? অথবা সত্যিই কি শেষকালে ওঁরও মনের কোণে দুর্বলতা আর নতুন-কোন-ঝক্কি না-নেবার-গোপন-লালসা দেখা দিল?

কিন্তু উনি না-হয় ঝুঁকি পরিহারই করলেন, তিনটে মোকদ্দমার একটাও কি ওঁকে কারাগারে ঢুকিয়ে দিতে পারবে না? একবার ঢুকতে পারলে যুদ্ধ চলা-কালীন কয়েকটা বছর একেবারে নিশ্চিন্ত। নিরুদ্বিগ্ন বিশ্রাম। তারপর বীরবেশে বেরিয়ে এসে সম্বর্ধনা-সভায় হাজির হলেই তো ল্যাঠা চুকে গেল।

অথবা সত্যি সত্যিই কি শ্রান্তি দেখা দিল জীবনে? সত্যিই কি সুভাষ বোস চান ইংরেজের সঙ্গে একটা রফা করে অবশিষ্ট জীবন তারই আওতায় আরামে আর আয়াসে কাটিয়ে দিতে? হয়তো আই, সি, এস-এর ছোট চাকুরী এই কারণেই সেদিন ওঁর তুচ্ছ মনে হয়েছিল। ভবিষ্যতের, আজকের, এই বৃহৎ প্রাপ্তির পরিকল্পনা কি সেইদিনই করা ছিল? ইংরেজের পৃষ্ঠপোষকতায় একবার গদি দখল করতে পারলে, প্রথম জীবনের চাকুরী-না-নেবার যাবতীয় লোক-সানও কি পুষিয়ে যাবে না? অনেকের কি যায়নি?

কিন্তু এই যদি অন্তরের গোপন অভিপ্রায় ছিল, অমন জাঁক করে মরবার জন্য মরিয়া হয়ে উঠলেন কেন? অনশন করবারই-বা কী প্রয়োজন ছিল? সামান্যতম ইঙ্গিত অভীষ্ট সাধন করতে হুমড়ি খেয়ে পড়ত না?

তবে কি এর সবটাই অন্য কোন গভীর পরিকল্পনার পটভূমি?

বস্তুত ইংরেজের সজাগ সহস্র চক্ষুকে ধোঁকা দেবার জন্য নিপুণ অভিনেতার মতো সুভাষ সেদিন যে-সব উপায় ও অভিসন্ধি অবলম্বন করেছিলেন, তার সত্যই তুলনা নেই। এর পূর্বেও এ-দেশ থেকে আরও কয়েকজন সন্ত্রাশবাদী আত্মগোপন করে বিদেশে পাড়ি জমিয়েছিলেন, কিন্তু তাঁদের কেউই সুভাষচন্দ্রের মতো সর্বজন-পরিচিত জননায়ক ছিলেন না। তাঁদের পরিচিতি ছিল সীমাবদ্ধ। কিন্তু বিস্তীর্ণ ও ব্যাপক জন-পরিচিতি সত্ত্বেও সুভাষচন্দ্র যে-ভাবে সেদিন আত্মগোপন করে স্বদেশ ত্যাগ করেছিলেন, ইতিহাসে তার নজির দুর্লভ না হলেও স্বল্পতম।

বড়লাটের নিকট চিঠি লিখে পূর্বাহ্ণেই নেতা ইংরেজ ও পুলিশকে বিভ্রান্ত করবার চেষ্টা করেছেন। সত্যাগ্রহের নাম করে বোঝাতে চেয়েছেন যে, সুভাষ বোস কতখানি কংগ্রেসভক্ত এবং গান্ধীর প্রতি এবং গান্ধীপ্রবর্তিত কংগ্রেসী আন্দোলন বা ঐ প্রকার অবৈপ্লবিক কর্মপন্থায় কতখানি বিশ্বাসী। নানা চিঠিপত্রের মাধ্যমে প্রচার করতে চেয়েছেন যে, অন্তত যুদ্ধকাল পর্যন্ত নির্বিবাদে এবং অত্যন্ত নিরাপত্তার ভেতর জেলে কাল কাটাবার জন্য তিনি শুধু ইচ্ছুক নন, রীতিমত উদ্‌গ্রীব। এই সময়ের লেখা তাঁর পত্রাবলি-যে যথাসময়ে এবং যথারীতি পুলিশের গোচরে যাবেই, এ-আশ্বাস ও বিশ্বাস নেতার মনে ছিল বিলক্ষণ এবং এর ফলে পুলিশ ও গুপ্তচর বিভাগ তাঁকে ভুলে না গেলেও তাদের দৃষ্টি-যে প্রখরতায় অপেক্ষাকৃত নিস্তেজ হয়ে উঠবে, এতেও নেতার কোন সংশয় ছিল না।

সহসা নেতার থাকবার ঘরের দোর বন্ধ হয়ে গেল। যারা আসতে চায়, আসুক। বরং বেশি করে আসুক। ঘন ঘন আসুক। কিন্তু দেখা কেউ পাবে না। দেহ অত্যন্ত অসুস্থ। দেখা করা চিকিৎসককের নিষেধ।

একটু বেশি রাত করে আসেন মেজদাদা শরৎচন্দ্র। মাঝে মাঝে

মেজবউদিদি। আসেন মোটরে করে। মোটর দাঁড়ায় গাড়িবারান্দা ঘেঁষে। আবার বেরিয়েও যায় অকস্মাৎ। আসে আত্মীয়, স্বজন, বন্ধুরা।

বাইরের লোক বাইরে বসে। ওঁর দেহের কথা জিজ্ঞেস করে। উদ্বিগ্নমুখে ফিরে যায়। আত্মীয়েরা ভেতরে যান। মা-জননীর ঘরে। দু-একজন ছাড়া বাড়ির লোকও ওঁর ঘরে ঢুকতে পায় না। নিষেধ।

বাইরের সেপাই আর শান্ত্রীরা প্রথম প্রথম খুব কড়া নজরই রাখত। কিন্তু অহরহ লোকের এই ভিড়, ইচ্ছা থাকলেই কি সব সময় নজর রাখা যায়? ওদেরও শৈথিল্য দেখা দেয়। তাছাড়া, যাঁর কাছে অনবরত আসছেন মুখ্যমন্ত্রী, মেয়র, জাঁদরেল জাঁদরেল সাহেব-সুবো,—ঝকঝকে মোটর গাড়ি, ব্যয়বহুল সাজ-পোশাক-পরা নানা ধরনের মানুষ, তাদের বেশিই তো অচেনা আর অজানা। মানুষটাও তো শয্যাশায়ী। অসুস্থ। নজর রেখে লাভই বা হবে কী আর কতটুকুই বা?

ঘরের এক পাশে পাতা হয় একখানা বাঘের চামড়া। সামনে গীতা, চণ্ডী আর জপের মালা। ধুনুচিতে পোড়ে সুগন্ধ ধূপ। গন্ধে চারদিক ভুরভুর করে ওঠে। নেতা একমনে জপ করেন, করেন ধ্যান। বাড়ির মধ্যে কানাঘুষোর অন্ত নেই। আবার কি এই মানুষের মনে জাগল কৈশোরের সেই বিবাগী নেশা?

কয়েকদিন এমনি কাটে। সহসা জারি হয় নতুন বিধান। ওঁর ঘরে মা-জননী ছাড়া কেউ ঢুকবে না। অন্তত না ডাকলে তো নয়ই। খাবার দেবে ঠাকুর বাইরে, পর্দার তলায়, ঘরের একেবারে দোর-গোড়ায়। ভেতর থেকে টেনে নেবার সময় দেখা যাবে না। ভুক্তাবশিষ্ট সেই স্থানেই থাকবে। ভৃত্য নিয়ে যাবে সরিয়ে।

ক্রমেই রহস্য চাপ বেঁধে ওঠে। গৃহের পরিজনদের তো কথাই নেই; নিকট-আত্মীয়রাও থৈ পায় না। কিন্তু এই চিরখেয়ালী আর অদ্ভুত লোকটি তো কারোই অচেনা আর অজানা নন। খেয়ালের

তো অন্ত নেই। অমন ঝকঝকে চাঁদের মত মুখ, যে-মুখের তুলনা মেলা ভার, দাড়ি আর গোঁফের জঙ্গলে সেই মুখ ঢেকে গেছে। ভাগ্যি মাথার চুল নেই, নইলে জটও হয়তে দেখা দিত।'

বাইরের এই ঠাট বজায় রেখেও ভেতরে ভেতরে আর এক সুভাষ তৈরি করে চলেছেন নিজেকে যে অভিনব রূপে, লোকচক্ষুর অন্তরালে আর সংগোপনে যে-সুভাষ গড়ে তুলছেন নিজেকে ইস্পাতের চাইতেও শাণিত করে, সে-রূপ সেদিন কারও চোখেই ধরা পড়েনি। মা-জননী পরবর্তীকালে কথায় কথায় একদিন বলেছিলেন যে, কারাগার থেকে ফেরবার পর আগেকার সুভাষকে আর তিনি খুঁজে পাননি। সুভাষ চিরদিনই স্বল্পবাক ও গম্ভীর কিন্তু তার ভেতর থেকেও তিনি মাঝে মাঝে তাঁর 'সুবি'কে দেখতে পেতেন। কিন্তু এ-সুভাষ স্বতন্ত্র।

সত্যিই স্বতন্ত্র। অভিনব। রূপান্তরিত। সংসারে তিনি কোন দিনই ছিলেন না কিন্তু সংসার ছিল। সমাজ ও সামাজিকতার বোধ ছিল, কিন্তু আসক্তি ছিল না। আত্মীয়তার শুধু স্বীকৃতিই ছিল কিন্তু কোন ক্ষেত্রেই ছিল না বন্ধন।

এ-সুভাষ সর্বমুক্ত। নাঙ্গা। দুর্বার।

অহরহ কানে বাজে গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের আশীর্বাণী:

গণি গণি দিনখন
চঞ্চল করি মন
বোলো না, যাই কি নাহি যাইরে।
সংশয় পারাবার
অন্তরে হবে পার,
উদ্‌বেগে তাকায়ো না বাইরে।

১ জেলে থাকতেই নেতা ও আমি উভয়েই দাড়ি-গোঁফ রাখতে শুরু করেছিলাম। গৃহে পৌছে দাড়ি কামিয়ে ফেলেছিলেন। কয়েকদিন বাদেই আবার দাড়ি রাখতে শুরু করেন।

না, আর বাইরে নয়। অন্তরের অন্তস্থলে দেশমাতার শুচি-শুভ্র শ্রীমূর্তি ফুটে উঠেছে দশদিক আলো করে। এই আশ্চর্য আবির্ভাবকে মনে-প্রাণে স্বীকার করে নিতে তাঁর বাধল না। আটকাল না কোথাও। স্বদেশের এই প্রত্যক্ষ, সুগোচর আর অপরূপ মূর্তরূপ এই মুক্তিকাম সাধককে এমনি সুনিবিড় আকর্ষণে আহ্বান জানিয়েছিল, যা উপেক্ষা করবার শক্তি তাঁর ছিল না। উপেক্ষা করবার কামনাও কোনদিন তাঁর মনে জাগেনি।

মুহূর্তের উত্তেজনা নয়, হটকারী উচ্ছ্বাসের উন্মাদনা নয়, ক্ষণিক লাভালাভের মোহও নয়,—একটা নিশ্চিত, একান্ত, বিশ্রব্ধ সঙ্কল্প, যা লালন করেছেন সংগোপনে দীর্ঘকাল ধরে,—তাঁকে এই দুর্জয় ও ভয়ঙ্কর পথে যেতে প্রেরণা যুগিয়েছে।

মনস্তাত্ত্বিক এবং কার্যকরী প্রতি পদক্ষেপের সর্বদিকে ছিল তাঁর তীক্ষ্ণ ও অভ্রান্ত লক্ষ্য। ইংরেজের চাতুর্যকে তিনি ছোট করে দেখেননি। নিজের শক্তির ওপর অটুট বিশ্বাস ছিল নিশ্চয়ই, কিন্তু সে-বিশ্বাসের আড়ম্বর ছিল না। অত্যন্ত স্বাবধানী সতর্কতা, তাই, তাঁর হয়ে দাঁড়িয়েছিল মজ্জাগত।

মন্ত্রগুপ্তি ছিল তাঁর সহজাত বিদ্যা। নিজের আপন জন বা নিকট বন্ধুর কাছেও প্রয়োজনের অতিরিক্ত কিছু বলতেন না। তাই, এই ঐতিহাসিক যাত্রার সন্ধিক্ষণে নিজের অতিপ্রিয় ভ্রাতুষ্পুত্রের হাতে নিজেকে সম্পূর্ণ সমর্পণ করেও প্রয়োজনের অতিরিক্ত কোন তথ্যই তাকে জানতে দেননি।

গণ আন্দোলনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নেতারূপে নানা ধরনের সহকর্মীর আনুগত্য তিনি লাভ করেছিলেন সত্য, কিন্তু তারই মধ্যে কয়েকজনকে নিজের বিশিষ্ট বিপ্লবী কর্মধারার সহযাত্রীরূপে বেছেও নিয়েছিলেন। এরই একজন ছিলেন আকবর শা।

ডাক দিলেন তাঁকে। ডাক শুনে ছুটে এলেন আকবর শা। এলেন সুদূর পেশোয়ার থেকে।

যাত্রার আয়োজন হল নিখুঁত। ছোটখাট খুঁটিনাটিও ভুললেন না। আকর শাকে রাখা হল নিজের গৃহে। এলগিন রোডের বাড়িতে। মাপ নেয়া হল গায়ের, পায়ের। আকবর শার সাহায্যে কেনা হল পাজামা, আচকান, মেরজাই, টুপি। কেনা হল নাগরাই জুতো।

কিন্তু এই ক্ষুরধার যাত্রা-পথে চলবার পূর্ব মুহূর্তেও আমার নেতা এই অতি অপ্রয়োজনীয় আমার মতো অধম সহকর্মীর কথা ভুলতে পারেননি। সম্মুখে দুস্তর আর দুর্গম অভিযান। অন্ধকার অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ। বিঘ্নসঙ্কুল এবং প্রায় অবিশ্বাস্য এক পরিকল্পনা মাথায়,—তারই মধ্যে কারাগারে ফেলে-আসা এক অকিঞ্চিৎকর সহকর্মীর কথা ভাবা আর ভেবে তার জন্য সাধ্য মতো সকল ব্যবস্থা করা, সহজ তো নয়ই, সম্ভবপর বলেও কি মনে হয়? তাই কিন্তু হল।

গৃহে পৌঁছে কয়েকদিন কাটাবার পরই নিয়মিত লোক পাঠিয়েছেন আমার গৃহে। আশ্বাস দিয়েছেন, সান্ত্বনার কথা লিখে জানিয়েছেন। কারাগারে আমার যাতে কোন প্রকার অসুবিধে না হয়, তার জন্য টাকা জমা দিয়েছেন, খাবার পাঠিয়েছেন আর কয়েকখানা চিঠিও লিখেছেন আমার স্ত্রীর কাছে। শেষ চিঠি ছিল ১৫ই জানুয়ারি, যাবার একদিন পূর্বের। শুধু লেখা ছিলঃ "সময় করে একবার আসবেন।" আমার স্ত্রী খুবই অসুস্থা ছিলেন, যেতে পারেননি।

একখানা চিঠিতে লিখেছিলেন ঃ

"সবিনয় নিবেদন, ২৪।১২।৪০

"আমি নরেনবাবুর নিকট ইতিমধ্যে আলিপুর জেলে ১০৲ টাকা পাঠাইয়া দিয়াছি।

"প্রেসিডেন্‌সী জেলে নরেনবাবু থাকিতে, আমি আমার হিসাব থেকে ১০৲ টাকা তাঁর নামে জমা দিবার জন্য "জেলারের" কাছে পত্র দিই। মনে করেছিলাম যে ঐ টাকা উনি যথাসময়ে পাইয়াছেন।

দশদিন পরে আমার হিসাবপত্র "জেলার" আমার নিকট পাঠাইয়া দেন এবং সঙ্গে সঙ্গে লেখেন যে জেলখানায় আমার ৬৲ টাকা দেনা রহিয়াছে। তাহা হইতে বুঝিলাম যে নরেনবাবুকে তাঁরা ১০৲ টাকা দেন নাই—অথচ সে সময়ে আমাকে কিছু জানানও নাই। আমি তখন তাড়াতাড়ি আলিপুর জেলে তাঁর নামে ১০৲ টাকা পাঠাইয়া দিই।

"নরেনবাবুর হাইকোর্টে আপিলের জন্য আমি ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছি। এবং প্রয়োজনীয় টাকাও উকিলের হাতে দিয়াছি। কয়েকদিন পরে আপিল পেশ করা হইবে।

"নরেনবাবুর সঙ্গে দেখা হইতেছে না—এ বিষয়ে আপনার নামে খবর-কাগজে আমি পত্র দিতেছি। আশা করি ইহাতে আপনার কোন আপত্তি হইবে না। খবরের-কাগজে পত্র প্রকাশিত হইলে শীঘ্র ফল পাওয়া যাইবে। আলিপুর জেলে অন্যান্য রাজবন্দীদের এইরূপ কষ্ট হইতেছে আমি ইতিপূর্বে সংবাদ পাইয়াছি। যদি কেহ খোঁজ করিতে আসেন আপনি খবর-কাগজে পত্র দিয়াছেন কিনা তাহা হইলে বলিবেন যে বাধ্য হইয়া আপনি খবর-কাগজে নিজের অভিযোগ জানাইয়াছেন।

"জেল থেকে যে রসিদ (১০৲ টাকার) পাইয়াছি তাহা এতৎসঙ্গে পাঠাইতেছি। সযত্নে রাখিয়া দেবেন—যেন নষ্ট না হয়। এতৎসঙ্গে কুড়ি টাকা পাঠাইলাম। ইতি বিনীত

শ্রীসুভাষচন্দ্র বসু"

(পত্র-বাহক মারফৎ বলে পাঠিয়েছিলেন যে, ছেলে-মেয়েদের জন্য ঐ টাকার যেন মিষ্টি কিনে দেয়া হয়।)[১]

নেতা হয় অনেকেই। অনেক নেতাও কি থাকে না? থাকে।

১ চিঠিখানা নিয়ে গিয়েছিলেন শ্রীমান অরবিন্দ বোস, প্রাক্তন এম, এল, সি।

কিন্তু এই সীমাহীন মমতা কি তাদেরও থাকে? জানিনে। ভাবতেও পারিনে।

নিজের জীবন ও মৃত্যু শত্রুর মুঠোয় ভরা। যে-কোনও অসতর্ক মুহূর্তে অন্তিমক্ষণ দেখা দিতে পারে যে-কোন একটার। কিন্তু আত্মশক্তির ওপর কতখানি নিশ্চল ও দ্বিধাহীন প্রত্যয় থাকলে মানুষ এই সর্বনাশা পরমক্ষণে এমন স্থিতধী আর অবিচল হয়?

সুভাষ-জীবনে প্রত্যক্ষভাবে ধর্মের কোন জাঁক ছিল না। ছিল না বিন্দুমাত্রও অভিনয়। না কথায়, না আচরণে, না বেশভূষায়। বরং ছিল উল্টোটাই। কোঁচানো ধুতি ছাড়া পরতেন না। নিখুঁত আর পরিপাটি করে টুপিটি পরতেন মাথায়। চাদরখানা গায়ে দিতেও নিজস্ব ভঙ্গীর কোনদিন ব্যতিক্রম হয়নি। সংস্কৃত কিংবা বাংলা,—শাস্ত্রকথাও কি কোনদিন কেউ শুনেছে মুখে?

কিন্তু ভেতরে? সুখে-দুঃখে, রণে আর বনে, সমাহিত যোগযুক্ত এই মহানায়ক নিজেকে এমন উজাড় করে সকলের মধ্যে ছড়িয়ে দিয়েই-না নেতা থেকে হয়ে উঠলেন নেতাজি।

মাঝে মাঝে ডাক পড়ে শিশিরের। মেজদাদা শরৎচন্দ্রের তৃতীয় পুত্র শিশির বোস। শিশির কথা বলেন কম। গম্ভীর প্রকৃতির। শিশির বুদ্ধিমান। শিশিরকে তাই নির্বাচন করেছিলেন। শিশির রাজনীতির ডামাডোলে জড়াননি। নিবিষ্ট থাকেন সর্বক্ষণ ডাক্তারী পড়ায়। শিশির পুলিসের সন্দেহমুক্ত।

বাড়ির বয়স্ক ছেলেদের মনে জাগে কৌতূহল। রাঙা কাকাবাবু না ডাকলে তো কারও তাঁর সামনে যাবার প্রশ্নই অবান্তর, ডাকলেও কি যাওয়া খুব সহজ? সেই রাঙা কাকাবাবু ডাকেন শিশিরকে। কিন্তু কেন?

অনুমান করেন নিজে থেকেই ওদের ঔৎসুক্য। সঙ্গে সঙ্গে নিজে থেকেই শুনিয়ে দেন যে, শিশির রেডিওর সংবাদ ধরতে দক্ষ। শিশির খবর শোনান।

শুধু একজন মাত্র ব্যক্তি সেদিন নেতার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। তিনি তাঁর সহোদর ভাই। শরৎচন্দ্র। যে ভাই জীবনের প্রায় সর্বক্ষেত্রে ছায়ার ন্যায় হয়েছেন সঙ্গী, অনুবর্তী। বর্মের মতো যে-ভাই নিজের বক্ষে শত আঘাত বরণ করে নিয়েছেন অকুতোভয়ে।

আকবর শা চলে যান পেশোয়ার। এক প্রান্তে শিশির, অন্যপ্রান্তে আকবর শা। নেতা সুভাষচন্দ্রের এবং ভবিষ্যৎ-নেতাজির ঐতিহাসিক যাত্রার দুই সহচর। সারথি।

নিয়তির মতো দুর্বার সেই ক্ষণ এসে দাঁড়ায় সম্মুখে।

১৮ জানুয়ারি, ১৯৪১।

রাত্রি গভীর হয়। ঘন হয়ে আসে অন্ধকার। পথ হয় লোক-বিরল।

বাজে একটা।

শিশিরের গাড়ি এসে দাঁড়ায় গৃহের দক্ষিণ প্রান্ত ঘেষে। সিঁড়ির গোড়ায়।

মনে জাগে মায়ের কথা। যাবেন? একটিবার? মা ঘুমিয়ে আছেন। ঘুম-কাতর মায়ের পায়ের ওপর মাথাটা ছুঁইয়ে আসতে পারবেন না? কিন্তু যদি ঘুম ভেঙে যায়? যদি জড়িয়ে ধরেন দুটি বাহু দিয়ে? যাওয়া হল না।

শয়ন-কক্ষ ছেড়ে নেতা বেরিয়ে আসেন। অন্ধকারে এগিয়ে যান। সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে এসে দাঁড়ান শিশিরের সম্মুখে।

কথা হয় নিম্নস্বরে।

স্তব্ধ রাত্রির অন্ধকার বুকে উত্তর ভারতীয় মুসলমান মৌলবীর বেশে নেতা গাড়িতে চড়ে বসেন।

গাড়ি বেরিয়ে যায় দ্রুত। চক্ষের নিমেষে। অজানার পথে।

* * * *

শূন্য কক্ষ। মুক্ত বাতায়নে দাঁড়িয়ে থাকেন শচী মাতা।

নিরুদ্ধ দৃষ্টি চেয়ে থাকে অপলকে।

চেয়ে থাকে রাজপথের দিকে।

বোবা রাজপথ।

অন্ধ রাজপথ।

শবের মতো প্রাণহীন রাজপথ।

ওরই বুকের ওপর দিয়ে চলে গেছেন তাঁর সুভাষ।

কিন্তু ইলা?